শংকর নর্মদা

সংকর-নর্মদা

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

শ্রাবণ ১৩৩৪

প্রকাশক

শ্রীসুনীল মণ্ডল

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ

ইম্প্রেসন্ হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

ব্লক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীঅজিত কুমার সাউ

নিউ রূপলেখা প্রেস

৬০ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

যমুনাতীরের দূরের বন্ধুকে

শংকর-নর্মদা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এক যুগ আগে। তার আগে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। রেবা-নর্মদার তীরে তীরে. আমার নিঃসঙ্গ যাত্রাব দিনগুলি আজ থেকে পনেরো বছর পূর্বেকার।

তারপরে নর্মদাকে আমি আরো কয়েকবার দেখেছি। দেখেছি রূপ-মতী-বাজবাহাদুরের স্মরণ-শিহর মাণ্ডুতে, অহল্যাবাঈএব সমাধিক্ষেত্র মহেশ্বরে, গুরু ব্রহ্মানন্দের আশ্রমতীর্থ গঙ্গোনাথে, সাগরসঙ্গম বিমলে-শ্বরে। কিন্তু সেসব ঝাঁকি দর্শন। জননীক্রোড়ের নিভৃত নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়।

শংকর-নর্মদার পুনর্মুদ্রণের প্রুফ দেখতে দেখতে সেই আশ্রমের কথা আমার বারে বারে মনে পড়েছে। মাতৃ-নির্দেশিত সেই অভিজ্ঞতা সেই শিক্ষার কথা। অপরিচয়ের পথে স্বার্থ-পরমার্থহীন উদাসীন পরিক্রমার শিক্ষা দেবী নর্মদার কাছেই আমি পেয়েছিলাম। তাঁবই আশীর্বাদে বিচিত্রগামী আমার জীবন।

শংকর-নর্মদা অসংখ্য পাঠককে তৃপ্ত করেছিল। প্রসন্নচিত্ত সমালোচকরা প্রশংসা করেছিলেন। অপরিসীম তাদের করুণা, তাদেব উদ্দেশে অকুণ্ঠ আমার ধন্যবাদ। আমার মহাভাগ্য, এই গ্রন্থের সন্ধানী পাঠক সংখ্যা এখনো কম নয়। বইটি অনেকদিন ছাপা নেই, কোথাও পাওয়া যায় না—এ অনুযোগ আমাকে অনেক শুনতে হয়েছে।

দায়ী আমি—আমার অলসতা, দীর্ঘসূত্রতা। আমার এই অপরাধ ভঞ্জন করে আমাকে পরম কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করেছেন তরুণ বন্ধু শ্রীসুনীল মণ্ডল। তিনি উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান প্রকাশক—সৎসাহিত্যের কাণ্ডারী। তিনি আগ্রহী না হলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর পথবন্দনা স্মৃতি-বিস্মৃতির গোধূলি ছায়াতেই পড়ে থাকত।

লেখক
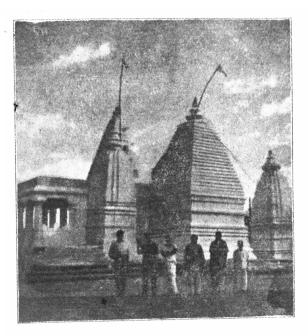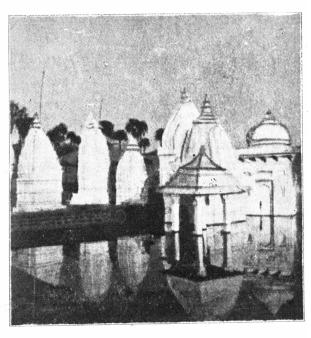
নর্মদামন্দির : অমরকণ্টক

নর্মদা-উৎস : অমরকণ্টক
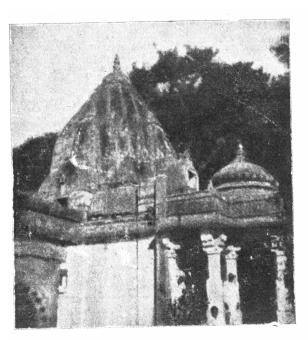
অহল্যাবাঈ স্মৃতিমন্দির। ছত্রীবাগ : ইন্দোর

মহাদেব মন্দির : খাজুরাহো
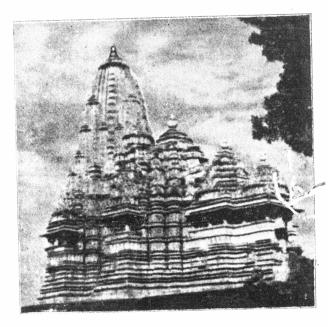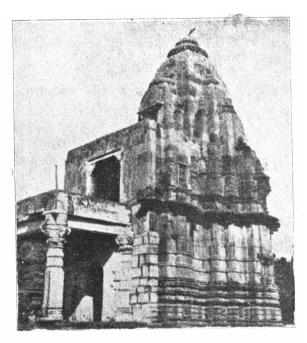
গৌরীসোমনাথ মন্দির : ওংকারতীর্থ
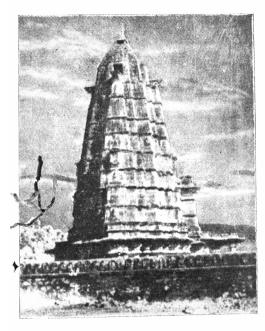
বিষ্ণুমন্দির : ওংকার মান্ধাতা

মদনমহল : জব্বলপুর

দেবতাল : জব্বলপুর
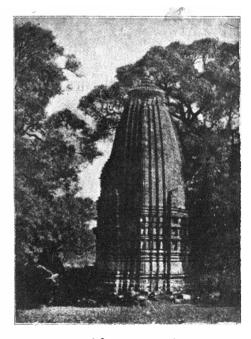
কর্ণমন্দির : অমরকণ্টক
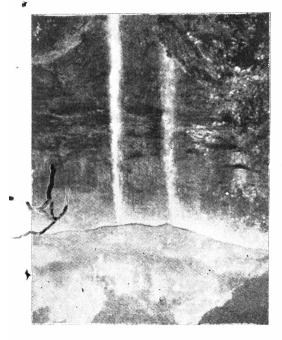
কপিলধারা
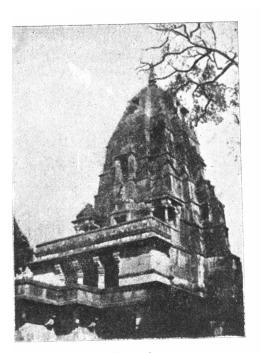
অমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির : ওংকার
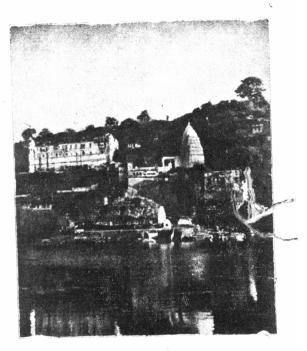
শিবপুরী : ওংকারেশ্বর

সিদ্ধেশ্বর মন্দির : ওংকারতীর্থ

মহাকাল মন্দির : উজ্জয়িনী
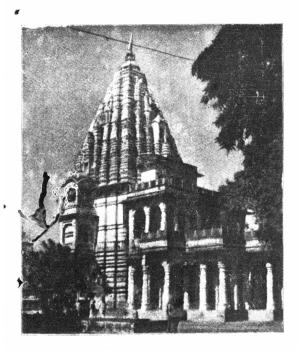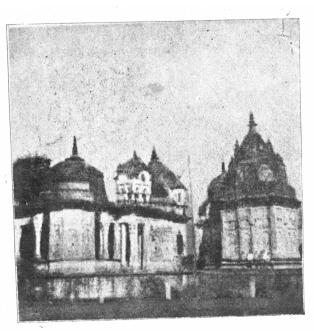
পঞ্চশিব মন্দির : ভিড়াঘাট

গৌরীশংকর মন্দির। চৌষট্টি-যোগিনী : ভিড়াঘাট

১

নর্মদা শংকর-কন্যা।

শিবতনয়া তিনি—তিনি পরমপবিত্রা। রুদ্রস্য পুত্রা নর্মদা পরাংগতি প্রদায়িনী। তাঁকে চোখে মাত্র দেখলে পাপীতাপী মর্তবাসীর সর্ব পাপের ক্ষয়।

বিষ্ণুতনু থেকে গঙ্গা নিঃসৃতা হয়েছিলেন, আর শিবদেহ থেকে উদ্ভূতা হয়েছিলেন নর্মদা। স্বর্গের নদী গঙ্গা—স্বর্গে তাঁর উৎপত্তি। ভগীরথের তপস্যায় তিনি মর্ত-ভূমিতে নেমেছিলেন। নর্মদা মর্তের নদী। আপনি তিনি আবির্ভূত হয়েছেন মর্তবাসীর কল্যাণ-মানসে—কোনো ভক্তের তপস্যা আরাধনার প্রতীক্ষা তিনি করেন নি। গঙ্গা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

মহাদেবের জটা হইতে।

স্বর্গ থেকে গঙ্গা যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর প্রচণ্ড ভারকে ধারণ করেন মহাদেব। শুধু ধারণই করেন, তাই না। জটাজালে আবদ্ধ করে রাখেন গঙ্গাকে। গঙ্গা স্বর্গজাতা। মর্তবাসীর প্রতি তাঁর করুণা সহজাত নয়। অনেক সাধনায় ভগীরথ তাঁকে মর্তাভিমুখী করেন। আবার ভগীরথের আকুল প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে শিব গঙ্গাকে মুক্তি দেন। শিবজটার তুষারবাষ্প থেকে গঙ্গা বিন্দুরূপিণী হন গোমুখী-গঙ্গোত্রীতে। গোমুখী গঙ্গার ভৌগোলিক উৎস। এইখানেই তাঁর প্রাকৃতিক আবির্ভাব।

স্বর্গনন্দিনী গঙ্গার জন্মকাহিনী বড়ো বিচিত্র। দেবর্ষি নারদ দেবতার দূত। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে এঁর ওঁর বার্তা বহন করে নিয়ে যান। এঁর বিরুদ্ধে ওঁর কানে লাগান, ওঁর বিরুদ্ধে এঁর কানে। মিথ্যা ছলনার সাহায্যে অপরের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে তিনি মহাপটু। তিনি আবার সংগীতজ্ঞও বটেন। বীণাযন্ত্রের তিনি আবিষ্কর্তা। তার গানে আর বীণাধ্বনিতে জগৎ মোহিত। এই নিয়ে তাঁর গর্বের শেষ নেই।

আসলে নিজেকে যতো বড়ো ওস্তাদ নারদ মনে করেন ততো বড়ো ওস্তাদ তিনি নন। তাঁর বেসুরো বেতালা সংগীত-হুংকারে বেচারী রাগরাগিণীদের প্রাণ ওষ্ঠা-গত।

একদিন তাঁর অসুর-নিনাদে ত্রিভুবন উচ্চকিত করে নারদ চলেছেন, দেখলেন

দুপাশে একদল জরাজীর্ণ বিকৃতদেহ মূর্তি। যেন বীভৎস এক প্রেতের পাল শীর্ণ করজোড়ে অস্ফুট প্রার্থনা জানাচ্ছে তাঁর কাছে।

চমকে নারদ গান থামালেন। শুধোলেন—তোমরা কে?

প্রভু, আমরা আপনার বশংবদ, আমরা রাগরাগিণী!

রাগরাগিণী? তা এমন জীর্ণদশা কেন তোমাদের?

আপনারই জন্যে দেবর্ষি! আপনার সংগীত-গর্জন আমাদের অঙ্গে মুষল-প্রহারের মতো বাজে—ঘা খেয়ে খেয়ে দেহে আর কিছু নেই প্রভু!

চমকে উঠলেন দেবর্ষি নারদ। এ কী করেছেন তিনি? তাঁর সংগীতের ফলে রাগ-রাগিণীদের এই দশা? তাহলে তাঁর সংগীতজ্ঞান কণামাত্রও কি নেই?

উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে গিয়ে তিনি পৌছলেন কৈলাসে শিবসকাশে। সংগীতের আদি জনক শিব। সর্বরাগপারংগম শিব।

স্তুতিভরে নারদ বললেন—দেবাদিদেব, সংগীতজ্ঞ বলে আমার গর্ব ছিল,—এখন দেখলাম সংগীতের নামে আমি যে চিৎকার এতোদিন করেছি, তার অত্যাচারে রাগরাগিণীরা বিধ্বস্ত বিকলাঙ্গ হয়ে পথের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। আপনি আমাকে সংগীতশিক্ষা দিন, সংগীতের অমৃতস্পর্শে আপনি রাগরাগিণীদের সঞ্জীবিত করুন।

শিব বললেন—আমার সংগীতের উপযুক্ত শ্রোতা কই? তুমি তো পল্লবগ্রাহী মূর্খ, কিছুই জানো না। প্রকৃত শ্রোতা না পেলে আমি সংগীত শোনাব কাকে?

নারদ সবিনয়ে শুধোলেন—কে হতে পারে আপনার সংগীতের উপযুক্ত শ্রোতা? বড়ো জোর ঐ ব্রহ্মা আর বিষ্ণু, আর কাউকে তো দেখিনে।

নারদের নিমন্ত্রণে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু এলেন কৈলাসে শিবকণ্ঠসুধা পানের আকূতি নিয়ে। শিব শুরু করলেন সংগীত। এ সংগীত সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আনন্দবেদনার মহা-মূর্ছনা। এ সংগীতে সকল অনুভূতির আদি, সকল আকিঞ্চনের লয়। এ সংগীতে মৃতবৎ রাগরাগিণীরা আবার প্রাণবন্ত হোলো।

উপলব্ধি দিয়ে এ সংগীতকে সম্পূর্ণ বুঝতে ব্রহ্মাও পারলেন না। মাত্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন বিষ্ণু। সেই অনির্বচনীয় সংগীতানুভূতি বিষ্ণুর হৃদয়তট থেকে এক শান্ত শীতল অমৃতধারায় নেমে এলো—তাঁর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ থেকে হলো প্রবাহিত। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি এই ধারাকে তাঁর কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন।

এই বিষ্ণুপদী ধারাই গঙ্গা। ভগীরথের অনেক তপস্যায় ব্রহ্মা এই কমণ্ডলুস্থিতা নারায়ণী গঙ্গাকে মুক্তি দেন—সগরসন্তানদের পাপহারিণী মুক্তিদায়িনীরূপে গঙ্গা প্রবাহিতা হন মর্তে।

আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নদী পতিতপাবনী গঙ্গা। হিমালয়-ক্রোড়ে গোমুখীতে আবির্ভূত হয়ে তিনি কপিলতীর্থ বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছেন।

এবার বলি নর্মদার জন্মকাহিনী। এই কাহিনীর বর্ণন ও শ্রবণ উভয়েই মহাপুণ্য। গভীর অরণ্যবেষ্টিত নিভৃত এক পর্বতশিখরে শিবশংকর ছিলেন তপস্যারত। বাহ্য-জ্ঞানশূন্য তন্ময়। কতোদিন কতো যুগ এইভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন তার কোনো হিসেব নেই।

সহসা শিবকণ্ঠ থেকে নির্গত হলেন দেবী নর্মদা। আবির্ভূত হয়েই তিনি শিবের দক্ষিণ চরণের উপর দাড়িয়ে শিবতপস্যা আরম্ভ করলেন।

কালে শংকরের ধ্যানভঙ্গ হলো। দৃষ্টি উন্মীলন করে তিনি দেখলেন তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে রয়েছেন এক অপূর্ব সুন্দরী কুমারী কন্যা। তাঁর দিকে মুখ তুলে মুদিত-নয়নে বদ্ধাঞ্জলিপুটে ধ্যানমগ্না।

আশ্চর্যান্বিত হলেন শিব। আনন্দিত হলেন। কুমারীর ধ্যানভঙ্গ করে তিনি তাঁকে শুধোলেন—কে তুমি?

নর্মদা বললেন—আমি আপনার নীলকণ্ঠ নিঃসৃতা কন্যা।

শিবকন্যাই বটে। শিবজটার মতো মাথায় পিঙ্গল কেশভার—সর্ব আভরণহীন মেঘ-বর্ণ ঋজু-দেহে স্বর্ণাভ দ্যুতি—যৌবনস্ফুরিত অঙ্গে অঙ্গে কঠিন তপশ্চর্যার রেখা। দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-আভা যেন।

সন্তুষ্ট শিব বললেন—তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি কন্যা। তুমি কী বর চাও?

নর্মদা বললেন—প্রভু, অমৃত-মন্থনের হলাহল পান করে আপনার কণ্ঠ নীল। সেই কণ্ঠ-নিঃসৃতা আমি—কী বর আপনার কাছে চাইব?

শিব বললেন—আশঙ্কা কোরো না। তুমি হবে অমৃতময়ী।

তখন নর্মদা বললেন—প্রসন্ন যখন হয়েছেন তখন আপনার কন্যাকে এই বর দিন যে, গঙ্গার মতো মাহাত্ম্য যেন আমারও হয়। আমার সলিলে স্নান করলে নর যেন সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়।

পৃথিব্যাং সর্বতীর্থেষু স্নাত্বা
যল্লভতে ফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো
দৃষ্ট্বা ত্বাং মহেশ্বর॥

শিব বললেন—তথাস্তু। গঙ্গার জলে অবগাহনে যে ফল, তোমাকে দর্শন করলেই

মর্তবাসী সেই ফল পাবে।

শিব আরো বললেন—কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর গত হলে গঙ্গার মাহাত্ম্য নষ্ট হবে, তখন গঙ্গার সমস্ত মাহাত্ম্য তুমি লাভ করবে।

তখন নর্মদা বললেন—পিতঃ, আমি আপনার দেহজা কন্যা। বর দিন চিরদিন যেন আপনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি থাকতে পারি।

তাই থাকবে। তুমি আমার চিরকুমারী কন্যকা, আমার নিত্যতৃপ্তিবিধায়িনী হয়ে তুমি থাকবে, তাই তোমার নাম হবে নর্মদা। আমার সঙ্গে অভিন্না হয়ে তুমি সর্বদা বিরাজ করবে। যেখানে তুমি থাকবে, আমিও থাকব সেখানেই।

তাই যেখানে নর্মদা সেখানে শংকর। নর্মদা আট শত মাইল দীর্ঘ। এই আট শত মাইলের মধ্যে কোথাও পর্বত, কোথাও অরণ্য, কোথাও তৃণক্ষেত্র, কোথাও মরু-ভূমি, কোথাও পল্লীগ্রাম, কোথাও সমৃদ্ধ নগর। সর্বত্র নর্মদার তীরে তীরে শিবের আরাধনা। নর্মদার দুই তীর জুড়ে শত শত শিবতীর্থ। নর্মদাতটের প্রতিটি কঙ্করই শংকর।

গঙ্গা পূর্বগামিনী। গঙ্গোত্রীর কাছে হিমালয়ে উৎপন্ন হয়ে সিবালিক পর্বতমালার মধ্য দিয়ে তেরো হাজার ফুটের উচ্চতা থেকে গঙ্গানদী উত্তর প্রদেশের সমতল ভূমিতে নেমে এসেছেন। তারপর পূর্বগামিনী হয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অতি-ক্রম করে দক্ষিণগামিনী হয়েছেন বাংলায়।

পঞ্চনদ অঞ্চল অতিক্রম করে আর্যরা যখন গঙ্গাতীরে এসে পৌছলেন, তখনই তাঁরা ভারতভূমিতে পেলেন প্রকৃত আশ্রয়। গঙ্গার পূর্বগামিনী ধারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সভ্যতা আর্যাবর্তে প্রসারিত হলো।

সংস্কৃতির নানা ধারা যুগে যুগে এসে মিশেছে একটি ধারায়, সেই একটি ধারা সকল বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট হয়ে ঐক্যধারার একটি মহান রূপ নিয়েছে—ছুটে চলেছে মহা-মানবতার মহাসমুদ্র পানে। আর্য সংস্কৃতির সেই ধারা যেন গঙ্গা। সেই ধারায় মিশেছে উত্তর ভারতের সমস্ত প্রধান নদী-উপনদীগুলি—যেমন যমুনা, চম্বল, রামগঙ্গা, গোমতী, রাপ্তি, সরযু, গণ্ডক, শোন, কোশী, দামোদর প্রভৃতি।

আর্যাবর্তের মতো দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির যাত্রাও পশ্চিম থেকে পূর্বে। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী ও মহানদী। অন্ধ্রের গোদাবরী ও কৃষ্ণা, মাদ্রাজের কাবেরী। সব কটি নদীই বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে।

ভারতের প্রধান পশ্চিমগামিনী নদী নর্মদা। বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বতম অঞ্চলের এক

উচ্চ শিখরে নর্মদার আবির্ভাব। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ সানু দিয়ে পশ্চিম দিকে তার সুদীর্ঘ যাত্রা। আরব সাগরে সংগম।

নর্মদা নদীর উত্তরে বিন্ধ্য পর্বতমালা আর দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালা আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে দুই সুদীর্ঘ ও সমান্তরালবর্তী প্রাকৃতিক প্রাচীর। এই দুই পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত নর্মদা।

বিন্ধ্য-সাতপুরার দক্ষিণ সানু ঘেঁষে সুদীর্ঘ যে উপত্যকাটি রয়েছে তার ঢালু পূর্ব থেকে পশ্চিমে। উপত্যকাটি চওড়া নয়, কিন্তু শ্যামল। কোথাও অরণ্য, কোথাও শস্যক্ষেত্র। সমস্ত মধ্যপ্রদেশের মাঝখান দিয়ে এই উপত্যকাটি বিস্তৃত। এই উপত্যকায় নর্মদা ও তাপ্তির অমৃতধারা। নর্মদা ও তাপ্তি উভয়েই গুজরাট প্রদেশের মধ্য দিয়ে আরব সাগরে পড়েছে। নর্মদার সংগম ব্রোচের কাছে, সুরাটের কাছে তাপ্তি-সংগম। মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের দুটি প্রধান নদী নর্মদা ও তাপ্তি।

আটশো মাইলব্যাপী নদীর প্রায় তিনচতুর্থাংশ মধ্যপ্রদেশে। মেকল পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হয়ে মধ্যপ্রদেশের শাডোল, মান্দলা, নরসিংহপুর, হোসাঙ্গাবাদ, খাণ্ডোয়া ও খরগোন জেলা অতিক্রম করে নর্মদা গুজরাট রাজ্যে পৌঁছেছে। গুজরাটে ব্রোচ জিলার মধ্যে দিয়ে নর্মদা সমুদ্রগামিনী।

শংকর-সুতা নর্মদা চিরকুমারী। কোনো পুরুষে কদাচ তিনি আসক্ত হন নি, কোনো পুরুষ তাঁকে কখনো স্পর্শ করে নি। নারীর কৌমার্য যদি বরণীয় হয়, তাহলে তিনি পরমবরণীয়। তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় একমাত্র কন্যাকুমারীর। কন্যাকুমারীর মাহাত্ম্য দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরাণ কাহিনী।

স্বর্গরাজ্যের দেবতাদের শিয়রে তখন ঘোর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। দেবাসুরের যুদ্ধে পদে পদে দেবতাদের পরাজয়। তাঁদের স্বর্গরাজ্য অসুরেরা জয় করে নিয়েছে। সমস্ত ভারতভূমি অসুরদের পদানত। অসুরদের যিনি নেতা তাঁর নাম বাণাসুর। দেববংশকে সমূলে সংহার করার প্রতিজ্ঞা বাণাসুরের।

আর্ত পর্যুদস্ত দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে মূর্তিময়ী হয়ে প্রকটিত হলেন মহাশক্তি মহামায়া। তিনি কন্যাকুমারী—এই কুমারীর হাতেই বানাসুরের নিধন হবে।

তিন মহাসাগরের সংগমস্থলে দাঁড়িয়ে কন্যাকুমারী শুরু কর..ন শংকর-তপস্যা। সেই তপস্যার টানে নড়লেন কৈলাসপতি শিব। কন্যাকুমারীর ধ্যান আহ্বানে ভারতের উত্তরতম পর্বত-শিখর থেকে ধেয়ে চললেন দক্ষিণতম বেলা-প্রান্তে। শক্তির সঙ্গে মিলনের পরমআকাঙ্ক্ষায় রোমাঞ্চিত তাঁর প্রতি অঙ্গ। ওদিকে কন্যাকুমারীর

ধ্যানে মহাদেবের পদধ্বনি বাজছে।

হাহাকার পড়ে গেল দেবগণের মধ্যে। কী সর্বনাশ, বাণাসুরের নিধন একমাত্র কুমারীর দ্বারাই যে সম্ভব! শিবের সঙ্গে যদি কন্যাকুমারীর মিলন হয়, তাহলে অসুর বিনাশ হবে কী উপায়ে?

কূটবুদ্ধি নারদ হলেন সহায়। তিনি কামেশ্বর শিব সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কন্যাকুমারীর শুভ মিলনক্ষণ ঘোষণা করলেন। বললেন—

প্রভু, আপনার মিলনপ্রার্থিনী কন্যাকুমারীকে আর কতো কষ্ট দেবেন? অমুক দিন প্রত্যুষের ব্রাহ্মমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন। সেই আপনাদের মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ। তার পরে গেলে অভিমানিনীকে আর পাবেন না। অতএব ত্বরা করুন, আপনার বৃষটিকে একটু তাড়াতাড়ি চালান!

কন্যাকুমারীর কাছেও গেলেন নারদ। কুচক্রী যেখানে মন, ভাষা সেখানে মধুক্ষরা। বললেন—তোমার কঠিন তপস্যার কথা আমি শিবকে জানিয়েছি। অমুক দিন প্রত্যুষে শিব তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন বলে কথা দিয়েছেন। আর কটা দিন ধৈর্য ধরো তপস্বিনী, তোমার ব্রত সফল হতে আর দেরি নেই।

শুভদিন ঘনিয়ে এলো। আজ রাত্রিটি পার হওয়া মাত্র বাকি। কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে শিব এসে পৌছবেন কন্যাকুমারীর সকাশে। বিরহ-তপস্যার শেষ রাত্রি অবসান হতে আর বাকি নেই। এখুনি সার্থক হবে কন্যাকুমারীর অতন্দ্র প্রতীক্ষা।

শিব পৌছলেন সুচিন্দ্রমে—কুমারিকা থেকে কয়েক মাইল মাত্র দূরে। তখন রাত্রির শেষ প্রহরের তৃতীয় পাদ। ঠিক সময়েই তিনি পৌছবেন কন্যাকুমারীর কাছে। উষার প্রথম মুহূর্তে।

এমন সময় নারদ অন্তরাল থেকে কুক্কুটধ্বনি করে উঠলেন। চমকে উঠলেন শিব। তবে তো প্রভাত হয়ে গিয়েছে! পার হয়ে গিয়েছে মাহেন্দ্রক্ষণ! প্রতিশ্রুতি তো তিনি রাখতে পারেন নি প্রেমার্থিনী তপস্বিনীর কাছে!

সুচিন্দ্রমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন ভ্রষ্টলগ্ন ব্যর্থকাম মহেশ্বর। আর এক পা অগ্রসর হলেন না।

রাত্রি ভোর হলো। শিব এলেন না ব্যর্থ হলো কন্যাকুমারীর তপস্যা। কিন্তু শিব ছাড়া কোনো পতিকে কন্যাকুমারী জানেন না। প্রতিজ্ঞা করলেন কন্যাকুমারী—চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞা।

এদিকে ধেয়ে আসছে বাণাসুর। স্বর্গমর্ত সে গ্রাস করেছে—এখন শুধু দক্ষিণ ভারতের এই শেষ প্রান্তটুকু বাকি। কন্যাকুমারীর সম্মুখবর্তী হলো বাণ, মুহূর্তে বিমোহিত হলো তাঁর রূপ দেখে। সদম্ভে বললে—

আমি ত্রিভুবনের অধিপতি অসুরশ্রেষ্ঠ বাণ, আমি তোমার পাণিপ্রার্থনা করি সুন্দরী !

কঠোর হাসির ধিক্কারে বাণকে প্রতিহত করলেন কন্যাকুমারী।

কামোন্মাদ অপমানিত বাণ সবলে কুমারীকে গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো। মুহূর্তে কন্যাকুমারী মহাশক্তির রূপ পরিগ্রহ করলেন। মহাশক্তির সঙ্গে যুঙ্গে যুদ্ধে বাণাসুর পরাস্ত হলো। দেবী তাঁর চক্রায়ুধ অস্ত্রে অসুর বিনাশ করলেন। দেবকুল রক্ষা পেল। সন্ত্রস্ত পলায়িত দেবগণ আবার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

কন্যাকুমারী রয়ে গেলেন ত্রি-সাগরসংগম কুমারিকায়। চিরকুমারী আবার নিমগ্ন হলেন চিরবাঞ্ছিত শিবের অনন্ত ধ্যানে। শিবের আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত হলো অদূরে সুচিন্দ্রমে। সেইখান থেকে তিনি চির-অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন চির-তপস্বিনী কন্যাকুমারীর ধ্যাননিবিষ্ট মুখপানে।

শিবকাঙ্ক্ষিণী কন্যাকুমারী আর শিবকন্যা নর্মদা উভয়েই চিরকুমারী। পিতা শিবই কন্যা নর্মদাকে এই চিরকৌমার্যের বর দিয়েছিলেন। এইখানে গঙ্গার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

গঙ্গা বিষ্ণুপদী, কিন্তু বিষ্ণুকন্যা নন। বিষ্ণুর প্রতি তিনি আকৃষ্টা। দ্বাপরে বিষ্ণু-অবতার কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনুরক্তির কথাও পুরাণে উল্লিখিত আছে। এছাড়া শান্তনু-গঙ্গার পৌরাণিক কাহিনী কার অজানা ? সেও তো ঐ দ্বাপর যুগেরই কাহিনী !

স্বর্গের দেবতারা কম লুব্ধ হন নি নর্মদাকে দেখে। তাঁর যৌবনদ্যুতিতে ঝল্‌সে গিয়েছিল তাঁদের চোখ। পতঙ্গের মতো তাঁরা ছুটে এসেছিলেন নর্মদার সৌন্দর্য-জ্যোতির আকর্ষণে। অনেক আবেদন নিবেদন তাঁরা করেছিলেন, মর্তচারিণী এই কান্তারকন্যাকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন স্বর্গসুখের। কিন্তু নর্মদা বিন্দু-মাত্র টলেন নি।

সহস্র প্রেমপ্রার্থনা যখন বিফল হলো তখন দেবতারা মতলব করলেন পৌরুষ দিয়ে তাঁরা কুমারীকে জয় করবেন। শক্তি দিয়ে পরাস্ত করবেন শক্তিহীনাকে। যিনি সবার আগে নর্মদাকে কাবু করতে পারেন তিনিই হবেন ভক্ষক।

দেবতাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে চকিতে দূরে সরে গেলেন নর্মদা। দেবতারা একযোগে তাঁর অনুসরণ করলেন। গহন কান্তারের মধ্যে দিয়ে পর্বতগাত্রের ফাঁকে ফাঁকে পালাতে লাগলেন ত্বরিতগতি নবীনা স্রোতস্বিনী নর্মদা। নিষ্ফল কামনার আবেগে উন্মত্ত দেবতারা যতো ছোটেন ততোই নর্মদা তাঁদের এড়িয়ে যান। শেষ

পর্যন্ত পৌরুষের দর্প চূর্ণ হলো—কামোন্মাদের দল ব্যর্থমনোরথ হয়ে ওখানে বসে হাঁপাতে লাগলেন।

অন্তরাল থেকে কাণ্ড দেখছিলেন শিবশংকর। তিনি নর্মদাকে দিয়েছিলেন চির-কৌমার্যের বর— দেখছিলেন কন্যা তাঁর বরের সম্মান রাখতে পারে কিনা।

কন্যার এই লীলা আর দুর্মদ দেবতাদের এই দুর্গতি দেখে মন্মথজেতা শিবের কৌতুকের আর সীমা রইল না। হাসির আবেগে তাঁর সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কন্যার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে সহাস্যে শংকর বললেন—

বড়ো আনন্দ দিলে আমায়! সার্থক তোমার নাম নর্মদা।

২

পা ভেঙে বসেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগে—মন্দাকিনী আর অলকানন্দার সংগমে। এক বাস চলে গেল বদরিকার উদ্দেশ্যে, সেতুপারের অপর বাস ছাড়ল কেদারনাথের পথে। দূরে মিলিয়ে গেল যাত্রীদের জয়ধ্বনি—জয় কেদার, জয় বদ্রীবিশাল!

ভগ্নজানু আমি শুধু পড়ে রইলাম।

গত প্রভাতে হৃষীকেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। যাত্রীঠাসা বাসে। দুপুরে পৌঁছেছিলাম দেবপ্রয়াগে। সেখানে গঙ্গা আর অলকানন্দার সংগম। দেবপ্রয়াগ থেকে দেবভূমি শুরু। সেখানে ছাড়লাম পতিতপাবনী গঙ্গাকে। চললাম স্বর্গের নদী অলকানন্দার তীরে তীরে।

রাত্রের আশ্রয় গাড়োয়াল শ্রীনগরের চটিতে। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই। ভাড়া-করা নড়বড়ে খাটিয়ায়, কম্বল জড়িয়ে। নিস্তব্ধ রাত, তারা-ভরা কালো আকাশ। সারা-দিনের দীর্ঘ যাত্রার শেষে সারা দেহ জুড়ে ক্লান্তি—তবু ঘুম আসে নি। সারারাত শুনেছি অলকানন্দার কলোচ্ছ্বাস।

শেষ রাত্রে শ্রীনগর থেকে বাস ছাড়ল। রুদ্রপ্রয়াগে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর। আকাশে জ্বলজ্বলে সূর্য, কিন্তু চক্রবাল তখনো ধোঁয়া-ধোঁয়া আর বাতাসে শিরশিরে ঠাণ্ডার আমেজ।

রুদ্রপ্রয়াগ কেদারবদ্রীর পথে দ্বিতীয় প্রধান প্রয়াগ। এখানে অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে অমর্তলোকের আর-এক নদী—মন্দাকিনী। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দার তীর ধরে পথ চলেছে বদরিকায় আর মন্দাকিনীর তীর ধরে কেদারে। অলকা-নন্দার প্রান্তে লক্ষ্মীনারায়ণ। মন্দাকিনী চলেছে পরমযোগীর পদপ্রান্তে।

মনের মতো দলটি পেয়েছিলাম। সংখ্যায় খুব কম, কিন্তু মনস্কামনা অনেক উঁচু। সকলেই সুস্থদেহ বয়স্ক—কষ্টসহিষ্ণুতায় প্রস্তুত। দলের দুজন এর আগেই একবার বদ্রীনাথ সেরেছেন। অভিজ্ঞতায় তাঁরা দলের নেতৃস্থানীয়। তাঁরা আমাদের নিয়ে চলেছেন দীর্ঘতর তীর্থ-পরিক্রমায়। বদ্রীর সঙ্গে কেদার, কেদারের পরে গঙ্গোত্রী। পথে যদি কেউ শেষ পর্যন্ত অসমর্থ হয়ে পড়েন, তাই আগে বদ্রী, পরে কেদার—সবশেষে গঙ্গোত্রী। সঙ্গে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডা ও ছড়িদার।

হরিদ্বারে বদ্রীনাথ যাত্রীনিবাসে বসে যাত্রার পথটি মুখস্থ করেছি, সংগ্রহ করেছি

মানচিত্র। অক্ষয়-তৃতীয়ার পর থেকে দিনে দিনে উত্তরাখণ্ডে তীর্থযাত্রীর ভিড় বাড়ছে। আজকাল পথের কাঠিন্য খুবই কম। কেদারনাথ বদ্রীনাথ উভয়ই তো নাগালের মধ্যে।

বদ্রীনাথের পথে পিপলকোটি পর্যন্ত তো বাসই চলবে। বাকি মাইল চল্লিশ হাঁটা-পথ। পথে দেখব যোশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর ও লোকপাল।

বদ্রীনারায়ণের পূজা সেরে ফিরে আসব চামোলিতে। সেখান থেকে কেদারনাথ মাইল ষাটেক। পথে পাব তুঙ্গনাথ, উখীমঠ, গুপ্তকাশী।

কেদার থেকে যাত্রার তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়টি দীর্ঘতম আর সত্যিসত্যিই ক্লেশকর। পথে অনেক বাধা ও বিপদ। এইখানে প্রয়োজন মতো দল ভাগ হবে। যাঁরা ক্লান্ত ও অসমর্থ তাঁরা ফিরে যাবেন হৃষীকেশ-হরিদ্বারে। বাকিরা অগ্রসর হবেন গঙ্গোত্রী অভিমুখে। প্রায় একশো কুড়ি মাইল হাঁটা পথ। কেদার থেকে গৌরীকুণ্ড ত্রিযুগীনারায়ণ আর বুধকেদার হয়ে সে-পথ গেছে মালচাটি পর্যন্ত। সেখান থেকে হরিপ্রয়াগ ভৈরবঘাট হয়ে গঙ্গোত্রী। ভাগীরথীর উৎস।

বাস স্ট্যাণ্ডের ধারে একটা খাবারের দোকান। বারকোশ-ভর্তি ভাজি, ঝুড়িভর্তি ছাঁকা ঘি-এর গরম পুরী। আলাদা উনুনের নরম আঁচে বিশাল এক কড়াই চাপানো —তাতে মহিষের ঘন দুধে পরতে পরতে মোটা সর জমছে। যাত্রীরা সামনে বেঞ্চিতে বসে। পেটে আগুন জ্বলছে সবারই—দেরি হলে দোকানে ভিড় বাড়বে। আমরা পয়লা বাসের যাত্রী। দ্বিতীয় বাস এলো বলে।

যাত্রীঠাসা দ্বিতীয় বাসটা একেবারে ভিড়ের গা ঘেঁষে ব্রেক করল। বোঁচকা-হাতে এক বৃদ্ধা যাত্রিণী পড়ে গেল ঠিক বাসের মুখে। হাঁ-হাঁ করে উঠল জনতা। বদ্রীবিশাল বোধহয় তাই চাইছিলেন। মুহূর্তে কখন ঝাঁপিয়ে পড়েছি দুর্ঘটনার মুখে—এক হ্যাঁচকা টানে বুড়ীকে সরিয়ে নিয়েছি চাকার তলা থেকে, কিছুই জানিনে। জানলাম যখন মাডগার্ডের কঠিন আঘাতে ডান হাঁটুটা ঝনঝন করে উঠল আর বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধরে ছিটকে পড়ে গেলাম পথপ্রান্তের কঠিন পাথরে।

তারপর রুদ্রপ্রয়াগে পড়ে আছি দিনের পর দিন। দোকানের ভিতরে একটা বেঞ্চিতে কম্বল বিছিয়েছি।

তিন দিন পরে পায়ের ব্যাণ্ডেজ আর বুকের পুলটিশ থেকে মুক্তি পেলাম। হাঁটুটা তখনো বেশ ফোলা, বুকের মধ্যেটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে খচখচ করে। সকালে লাঠিতে ভর দিয়ে নদীসংগমে যাই, বিকালে রাস্তার ধারে একটু ঘোরাফেরা করি। বাবা

কেদার ভ্রূকুটি করেছেন, মুখ ফিরিয়েছেন বদ্রীনারায়ণ। এ-যাত্রায় তাঁদের দর্শন-পুণ্য ভাগ্যে নেই, ভাগ্যে নেই ভাগীরথীর উৎসতীর্থ সন্ধান। সবাই চলে গেল। ভগ্নজানু ব্যর্থকাম আমি পড়ে রইলাম রুদ্রপ্রয়াগে। শুধু তাই নয়, দলের ডাক্তার বন্ধুটি বিধান দিয়ে গেলেন—বুকের আঘাতও বিলক্ষণ, যদিও বাইরে তা বিশেষ প্রকট নয়।

মধ্যাহ্নে চামুণ্ডা-মন্দিরের চাতালে বসে আছি। সামনে গভীর পাহাড়ী খাদের উপর দিয়ে সুদীর্ঘ বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি পৌঁছেছে অলকা-নন্দা আর মন্দাকিনীর সংগমে। পার্বত্য স্রোতস্বিনী অলকানন্দা শান্ত নয়—ক্ষিপ্র তার গতি, অক্লান্ত তার কল্লোল। তার উপরে ভীষণ গর্জন তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভীমা মন্দাকিনী। এতো ভীষণ জলোচ্ছ্বাস যে সেখানে পড়লে পলকে সংহার। সিঁড়ির উপর থেকে সংগমের দিকে তাকিয়ে দেখলেই ভয়ে বুক শুকিয়ে আসে। সেখানে স্নান করতে নামে, এমন সাহস কার!

কাল উঠব ফিরতি বাসে। ফিরে যাব। এগোবার উপায় নেই, ফিরে যাবারও কোনো উৎসাহ নেই। এমন হতাশ আর নিঃসঙ্গ বুঝি কখনো লাগে নি। এমন ব্যর্থ পরিত্যক্ত কখনো মনে হয় নি নিজেকে।

একদল জাঠ রমণী এলো মন্দিরে। চাতালের অদূরে পায়ের মোটা চপ্পল আর বোঝা নামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তাদের মোটা মোটা অলংকার চিকমিক করে উঠল সূর্যকিরণে, মন্দিরের চাতালে আভা ছড়িয়ে গেল তাদের ওড়না ঘাগরার লাল-বাদামী রং। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছে মাথা হেঁট করে খুব সাবধানে মাথায় ছিটিয়ে দিল এক-এক অঞ্জলি জল। তারপর মন্দিরে পূজা দিতে উঠে এলো।

পাশে এসে বসলেন শাস্ত্রীজী। রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা। জমি-জমা আছে, তাছাড়া কিছু ছাত্র পড়ান ও যাত্রীদের সাহায্য করেন। আমার বিপদে যথেষ্ট করেছেন।

শুধোলেন—কেমন আছেন বাবুজী?

ম্লান কণ্ঠে বললাম—ভালোই আছি শাস্ত্রীজী—এখন হাঁটুর ফুলোটা দেখুন নেই বললেই হয়।

এমন সময় আর-এক অচেনা যাত্রী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সোনার বোতাম লাগানো সিল্কের পাঞ্জাবি, ফিনফিনে ধুতি, পায়ে চকচকে নিউকাট জুতো। মাথায় কাজ-করা শালের টুপি।

লোকটি চাতালের কিনারে দাঁড়িয়ে মন্দিরের পুরোহিতকে ডাকল। তাঁর সঙ্গে কথা বলল অনেকক্ষণ। প্রথমটা যেন হুকুম, পরে বহুত মিনতি। পুরোহিত কিছুতে

তার কথা শুনতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত হাত-পা নেড়ে খুব রাগ দেখিয়ে ভদ্রলোক চলে গেল।

ওদের কথা কানে আসছিল না। শাস্ত্রীজী পুরোহিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কী?

পুরোহিত খুব উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—সংগমের জল মাথায় দিতে যাবেন বাবু। আমাকে বলছিলেন জুতো পাহারা দিতে! দামী জুতো যদি চুরি যায়! শুনুন কথা, রুদ্রপ্রয়াগে জুতো চুরি যাবে—আর সেই জুতো পাহারা দেব আমি! পারব না বলাতে মেজাজ দেখিয়ে ফিরে গেলেন!

হোহো করে হাসলেন শাস্ত্রীজী। আমাকে বললেন—পা নেই, তাই বদ্রী যাওয়া হলো না। এই নিয়ে সমানে দুঃখ করছিলেন না ক-দিন? দেখুন, এতো কষ্ট করে এতো কাছে এসেও পাদুকার মায়ায় মহাশয়ের সংগমস্পর্শ হোলো না।

তবে?

তবে কী শাস্ত্রীজী?

তবে অবস্থাটা বুঝুন! ভক্তের পা বিকল হলে ভগবান বঞ্চিত হন তাই মাত্র নয়, ভক্তের চরণে দামী জুতো থাকলেও তাঁর ভাগ্যে প্রণাম জোটে না! তা হলে আপনার ক্ষোভ কেন বাবুজী?

শাস্ত্রীজীর কৌতুক-হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। বললাম—তাই বলে এতে ভক্তের পুণ্যের কিছু লাঘব হলো, তা ভাবলে কিন্তু ভুল করবেন। যতো পুণ্য সব উনি হরিদ্বারেই সংগ্রহ করে এসেছেন।

শাস্ত্রীজী প্রশ্ন করলেন, কী করে বাবুজী?

হরিদ্বারের কাছাকাছি স্টেশন থেকে এক ওয়াগন দেরাদুন চাল নির্ঘাত উনি রাজস্থানে বুক করেছেন। তারপর ডুব দিয়েছেন ব্রহ্মকুণ্ডে।

কিন্তু যতো হাসাহাসিই করি, হাসির মধ্যেও দুর্ভাগ্যের কান্না জড়িয়ে আছে।

বললাম - শুধু কেদার-বদ্রী নয়, শাস্ত্রীজী। বড়ো ইচ্ছে ছিল গঙ্গোত্রী দেখব তাই এই দলটি ছিল আমার এতো প্রিয়। আমি বাংলাদেশের লোক—সেখানে গঙ্গা আমার চোখের সামনে সাগরে বিলীন হয়েছেন। সেখানে সগরবংশকে যিনি পরিত্রাণ করেছেন, তাঁর উৎসবারি মাথায় নিলে আমার আর্যাবর্তের তীর্থপুণ্য সম্পূর্ণ হতো।

আবার যাবেন বাবুজী—আবার সুযোগ পাবেন।

আমি ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিলাম—তা জানিনে শাস্ত্রীজী। ডাক্তার বলে গেল বুকটা খারাপ হয়েছে। কালই ফিরে যাব। কলকাতায় গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করাতে হবে।

তার মানে কী ? পাহাড়ে চড়া আপনার আর চলবে না ?

সে-কথার উত্তর দিতে মন সরল না। শুধু বললাম—যদি আর কখনো এখানে না আসি শাস্ত্রীজী, আপনার বন্ধুত্বের কথা কখনো ভুলব না।

শাস্ত্রীজী চওড়া করে হাসলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন— গঙ্গোত্রী যদি কখনো আপনার না-ও হয়, মনে বেদনা রাখবেন না। কলিকালে গঙ্গার চেয়ে নর্মদার মহিমা কম নয়। নর্মদার উৎসতীর্থে যাবেন, তাতে শুনেছি পাহাড়ী চড়াই কম। আমি আশীর্বাদ করে আপনাকে বলছি—তাতেই গঙ্গোত্রীর পুণ্য আপনি অর্জন করবেন।

নর্মদার উৎস ? সে কোথায় ?

শংকরপ্রিয় মহাতীর্থ—নাম তার অমরকণ্টক।

ফুর্হুলালকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাঘ মারতে পারো ?

লালচে দাঁতের দু-পাটি বের করে হাসল ফুর্হু। বিনয়ের সঙ্গে গর্ব-মেশানো সে হাসি। মাথার কাঁচাপাকা চুলে ডান হাতটা বুলিয়ে নিল একবার। তারপর বললে—বাঘ আর কোথায় পাব যে মারব বাবুজী ! দামড়া বাঘবাঘিনীগুলো সব সে। খতম করেছি—তাদের বাল-বাচ্চাগুলো এখন আমার গন্ধ পেলেই লুকোয়।

বলো কী, বিন্ধ্যারণ্যের সব বাঘ তুমি খতম করেছ ?

করিনি ? জীবনে অন্তত একশোটা বাঘ তো মেরেছি বাবুজী ! হলদে ডোরাকাটা বাঘ—তা ছাড়া ভালু আর নেকড়ের তো হিসেবই নেই।

আমি বললাম—তা তোমার বন্দুকটা একবার দেখাও না ফুর্হুলাল ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—বন্দুক আর ছুঁই না—বন্দুকে ঘেন্না ধরে গেছে বাবুজী। দানপত্র লিখে সেটাকে তুলে দিয়েছি পুলিশ সাহেবের হাতে। বাঘও আর আমার কাছে ঘেঁযে না—আমার গায়ে যমের গন্ধ পায় কি না ?

ফুর্হুলালের সঙ্গে কথা হচ্ছিল পেণ্ড্রার হাটের ধারে বসে শীতের অপরাহ্নে। রবিবার—পেণ্ড্রার হাটের দিন আজ। চাল-ডাল, তেল-মসলা, তরি-তরকারি, হাঁস-মুরগী খুব উঠেছে। কাপড়-চোপড়, মনিহারি জিনিসপত্রও যথেষ্ট। কাঁচের চুড়ি, রঙীন টিপ, আর পুঁতির মালার দোকানগুলির জোর বাহার। ভিড়ে ভিড় —মরদের চেয়ে মেয়ে বেশি। ডাঁই-করা হাঁড়ি-পাতিলের পিছন দিকটা কিছুটা ফাঁকা। সেখানে এক নাগরদোলা—বাচ্চাদের আর কাঁচা মেয়েদের জমায়েত। ভিড়ের চাপে পিছু হঠতে হঠতে একেবারে রাস্তার ধারে ঘেঁষে এসেছি। সেখানেই

ফুতু্লালের কুটীর। ঘর থেকে খাটিয়া বার করে ফুতু্লাল আমাকে বসিয়েছে। ঘরের মধ্যে ছেলের বউকে হুকুম দিয়েছে চা বানাতে।

বেঁটেখাটো মানুষটি। শীর্ণ চেহারা, গায়ের ছিটের একটা জীর্ণ ফতুয়া, হাঁটুর উপর তোলা মলিন ধুতি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

অমরকণ্টকের পথে যাব এবার। তাই এসেছি পেণ্ড্রায়। পেণ্ড্রার প্রবীণতম বাঙালী অধিবাসী ডাক্তার বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী ফুতু্লালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। ফুতু্ হবে আমার গাইড—সে যাবে আমার সঙ্গে অমরকণ্টকে।

অমরকণ্টক নামটি প্রথম পেয়েছিলাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত গ্রন্থে।

পিতৃমাতৃহীন আত্মীয়-পরিজনহীন অপু। ছন্নছাড়া জীবনে ক্ষণকালের গ্রন্থি ছিল অপর্ণা, সে-ও মারা গেল সন্তান প্রসবে। বাল্যবান্ধবী লীলারও বিয়ে হয়ে গেছে, সে স্বামীগৃহে প্রবাসিনী। আমড়াতলা গলির শীলেদের সেরেস্তার রুদ্ধশ্বাস চাকরি ছেড়ে গিয়েছিল স্কুলমাস্টারি নিয়ে চাঁপদানিতে। পূর্ণ দীঘড়ীর মেয়ে পটেশ্বরীকে নিয়ে মিথ্যা দুর্নাম কুড়িয়ে মাস্টারিটাও গেল।

নির্বান্ধব নিরাত্মীয় অপু। সংস্থান নেই, সংসার নেই। বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্তের শ্রান্ত প্রৌঢ়ত্ব আয়ুকে ছুঁই-ছুঁই করছে। তবু শৈশবের সেই স্বপ্ন এখনো সে দেখে—আনন্দভরা, উদ্দীপনাভরা উদার জীবনের স্বপ্ন, নিঃসীম দূরান্তের অদেখা চক্রবালের স্বপ্ন—যে স্বপ্ন একদা দেখেছিল নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ছাড়িয়ে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা পেরিয়ে রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে, দেখেছিল পুরোনো বঙ্গবাসী কাগজে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলাতযাত্রীর চিঠি পড়তে পড়তে।

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসলেন। অপু কলকাতা ছেড়ে বার হলো। জমাল দূরের পাড়ি। প্রথমে গয়া। তারপর সোজা দিল্লী।

তিন দিন সমানে রেলে কাটিয়ে কাটনি লাইনের একটা ছোট স্টেশনে একদিন সে নামল। সেখান থেকে ত্রিশ মাইল পাহাড়ী বন্য পথে উমেরিয়া। আরো চল্লিশ মাইল দূরে দুর্গম বনের মধ্যে প্রসপেকটিং ড্রিল ক্যাম্প। পিছনে পাহাড়, আরো পাহাড়। সেইখানে অপু পেল আশ্রয় আর পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরি।

মধ্যপ্রদেশের এই অরণ্য অঞ্চলের বর্ণনা অপরাজিত গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের একাত্মতার এক অনির্বচনীয় জীবন-দর্শন।—অপরাজিতের এই অংশ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যে চিরন্তন আসন লাভ করেছে।

অপু একদিন অমরকণ্টক দেখতে যাবার জন্যে যাত্রা করল। অপুর ক্যাম্প থেকে

অমরকণ্টক প্রায় আশি মাইল দূরে—তার মধ্যে ষাট মাইল ডেন্স ভার্জিন ফরেস্ট, বাঘ, ভালুক, নেকড়ের পালে ভর্তি। দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ী চড়াই-উতরাই। পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

অমরকণ্টকের পথে বিন্ধ্যারণ্যের গভীর নির্জনে এক পরমাশ্চর্য জীবন-দর্শনের উপলব্ধি লাভ করল অপু।

'যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে, হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি, জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে ; দুঃখকে তা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা…'

হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে বিশেষজ্ঞের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম। তাঁর আশ্রয়ে রইলাম প্রায় ছ-মাস। তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিলেন বটে—সঙ্গে দিলেন অনেক নির্দেশ-উপদেশ, অনেক সাবধানবাণী।

কেদার-বদ্রীনাথ এ জীবনে আর কখনো দয়া করবেন কি না জানিনে। গোমুখী-গঙ্গোত্রী স্বপ্ন হয়েই রইল।

কিন্তু বিবাগী মনকে কতো বেঁধে রাখি? খাঁচার মধ্যে ডানা ঝটপট করে শিকলে বাঁধা পাখি। আস্তে আস্তে পথে পা দিলাম। ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম মাতৃভূমি বাংলায়। জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, লোকতীর্থের ঘাটে ঘাটে। মেলায় আর মন্দিরে, পঙ্গতে আর আখড়ায়।

এমনি আরো বছর খানেক কাটল। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগের বন্ধু শাস্ত্রীজীর কথা ভুলতে পারলাম না। মনে জেগে রইল অমরকণ্টকের নাম।

অপুর অমরকণ্টক যাত্রার বর্ণনা হঠাৎ মধ্যপথে শেষ হয়েছে। পথযাত্রার অবিস্মরণীয় বিবরণ আছে, কিন্তু অমরকণ্টক সম্বন্ধে একটি কথাও নেই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত অমরকণ্টক যান নি। তাহলে অপরাজিতে অমরকণ্টকের বিবরণ নিশ্চয়ই থাকত। অমরকণ্টক যে মধ্যভারতের একটি বিখ্যাত নদীর উৎস, সে-কথা অন্তত তিনি উল্লেখ করতেন

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। তখন তিনি হ্যারিসন রোড পাড়ায় এক মেসে থাকতেন ; দশটায় মেসের ভাত খেয়ে কোঁচা দুলিয়ে ছাতি মাথায় দিয়ে যেতেন স্কুল-মাস্টারিতে। পথের পাঁচালীর কয়েকটি পরিচ্ছেদ তিনি

ছাপা বই থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই পরিচ্ছেদগুলির পাণ্ডুলিপি তিনি আমায় পড়তে দিয়েছিলেন। অপূর্ব সুন্দর ইণ্টারলুডগুলি। দুটি পরিচ্ছেদ এখনো মনে পড়ে —একটি তরুণ-তরুণী হরিহর-সর্বজয়ার প্রেমচিত্র, অপরটি শিশু দুর্গার দন্ত-হীন মুখের হাসি দেখে নূতন-মা সর্বজয়ার উদ্বেলিত মাতৃত্ব-সুধা। এ দুটি পরিচ্ছেদ মনে পড়ে আলাদা করে মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছিল। আর সবগুলি কোথায় গেল জানিনে।

মেস-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার প্রথম ঘরটি তাঁর। দরজার সামনে চৌকাঠের দুধারে কানা-ভাঙা টবে কয়েক বিঘত উঁচু শীর্ণ দুটি এরিকা-পাম গাছ। একটি কেরোসিন কাঠের ডেস্ক। দরজার দিকে মুখ করে পিছনের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে সামনে ডেস্ক নিয়ে বিভূতিভূষণ বসতেন। ডেস্কের খোলা গহ্বরে থাকত কাগজপত্র, লেখার সরঞ্জাম, পাণ্ডুলিপি।

আমার প্রথম যৌবনকালের চোখে দেখা সেই দৃশ্য এখনো স্পষ্ট মনে জেগে আছে, —কলকাতার মেসের এক মলিন কোঠায় মাদুর বিছিয়ে বসে আছেন বিভূতি-ভূষণ—বিশীর্ণ নিষ্প্রভ সেই পামগাছ দুটির দিকে তাকিয়ে সেই নিঃসীম চিররহস্য-ভরা বিশ্বপ্রকৃতির ধ্যানমগ্ন, যার শ্রেষ্ঠ পূজারীরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অক্ষয় নাম।

তাঁর জীবনের শেষ কয় বছর বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার মোটামুটি সংযোগ ছিল। তাঁরই জন্য আরো অনেকের মতোই আমি বারেবারে ঘাটশিলায় যেতাম। দাহিগড়ার মোড়ে লেভেল ক্রসিং-এর ধারে সাঁকোর উপর বসে অনেক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা আমি তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছি। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন মনোহর-পুরে বাদাম পাহাড়ে। সারন্ড্রা অরণ্য অঞ্চলে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের নেশা তাঁর কাছ থেকেই আমি পেয়েছিলাম।

কিন্তু অমরকণ্টক গিয়েছিলেন কিনা একথা কোনোদিনই বিভূতিভূষণকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যখন জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল হলো তখন তিনি আর ইহজগতে নেই।

৩

ঠিকই বলেছিলেন শাস্ত্রীমশাই। অমরকণ্টকের পথ আজকাল আর দুর্গম নয়। চারদিকে পাহাড় আর অজঙ্গবিজঙ্গ বন—তার মাঝখানে সাধারণের অগম্য নিভৃতে ধ্যানস্থ ছিল অমরকণ্টক তীর্থ। সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত হিংস্র শ্বাপদরা। আধমোছা পাকদণ্ডী বেয়ে মাঝে মাঝে দুঃসাহসী তীর্থ-যাত্রীরা উঠত পাহাড়ের চূড়ায়। দলবদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তারা অগ্রসর হতো, প্রতিটি পা ফেলত প্রাণ হাতে নিয়ে। মহাভাগ্য বলে মানত যদি পশ্চাদপদ না হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত নর্মদা-উৎসের মহাতীর্থে।

পথে খাদ্য মিলত না, জল মিলত না, ক্বচিৎ মিলত বনবাসীর আস্তানা, সাধুর পর্ণ-কুটীর। নিবিড় অটবীমধ্যে দিনমানেও আলো ঢুকত কদাচিৎ। সেই আবছায়া অন্ধ-কারে বন্য জন্তুরা ঘুরে বেড়াত যত্রতত্র। মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলই না বললে গেলে, তাই মানুষ দেখলেই নিঃশঙ্ক উৎসাহে তারা থাবা বাড়াত। স্থানীয় মানুষ ছিল কিছু কিছু, তারা বন্য আদিবাসী। যুগ যুগ ধরে তারা ছিল সভ্যতার বাইরে, সভ্যতাও তাদের ভুলে ছিল। আদিম উলঙ্গতা ছিল তাদের ভূষণ, জান্তব নখদংষ্ট্রার অভাবে তাদের হাতে ছিল আদিম তীক্ষ্ণ অস্ত্র। সেই অস্ত্রে তারা আত্ম-রক্ষা করত, পশু শিকার করত—পশুদের পাশাপাশি আরণ্যক জীবনে তারা ছিল অভ্যস্ত।

এই পার্বত্যভূমির বন্ধুরতা, এই অরণ্যানীর তমসা, এই দুর্দান্ত শ্বাপদগোষ্ঠী ও দুর্দান্ততর আদিবাসীদের মধ্যে দিয়ে ক-জন সাধারণ যাত্রীই বা পৌঁছতে পারত অমরকণ্টকে? ক-জনের ভাগ্যে জুটত নর্মদা-শংকরের দর্শনপুণ্য?

কিন্তু সেদিন আর নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে সম্প্রতি। অমরকণ্টক পর্যন্ত পাকা রাস্তা হয়েছে আজকাল। একটা নয় অনেকগুলো। অমরকণ্টক মধ্যপ্রদেশের শাডোল জেলার অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে শাডোল, দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দলা ও দক্ষিণ-পূর্বে বিলাসপুর, এই তিন জেলার মাঝামাঝি স্থানে অমরকণ্টক। উত্তরে অনুপ্-পুর, পূর্বে পেণ্ড্রা ও পশ্চিমে ডিন্‌ডোরি থেকে সরাসরি অমরকণ্টক পৌঁছনো যায়। তিন রাস্তায় পাবলিক বাস চলে। অনুপ্‌পুর আর পেণ্ড্রা রোড, দুই-ই রেল লাইনের উপর। বিলাসপুর-কাটনি রেলপথে দুটি কাছাকাছি স্টেশন। তবে পেণ্ড্রা থেকেই বাসের রাস্তা সবচেয়ে কম। যখন পাকা রাস্তা বা বাস ছিল না তখনও

অমরকণ্টকের অধিকাংশ যাত্রী রওনা হোতো পেণ্ড্রা থেকেই।

পেণ্ড্রার বাস স্ট্যাণ্ডের ধারে বসে মধ্যপ্রদেশের রোড ম্যাপখানা দেখছিলাম। সকাল আটটা বাজে নি। বাস ছাড়তে দেরি। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছি। হি-হি শীত আর নেই, পিঠে মিঠে রোদ লাগছে। যাত্রীদের জটলা এখনো জমে নি।
হলুদ রঙের মোটাসোটা ধারাগুলি জাতীয় রাজবর্ত্ম। সারা মধ্যপ্রদেশের বুক চিরে উত্তর থেকে দক্ষিণে আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া সরু ও অধিকতর সরু অসংখ্য রেখার আঁকি-বুকি মানচিত্রের বুকে।
সারা মধ্যপ্রদেশে টুরিস্টদের আকর্ষণীয় স্থান বিরল নয়। প্রত্যেকটি স্থানই রাজ-পথের দ্বারা সংযুক্ত। গোয়ালিয়র, বাগ, ধার, মাণ্ডু, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, মহেশ্বর, ভূপাল, সাঁচী, বিদিশা, খাজুরাহো, পাঁচমারী, জব্বলপুর—সব স্থানেই রাজপথ চলেছে। যেসব স্থান রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, পাকা রাস্তার কল্যাণে সেগুলি মোটেই আর দুষ্কর নয়। এই সমস্ত দর্শনীয় স্থানে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিত্য ভিড। সবচেয়ে ভিড় শীতকালে, অবশ্য শৈলনিবাস পাঁচমারি ছাড়া।
খাজুরাহোর কথাই ধরা যাক। মাত্র কয়েক বছর আগে ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পদ ছিল সাধারণের অধিগম্যতার সুদূর দূরান্তে। শুধু নাম শুনেই তৃপ্তি, বিবরণ শুনে হতাশা, আর ছবি দেখে দীর্ঘশ্বাস। আজ পশ্চিমে ছতর-পুর আর পূর্বে সাতনা থেকে দুবেলা যাত্রীঠাসা বাস যাচ্ছে খাজুরাহোতে। দোকান বাজার হোটেল ধর্মশালা। সরকারী রেস্ট-হাউসে সংবৎসরে একদিনও জায়গা পাওয়া ভার। রাস্তা না হলে গণতন্ত্র হয় না, গণতন্ত্র না হলে পাঁচসিকের টিকিট কেটে কনফারেন্সে মুখোমুখি বসে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গান শোনা যায় না।
মধ্যপ্রদেশের মহাতীর্থ অমরকণ্টক। বিন্ধ্যারণ্যের এই অতি দুরন্ত দুর্গম তীর্থ—তার পথও আজ সুগম হয়েছে। সেই পথে আরামে চলব পেণ্ড্রা থেকে। বাসে চড়ে।

শুনেছিলাম বেশ সকাল সকালই বাস ছাড়বে। তাই সাতটার মধ্যেই বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছেছিলাম। তখন আকাশের কুয়াশা সবে কাটছে। কনকনে হাওয়া। বাস একটা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু না যাত্রী, না কণ্ডাক্টর, না ড্রাইভার। চায়ের দোকানের উনুনে আঁচ অবশ্য লেগেছে। বেঞ্চিতে বসে আছে মাংকি ক্যাপ

মাথায় ভুসো সোয়েটার পরা একটা লোক। প্রশ্ন করতে বললে সে ঐ বাসেরই লোক—কণ্ডাক্টরের অ্যাসিস্টাণ্ট।

বললে—আপনার ভাগ্য ভালো বাবুজী। আজ হয়তো খুলবে বাস—

খুলবে মানে? নাও চলতে পারে নাকি?

তা তো পারেই! শালা পুলিশ তো পনেরো রোজ সার্ভিস আটকে রেখেছে। তবে আজসে পারমিট দেবার কথা আছে।

দু-ভাঁড় চা অর্ডার দিলাম। শুনলাম সার্ভিসের ব্যাপারটা।

পেণ্ড্রা-অমরকণ্টক বাস সার্ভিস খোলে ডিসেম্বরের গোড়ায়। চলে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত। বর্ষায় পাহাড়ী রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। বর্ষার শেষে মেরামত শুরু হয়। শীতের আগে সে রাস্তা গমনাগমনের উপযুক্ত হয় না। এবারও দোসরা ডিসেম্বর খুলেছিল। শুরু হয়েছিল সার্ভিস।

বাসরুটে পেণ্ড্রা থেকে অমরকণ্টকের দূরত্ব মাত্র আটাশ মাইল। এছাড়া আরো একটি হ্রস্ব পথ আছে। সে-পথ অবশ্য আরো দুর্গম। আরো আঁকাবাঁকা ও আরণ্যক। সে-পথে অমরকণ্টক সতেরো মাইল মাত্র। হাঁটাপথের যাত্রীদের পক্ষে এই পথ সংক্ষিপ্ততম। এই পথে গরু বা মহিষের গাড়ি কষ্টেসৃষ্টে অমরনালা পর্যন্ত চলত। বাকি চার মাইল পথ হাঁটা ভিন্ন গতি নেই।

সেই রাস্তাও এখন পাকা হচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে অমরকণ্টক পর্যন্ত। সেই পথে মালবাহী লরী চালানোর পারমিট আছে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় কোনো যাত্রীবাহী বাস এখনো পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয় না। পেট্রোল বাঁচাবার জন্যে সে-পথে এক বাস গিয়ে অ্যাকসিডেণ্ট করে। লঘু পাপে গুরু শাস্তি। পুলিশ সে-পথই শুধু বন্ধ করে নি—আসল রাস্তাটাকেও বন্ধ করে রেখেছে গত দশ-বারো দিন।

আমি প্রশ্ন করলাম—এ রাস্তা বন্ধ কেন?

জবরদস্তি বাবুজী। বললে—এ রাস্তাও খারাপ, মেরামতি কাম চলেছে মাঝে মাঝে। আবার অ্যাকসিডেণ্ট হবে? গাড়ি পড়ল এক রাস্তায়, অন্য সড়কভী আটক!

আমি বললাম—কিন্তু অ্যাকসিডেণ্ট যদি হয়? পুলিশ হয়তো ঠিকই করেছে!

খুব বিরক্তমুখে লোকটা উত্তর দিল—পাহাড়ী রাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট সব সময়ই তো হতে পারে! অ্যাকসিডেণ্টকে কে কেয়ার করে? ড্রাইভার করে, না প্যাসেঞ্জার করে? সব শালা সরকারী জুলুম!

ফুর্তিলাল এতোক্ষণে হাজির।

ফুহ্র্‌কে দেখে আমি চিনতেই পারিনে ! এ ফুর্হ্‌ যেন সে ফুর্হ্‌ নয়, যাকে কাল পড়ন্ত বিকেলে মেলার ধারে দেখেছিলাম। গোঁফদাড়ি পরিপাটি কামানো, কল্কা-দার ছাপা কাপড়ের বিহারী পাগড়ীর নিচে কামানো ঘাড়টি চকচক করছে। গায়ে মোটা নীল বনাতের কোট, তাতে পিতলের বোতাম। হাতে পিতল-বাঁধানো মোটা এক লাঠি। পিছনে পিছনে আর একটা লোক আসছে। তার মাথায় বিশাল এক হোল্ড-অল।

লজ্জা পেয়েছি ফুর্হ্‌র হোল্ড-অলটা দেখে। ও হোল্ড-অল তার এক ইঞ্চি নড়ানোর ক্ষমতা নেই। ওটাকে বাহকের মাথায় তুলতে সাহায্য করবে, সে শক্তিও ওর বেঁটেখাটো মালিকের শীর্ণ দু-হাতে আছে বলে মনে হয় না।

ফুর্হ্‌র তুলনায় আমার আয়োজন কতো দীন, কতো সামান্য। আমার সঙ্গে আছে দুটি বিশ ইঞ্চি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। একটি ব্যাগের মধ্যে একজোড়া আধ-মোটা কম্বল, একটা মশারী, আর একটা গেরুয়া রঙের গরম চাদর। অন্য ব্যাগে একটা বাড়তি শার্ট আর সোয়েটার, পশমের টুপি আর দস্তানা, একটা জলের মগ, আর কয়েকটা টুকিটাকি। টুকিটাকিগুলি ব্যাগের গহ্বরে যদি এদিক ওদিক হারিয়ে যায়, তাহলে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই সেলোফেন কাগজের ঠোঙার মধ্যে সেগুলো পোরা। এই দ্বিতীয় ব্যাগে কিছুটা বাড়তি ফাঁকা জায়গাও আছে প্রয়োজন মতো ক্যামেরা আর কাগজপত্র ভরবার জন্যে।

বাকি যা কিছু সম্বল তাতো গায়েই পরা আছে। মোটা গ্রে ফ্ল্যানেলের পাৎলুন, সোয়েটারের উপর গলাবন্ধ মোটা কোট, মোটা মোজা আর পুরোনো ভারি জুতো। কোটটায় অনেকগুলো পকেট, চলতি পথের অনেক জিনিস ধরে। ক্যামেরাটা কাঁধে।

দরকার পড়লে আমার ব্যাগ দুটো আমি নিজেই টানতে পারি। আমার সেই স্বল্পভার আয়োজনের দিকে ফুর্হ্‌ একটু আড়চোখে তাকাল—কিছু বলল না। তার হোল্ড-অলটা বাসের মাথায় তুলতে কণ্ডাক্টর আর বাহক ছোকরার পরিশ্রম মন্দ হলো না। তারপর দুজনেই আমার কাছে এলো। কণ্ডাক্টর বললে আধখানা টিকিটের ভাড়া লাগবে ওটার জন্যে। বাহক চাইল পারিশ্রমিক।

ফুর্হ্‌লাল আমার গাইড। তার জন্যে তাই সই।

অনেক গড়িমসি করে বাস ছাড়ল যখন সূর্য পার। চনচনে রোদ উঠেছে। বাস স্ট্যাণ্ডের মোড়ে বিরাট কটা শিরীষ গাছ। তাদের পাতাগুলি চিকচিক করছে। কেটে গেছে ভোরের কুয়াশা, মন্দা পড়েছে শনশনে হাওয়ায়। ড্রাইভারের পাশের

জায়গাটি পেয়েছি। ঠিক পিছনের সিটেই ফুদ্দুলাল।

বাসের গড়িমসির কারণও আছে। পুলিশ পারমিটের ঝামেলা তো কাটল, কিন্তু যাত্রী কই ? দশ-বারো দিন পরে পয়লা বাস ছাড়ছে, ভিড়ের তো অবধি থাকবে না। কিন্তু সারা বাসে অমরকণ্টক যাত্রী আমরা মাত্র দুজন। আর মাত্র চারটি স্থানীয় লোক—নিতান্ত লোকাল প্যাসেঞ্জার।

টি বি স্যানাটোরিয়ামের জন্যে পেণ্ড্রার নাম। এখানকার জল হাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। আবহাওয়ায় আর্দ্রতা অতি কম। গ্রীষ্মে যেমন গরম, শীতকাল তেমনি কনকনে। বাঁ দিকে স্যানাটোরিয়ামকে রেখে বাস চলল। পৌছল গৌরেলা গ্রামে। গৌরেলার গায়েই পেণ্ড্রা রেল স্টেশন।

গৌরেলা বাজারে বাস দাঁড়াল বেশ অনেকক্ষণ। এখান থেকেই অমরকণ্টকের যাত্রীরা সাধারণত বাস ধরে—রেলপথে পেণ্ড্রা রোড স্টেশনে পৌছবার পর। এখানকার বাজার বেশ বড়ো। যাত্রীদের জন্য ধর্মশালাও আছে।

এইখানেই গাড়ি ভর্তির আশা। ঘন ঘন হর্ন দিতে লাগল বাস। কিন্তু যাত্রীর দেখা নেই। আর কয়েকটি লোক উঠল, আদিবাসী মেয়েপুরুষ। দেখেই বোঝা যায় কাছাকাছি তাদের গন্তব্য। তীর্থযাত্রী দেখলেই চেনা যায়—তাদের পোশাকে, গাঁটরিতে, তাদের মুখের ভাবে। সিজনে যে বাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের গাদাগাদি ভিড়, এখন জনা দশ-বারোর বেশি না। তার মধ্যে একজন আবার পুলিশ।

এ যাত্রা নিতান্ত নিঃসঙ্গ যাত্রা। আমার মতো তীর্থযাত্রী দ্বিতীয় নেই দলে। নেই যাত্রার মুখে তীর্থদেবতার জয়ধ্বনি। অমরকণ্টকে মেলা হয় শিবরাত্রিতে। তখনই যাত্রীর ভিড় হয়, সবদিকের বাসরুটে ব্যস্ততা বাড়ে। তারপর বর্ষার শুরু থেকে সমস্ত শীতকাল ধরে অরণ্যঘেরা এই গোপন তীর্থে নির্জন নিভৃতি।

মধ্যপ্রদেশের শুনো প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। দুধারে শুষ্ক তৃণক্ষেত্র, রুক্ষ ধূসর মাটি। দূরান্তে পাহাড়ের নীলাভ রেখা। চোদ্দ মাইল দূর কেওচি গ্রামে এসে বাস থামল।

পথে নামলাম। কেওচিতে এসে মনে হলো সত্যিই চলেছি কোন্ আগ্রহভরা অজানার অভিমুখে। বাস স্ট্যাণ্ডের সামনেই সুন্দর বাগানঘেরা একটি একতলা ডাকবাংলো—পাশে স্বচ্ছ একটি দীঘি। ডানদিকের খেত ছাড়িয়ে চক্রবাল জুড়ে রয়েছে বিশাল পর্বতমালা। সামনের পাহাড়টি চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। তার ঘন সবুজ গা—চূড়াটা নীল আকাশে গিয়ে ছুঁয়েছে।

ফুদ্দু ঐ চূড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ঐ দেখুন অমরকণ্টক পাহাড়, ঐ

পাহাড়ের মাথায় গিয়ে আমরা পৌছব।

সাতপুরা আর বিন্ধ্যাচলধারা উভয়ই পূর্ব সীমান্তে এসে যুক্ত হয়েছে। এই পার্বত্য সংগমটির নাম মেকল। অমরকণ্টক এই মেকল পর্বতমালার একটি শৃঙ্গ। অমরকণ্টক পর্বতকেও মেকল পর্বত বলা হয়। ঐ শৃঙ্গের কাছে বাস আমাদের নিয়ে যাবে।

লক্ষ্য করি নি কখন পিছনথেকে গুঁড়িমেরে এসেছে কালো মেঘ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেকটা আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। সামনের পর্বতগাত্র গম্ভীর ধূসর রং ধারণ করল।

তাড়াতাড়ি বাসের কাছে ফিরে এলাম। প্রায় সব যাত্রী চলে গেছে। আমি আর ফুচু—আর আছে চার পাঁচজন মাত্র। তারা আলাপ করার মতো নয়, শেষের সীটে বসে আছে।

ড্রাইভার বিড়ি টানছিল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—

ব্যস, এই ?

ব্যস, এই বাবুজী।

অমরকণ্টক নিয়ে যাবে তো আমাকে ?

আলবৎ! বাস তো সেখানেই যাচ্ছে।

আবার শুধোলাম— অমরকণ্টকে এখন মানুষজন হবে তো ড্রাইভার সাব ?

হবে বই কি বাবুজী। বাজারে মন্দিরে লোক হবে, দু-চার সাধুজি জরুর মিলবে!

মেঘের আড়ালে রৌদ্র মুছে যাওয়ায় সঙ্গেসঙ্গে কেমন যেন শীত করে এলো। এ শীত শুধু দেহে নয়, মনেও। এ জীবনে কতো তীর্থে ঘুরেছি—কতো ঘাটে কতো মেলায়! ট্রেনে গেছি, বাসে গেছি, নৌকোয় হয়েছি নদীপার, ঘুরেছি পদব্রজে। হিমালয়ের দুরূহ পথে বদরী-বিশালের জয়ধ্বনি শুনেছি শতযাত্রীর কণ্ঠে—কণ্ঠ মিলিয়েছি সেই ধ্বনিতে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বরের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখেছি আরো কতো পূজার্থীর পাশাপাশি। বাংলার জেলায় জেলায় পল্লীতীর্থের আকর্ষণে মেঠো পথে হেঁটেছি মাইলের পর মাইল ভক্ত শোভাযাত্রার সঙ্গে পা মিলিয়ে। কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রা কখনো করিনি!

কেউ না—শুধু আমি। কে আমার তীর্থসঙ্গী ?

কে চলেছে অমরকণ্টক তীর্থে ? কেউ না, শুধু ঐ অচেনা সহচর ফুচু। তীর্থে কেউ একলা যায় ? একলাই তো চলেছি—নিতান্ত একলা।

মিনিট দশেক এগোবার পর সামনে শেষ মোড়। বাঁ দিকে এক চওড়া রাস্তা—

সে রাস্তা গিয়েছে বিলাসপুরের দিকে। সেই দিকে সভ্যতা, সেই দিকে সংসার। ডানদিকে পাহাড়ী পথ। সেই পথ এঁকেবেঁকে উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সেই পথে পদে পদে সর্পিল ভয়। সেই পথের দুধারে ঘন অরণ্য। সে অরণ্যে সূর্যের আলো ঢোকে না। সেই পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্ভীক নিশ্চিন্তে বন্য শ্বাপদ ঘুরে বেড়ায়।

হু-হু করে বাতাস বইছে। দিগন্ত ভরে যাচ্ছে কালো মেঘের পালে। দুধারে ঘন কালো বন ক্রুদ্ধ রাক্ষসের মতো ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলছে। একধারে আকাশ-ছোঁয়া খাড়াই, অন্যদিকে অতলস্পর্শী খাদ। তার মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা চড়াই রাস্তা—পাথরকাটা এবড়ো-খেবড়ো। সেই রাস্তা বেয়ে পয়লা গিয়ারে আর্তনাদ করতে করতে বাস উঠছে—থরথর করে কাঁপছে অবিরাম।

মাঝে মাঝে কোথাও ভয়ংকর বাঁক। মাঝে মাঝে রাস্তা এতো বিপজ্জনক যে ড্রাই-ভার ডবল ব্রেক কষে দম নিচ্ছে। আর এক ইঞ্চি নড়লেই বা এক টুকরো পাথর হড়কালেই বাস অতলে তলিয়ে যাবে। কোথাও শীর্ণ ঝরনা—বাস চলেছে অতি সাবধানে তার পিচ্ছিল বুক মাড়িয়ে। জনমানব নেই। তবে কোথাও কোথাও রাস্তা মেরামতের কাজে আদিবাসী মজুরদের জটলা।

এমনি পার্বত্য রাস্তার নাম ঘাট—পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে রাস্তা চলে, কখনো চূড়ায় ওঠে, কখনো এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড় ছুঁয়ে পার্বত্য অঞ্চলকে এপার ওপার করে। এমনি ঘাটের রাস্তায় আমি কম পাড়ি দিই নি। জম্মু থেকে শ্রীনগর, শ্রীনগর থেকে রাওয়ালপিণ্ডি, দেরাদুন থেকে মুসুরি, কাঠগুদাম থেকে নৈনিতাল, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং।

সে-সব রাস্তা যেন আঁকাবাঁকা স্ট্র্যাণ্ড রোড। যেন ইচ্ছে করেই আঁকাবাঁকা করা হয়েছে ভ্রমণকারীদের মজা দেবার জন্যে—যেমন কার্নিভালে করা হয়। যে-সব রাস্তা দিশী-বিদেশী বিত্তশালী টুরিস্টদের শৌখীন অ্যাডভেঞ্চারের রাজবর্ত্ম। অসংখ্য মোটরকার ছুটছে। দামী মোটরকার—ঝড়ঝড়ে বাস বা ট্রাক নয়। মৃদু মৃদু দুলছে স্প্রিং-এর গদী, টায়ারে হোঁচটটুকু পর্যন্ত লাগছে না। নয়নাভিরাম দৃশ্য দুধারে দেখতে দেখতে কামড় দিচ্ছি কেক-স্যাণ্ডউইচে, চুমুক দিচ্ছি মধুর পানীয়ে। সারারাস্তাও বিশেষ করে বাঁকের কাছগুলি এতো প্রশস্ত যে নিতান্ত অন্ধ বা মত্ত হয়ে গাড়ি না চালালে অ্যাকসিডেন্ট নিতান্ত বিধির বিধান। বিপদ প্রায় নেই বলেই ডাইনে বাঁয়ে পদে পদে অসংখ্য বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন ও বিজ্ঞপ্তি।

কেওচি-অমরকণ্টক ঘাটের চেহারা অন্য। এ ঘাটে যারা চলে তাদের জীবনতরী এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে পাড়ি দেবার সদ্য সম্ভাবনা জেনেই তারা চলে। আজ থেকে

অনেক বছর আগে এমনি আর এক ঘাট পার হয়েছিলাম। অন্ধ্রের উত্তর-পূর্ব থেকে পূর্বঘাট পর্বতমালা পার হয়ে বস্তার রাজ্যে। তার অনেক পরে অবশ্য দণ্ড-কারণ্য পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। পথঘাটের উন্নতিও হয়েছে বিস্তর। সেই ঘাট-পথ যা ভিজিয়ানগ্রাম থেকে কোরাপুট, কোরাপুট থেকে জয়পুর, জয়পুর থেকে মাচকুণ্ড হয়ে দণ্ডকারণ্যের গভীরে প্রবেশ করেছে সে পথ নিশ্চয়ই আর তেমন দুর্গম নয়। কিন্তু কেওচি থেকে অমরকণ্টকের পাহাড়ী রাস্তা আজও পদে পদে বিপদ-বন্ধুর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিতান্ত শ্লথগতিতে বাস উঠতে লাগল। যতো উপরে ওঠে, দু-ধারে বনচ্ছায়া ততো গভীর হয়—বাতাসে শীতের আক্রমণ ততো বাড়ে। হু-হু বাতাসে মেঘ কেটে যাচ্ছে কিনা বাসে বসে বুঝতে পারছিনে। তবে দ্বিপ্রহরেও রাস্তায় রৌদ্র নেই—তাতে মনে হচ্ছে সূর্যের মুখ ঢাকা।

শেষের দিকটা বাসেব গতি বাড়ল। বুঝলাম পর্বতশীর্ষের মালভূমির কাছাকাছি এসেছি—অমরকণ্টক আর দূরে নয়।

শেষ বাঁকটা ঘুবল। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। এক লহমায় রাস্তাব দুধারের ঘন বন ফুবিয়ে গেছে। ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই। সামনে বিরাট তৃণাচ্ছাদিত মালভূমি সূর্যের আলোয় চকচক করছে। মাঝখানে মস্ত চওড়া লালচে মাটির রাস্তা। রাস্তার দুধারে মাঝে মাঝে নতুন পাকাবাড়ি উঠছে। কোনো কোনো বাড়ির গায়ে দেবনাগরী অক্ষরে সাইনবোর্ড।

ড্রাইভার বললে—পৌছে গেলেন বাবুজী। এই অমরকণ্টক।

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও নেই মাথা উঁচোনো পবতচূড়া। দিগন্ত চারদিকে ঢালু হয়ে গেছে সেখানে সবুজ পাড।

মাইল দেডেক এগিয়ে বাস থামল। চাব-পাঁচটি বিশাল গাছ। ছায়াঘেরা প্রান্তর। রাস্তাব ধাবে কযেকটি খোলাব ঘর।

মুষ্টিমেয় কটি যাত্রী। সম্ভবত তাবা কেউই তীর্থে আসে নি। তাদের পিছনে পিছনে আমি নামলাম। পা দিলাম মেকল পর্বতশীর্ষ অমরকণ্টকে। পৌছলাম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থে।

অদূরে গাছের আডালে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের শ্বেতচূড়া। শ্রান্ত অপরিচিত তীর্থ-যাত্রীকে স্বাগত জানাতে কেউ এলো না কাছে। পূজারী না, পাণ্ডা না।

ফুচ্‌লাল কেবল পাশে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—

জয় শংকরজীকি জয়, জয় নর্মদা মায়ীকি জয়!

৪

অন্ধকার কোটর থেকে বার হয়ে এলাম অরুণোদয়-মুহূর্তে। সারা বিশ্বপ্রকৃতি নিদ্রাচ্ছন্ন—ছায়াছন্ন দিক্‌দিগন্তর। পশ্চিম আকাশে তখনো কয়েকটি জ্বলজ্বলে তারা—পূর্ব চক্রবালে ম্লান লালিমার আভাস।

কনকনে শীত—কিন্তু বিন্দুমাত্র কুয়াশার আভাস নেই। বাতাসে তীব্রতা নেই, আর্দ্রতাও নেই। দূর অরণ্যে নিস্তব্ধ পত্রমর্মর, সারা চরাচর যেন শীতে থমথম করছে। গতকাল সায়াহ্নেও দিগন্তে অনেক মেঘ ছিল—সেই মেঘপুঞ্জ অদৃশ্য হয়েছে রাত্রের অন্ধকারে।

টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। সম্পূর্ণ একলা—জনপ্রাণীর সাড়া নেই, পত্রের নিশ্বাস-টুকু নেই। দাঁড়িয়ে আছি পূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে, সেখানে সিঁদুরের আভাস জাগছে। সেই সঙ্গে রূপহীন চরাচরে জাগছে রং আর রেখা। ঐ পূর্বদিগন্তটুকু ছাড়া সমস্ত আকাশ যেন নীলাভ রূপার নিস্পন্দ আস্তরণ, বনপ্রান্তের ধূসর পাড় জড়ানো।

টিলার মাথায় একটি ছোট ঘরে আমার রাতের আশ্রয়। শোবার জন্যে একটি খাটিয়া। ডবল কম্বল জড়িয়ে কুঁকড়ে শুয়েছিলাম, তৃতীয় প্রহরে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। পাশে মেঝেতে ফুর্তু শুয়ে অঘোরে নাক ডাকাচ্ছে। লেপ তোশক কম্বল চাদরের মধ্যে কোথায় তার নাতিদীর্ঘ চেহারাটা লুকিয়ে আছে বোঝাই যায় না। তবে সে অভিজ্ঞ লোক—বুঝলাম তার ভারি হোল্ড-অলের মাহাত্ম্য কী!

হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়েই বার হয়েছি। যা কিছু গরম পোশাক আছে গায়ে চড়িয়ে নিয়েছি। মোটা মোজা, মোটা পায়জামা, সোয়েটারের উপর গলাবন্ধ মোটা কোট, ভুসো কানঢাকা টুপি। কম্বল জোড়া কেবল ঘরের মধ্যে। তবু দাঁড়িয়ে থাকলে জমে যেতে হয়, আবার হাঁটতে গেলে হাঁটু চলে না। ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম সামনে—ছায়া-ছায়া নীলাভ ধূসরতার মধ্যে।

টিলার মাথা থেকে পাশাপাশি দুটি রাস্তা নেমে এসেছে। চওড়া প্রধান রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত সরু—সেটি প্রবেশ করেছে পল্লীর মধ্যে। পল্লীপথের দুধারে কয়েকটি পাকা বাড়ি। পুরোনো ধর্মশালা, সাধু ও যাত্রীর নিবাস, পাণ্ডা-পুরোহিতদের ঘর। হিমশীতল ঘুমন্ত পল্লী—প্রাণের সামান্যতম সাড়াও এখনো জাগে নি।

বাস স্ট্যাণ্ডে কয়েকটা বাস সব কটা দরজা জানলা বন্ধ করে ঘুমচ্ছে। তাদের মধ্যে নিশ্চয় কুঁকড়ে আছে ড্রাইভার কণ্ডাক্টর ক্লীনার। রাস্তার মোড়ে কয়েকটা চা পান-বিড়ি আর মুদির দোকান। একটা তো বেশ বড়ো ছাউনি, সেখানে চা জলখাবার থেকে ডাল-রুটি পর্যন্ত সব তৈরি আহার্য মেলে। সব কটির ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তায় জনমানুষ নেই, একটা কুকুরও নেই কোথাও।

গতকাল কিছুই দেখি নি। পৌছতে পৌছতে বিকেল—তারপরই ফুর্দুর নির্দেশে ছুটেছিলাম আশ্রয়ের সন্ধানে। সন্ধ্যার মধ্যে পাকা আশ্রয় চাই, নইলে ফুর্দু বললে—শীতে যদি না বাঁচি বাঘের মুখে মৃত্যু অনিবার্য।
অমরকণ্টক যাত্রীদের প্রধান আশ্রয় ধর্মশালা। এখানকার প্রাচীনতম ধর্মশালা রানী অহল্যাবাঈ নির্মিত সেই গৃহ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমানে সরকার সেটি গ্রহণ করে নতুন করে নির্মাণ করছেন। কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এ ছাড়া আরো কয়েকটি আশ্রয় আছে যাদের মধ্যে রামবাঈ ধর্মশালা ও ব্রীজমোহন শেঠের ধর্মশালা উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালে, বিশেষ করে শিবচতুর্দশীর সময় ধর্মশালাগুলি ভর্তি হয়। স্থানীয় পাণ্ডাদের ঘরে, এমন কি স্বল্পপরিসর দোকানে দোকানেও যাত্রী মাথা গোঁজে। বর্ষাকাল থেকে অমরকণ্টক যাত্রীহীন। ধর্মশালাগুলি পরিত্যক্ত নির্জন, দিকে দিকে আবর্জনা জমায়েত। আবর্জনার স্তূপ ঠেলে কোণের ত্নু-একটা ঘরে উদাসীন সাধুর আস্তানা। যাত্রীবাসের সামান্য সুবিধা এখন ধর্মশালাগুলিতে দুর্লভ।
অদূরেই ঐ উঁচু টিলা। সেই টিলার মাথায় সার্কিট হাউস ও রেস্ট হাউস। সামনে প্রকাণ্ড তৃণপ্রাঙ্গণ। সার্কিট হাউসটি দোতালা বাড়ি। খোলা বারান্দা, বড়ো বড়ো দরজা-জানালা। দেয়াল মেঝে সব ঝকঝক করছে। আসবাবে কার্পেটে পর্দার মহার্ঘ্য ব্যবহার প্রকাশ, সেখানে মহামান্য অতিথিদের আড়ম্বরপূর্ণ আমন্ত্রণ।
বাঁ দিকে সাধারণ রেস্ট হাউস। সাধারণের আশ্রয় মেলে, অবশ্য যদি সরকারী কর্মচারীরা না থাকেন। পাশাপাশি সাত-আটটি ঘর। পরিচ্ছন্ন মেঝে, প্রতিটি ঘরের দেয়ালে আলাদা আলাদা রং। কোনোটির দেয়াল সবুজ, কোনোটির হাল্কা নীল। প্রতি ঘরে একটি নেয়ার-বাঁধা খাটিয়া, একটি টেবিল, একটি চেয়ার। পাশে এক চিলতে স্নানাগার। গজ ত্রিশেক দূরে পাশাপাশি চারটি পায়খানা।
রেস্ট হাউসের ঘরগুলি ছোট হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন। ভৃত্য পরিচালকরাও ভদ্র, শ্রমবিমুখ নয়। ভি-আই-পি-দের সম্পর্কে তারা খুব কমই আসে। অচেনা বেসরকারী শরণার্থীকে সাহায্যদানে তারা অনুৎসুক নয়।

অমরকণ্টকের উচ্চতা ৩৪৯৩ ফুট। মেকল পর্বতগোষ্ঠীর উচ্চতম শিখর ও শীতলতম স্থান। অমরকণ্টকের উচ্চতম স্থান আবার এই টিলাটি, যার মাথার রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস পাশাপাশি। এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে দিগন্তের বৃত্তরেখার ঢালু। রেখা জুড়ে অরণ্যের ধূসর সবুজ পাড়।

রেস্ট হাউস ফাঁকা। একটি ঘরে আশ্রয় পেতে কোনো অসুবিধাই হয় নি। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে দু-দুবার এই টিলার মাথায় চড়তে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। প্রথমবার নিজের ব্যাগ দুটোর একটা হাতে ঝুলিয়ে আর একটা কাঁধে তুলে। দ্বিতীয়বার ফুর্দুর জন্যে। তার হোল্ড-অল বহন করা তার একলার সাধ্য নয়।

চারপাইতে গা এলিয়ে বিশ্রাম করতে আর এক কাপ চা খেতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তারপর হাত-পা-মুখ ধোবার জন্যে জলে হাত দিতেই ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে এলো আঙুল।

ফুর্দুলাল ইতিমধ্যেই মেঝেয় তার হোল্ড-অল খুলে মোটা বিছানা বিছিয়েছে। বললে- বাবুজী, অনেক ধকল গেছে, জাড়ভি বাড়ছে। আর নয়, আপনিও কম্বলে ঢুকে পড়ুন।

আমি বললাম—রাত্রে খেতে হবে না? তার ব্যবস্থা কী হবে?

বললে—তার জন্যে ফিকির করবেন না। চৌকিদারকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। এক ঘণ্টায় ডাল-রুটি-ভাজি সাপ্লাই করবে।

তারপর আমি অচেনা পথিক সূর্য ওঠার অনেক আগে আজ উঠেছি—অমরকণ্টকে কেউ এখনো জাগে নি।

টিলার মাথায় প্রত্যূষের যে আলোক-আভাস চোখে পড়েছিল, পথে নেমে তা মুছে গেছে। এখানে শুধু ধূসর অন্ধকার। সারা আকাশে নীলাভ রূপালী সমুদ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। দূরে বনশ্রেণীর ম্লান ছায়া। এই চরাচরব্যাপী নিঃশব্দ ধূসরতার মাঝখানে একলা আমি দাঁড়িয়ে আছি—মাতৃগর্ভ থেকে অজ্ঞাত ধরণীর তুহিন ক্রোড়ে আমি যেন প্রথম নবজাতক।

দিগন্তের ছায়া ধীরে ধীরে অপসৃত হলো। অদূরে আকাশের গায়ে ফুটে উঠল একটি অপরূপ শুভ্র কমল। অনির্বচনীয় বিস্ময়ে অপলক চোখে সেই আশ্চর্য শ্বেত-পদ্মটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্রমে দৃষ্টি স্পষ্ট হোলো—স্বচ্ছ আলোয় দেখলাম, ঐ বিশাল পদ্ম পদ্ম নয়, মন্দিরের শ্বেত চূড়া।

ডান দিকে মোড় নিলাম। সরু পাথুরে রাস্তা। দুধারে ঘুমন্ত কুটীর আর গোয়াল। দরজাগুলি সব বন্ধ। পায়ে পায়ে এগোলাম ঐ চূড়া লক্ষ্য করে। পৌঁছলাম নর্মদা-

মন্দিরের তোরণদ্বারে।

হে নর্মদে, মরণশীল মর্ত্যমানব তোমাকে দর্শনমাত্র জন্মমরণের দুঃখ ও সংসারের সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়। হে সর্বদুঃখভয়বারিণী মহামুক্তিদায়িনী নর্মদে—তোমার চরণকমলে আমি প্রণাম করি ॥

তোমার গম্ভীর জলপ্রবাহ দ্বারা তুমি কলিযুগে ক্ষিতিতলের সমস্ত পাপকলুষ মার্জনা করেছ, তোমার প্রবল স্রোতোচ্ছ্বাসে সংকটের পর্বতকে তুমি বিদীর্ণ করেছ, তোমার উদার ধারায় সমুদ্রহৃদয়কে তুমি উদ্বেলিত করেছ—তোমার নির্মল চরণকমলে আমি প্রণাম করি ॥

মার্কণ্ডেয়, শৌনক, বশিষ্ট, পিপ্পলাদ, কর্দম আদি ঋষিকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, দেবতা কিন্নর ও মানুষের অসংখ্য অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করেছ। তেমনি জলগর্ভের মীনকচ্ছনক্র প্রভৃতি জীব সমুদয় ও চক্রবাক আদি পক্ষী ও বিহঙ্গম সমুদয়কে তুমি সুখস্বস্তি প্রদান করেছ। তুমি কলির সর্বপাপহারিণী, সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠা—হে নর্মদে, তোমার পদপঙ্কজে আমি প্রণাম করি ॥

সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীর ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী তুমি, বিরিঞ্চিবিষ্ণুশংকরকে স্বধামে প্রতিষ্ঠাকারিণী তুমি—হে কলস্রোতিনী অমৃতানন্দদায়িনী নর্মদে, তোমার পদপঙ্কজে আমি প্রণাম করি ॥

জগৎগুরু শংকরাচার্য রচিত নর্মদাস্তোত্র কানে ভেসে এলো। সূর্য উঠল চক্রবালে। খুলল তোরণদ্বারের অর্গল। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে দ্বার খুললেন এক বৃদ্ধ পাণ্ডা।

এই স্তোত্র আটটি স্তবকে সম্পূর্ণ। তাই এর নাম নর্মদাষ্টক। শংকরাচার্য বলেছেন, —ত্রিসন্ধ্যা নর্মদাষ্টক যে পাঠ করে সে মানুষ জীবদ্দশায় কখনো দুর্গতিতে পতিত হয় না। দুর্লভ সৌন্দর্যরূপ ধারণ করে সে দেহান্তে শিবলোকে গমন করে। তার পুনর্জন্ম হয় না, ইহলোকের সর্বপাপ সত্ত্বেও রৌরবদর্শন মাত্র শাস্তিভোগ তাকে করতে হয় না।

খালি গা, খালি পা, পরনে একটি কৌপীন। বাঁ কাঁধ বেয়ে ঝুলছে ধবধবে যজ্ঞোপবীত। এই যে তুহিন শীত, যে শীতে সব গরম পোশাক গায়ে চড়িয়েও হি-হি করে কাঁপছি, সে শীতের বিন্দুমাত্র বোধ নেই। যে শীতে দেহত্বকে এক বিন্দু জল লাগলে ফোস্কা পড়ে যাবে, সেই শীতে সদ্যোস্নাত নগ্নদেহ সৌম্য বৃদ্ধ পূজারী অচঞ্চল কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন নর্মদাষ্টক।

তোরণদ্বারে অদ্বিতীয় পূজার্থী আমি। বিস্ময়ের সামান্য আভাসটুকু প্রকাশ পেল

না ব্যবহারে। স্মিতহাস্যে বললেন—আও, অন্দর আও বেটা।

রুদ্রপ্রয়াগের সেই শেঠজীর কথা মনে পড়ল। আমার পায়ে কর্কশ মোটা চামড়ার ভারি জুতো। নিচু হয়ে ফিতে খুলে জুতোজোড়া রাখলাম দরজার বাইরে এক পাশে। তারপর ঢুকলাম মন্দির-চাতালে। গরম মোজার মধ্যে দিয়ে পায়ের তালুতে তীক্ষ্ণ-হিম পিন ফুটতে লাগল।

নর্মদামন্দিরের দিকে এগোচ্ছিলাম। পাণ্ডা বললেন—কুণ্ড্ কা কিনার পর বৈঠো, ঘণ্টা হোগি তব মন্দিরমে আওগে।

বিশাল আয়তক্ষেত্র। পাথর-বাঁধানো মেঝে। চারদিকে দেড় মানুষ উঁচু পাথরের মোটা প্রাচীর। পাহাড়ের মাথায় এক দুর্ভেদ্য দুর্গ যেন। এই দুর্গপ্রাচীরের কোনায় বিশাল তোরণ। গজদন্তবর্ণ—তোরণের মাথায় চূড়ার সারি।

চত্বরের মাঝখানে একাদশ কোণবিশিষ্ট এক কুণ্ড। পরিসীমা দুশো ষাট হাত, আটদশ হাত গভীর জল। এ-ই নর্মদাকুণ্ড। এইখানেই উদ্ভূত হয়েছেন শংকর-সম্ভূতা নর্মদা।

স্থির পরিচ্ছন্ন জল। চত্বরের চারিদিকের মন্দিরের ছায়া পড়ে সে জল শীতল। চারিদিকে মন্দির, কুণ্ডের মাঝখানে মন্দির, কোনো না কোনো মন্দিরের প্রতিবিম্ব প্রত্যূষ থেকে প্রদোষান্ধকার পর্যন্ত কুণ্ডের জলে পড়বেই। এই কুণ্ডের অভ্যন্তর থেকে নর্মদা নদী নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন।

কুণ্ডের মধ্যে উত্তর দিক ঘেঁষে অমরকণ্ঠেশ্বর মন্দির। মন্দিরের মধ্যে জলের নিচে বিরাজ করছেন নর্মদেশ্বর মহাশংকর কন্যার সঙ্গে একাত্ম একাঙ্গ হয়ে। সদ্যস্ফুরিতা নর্মদা তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। কুণ্ডের জলে নেমে কয়েক হাত ডুবজল পার হয়ে মন্দিরগাত্র স্পর্শ করা চলে। কুণ্ডের উত্তর তীরে পাশাপাশি দুই মন্দির—সেই মন্দিরেও আছেন নর্মদা ও শংকর। পাণ্ডা আশ্বাস দিয়েছেন মন্দিরদ্বার খুললেই ঘণ্টাধ্বনি হবে।

পায়ে পায়ে নর্মদাকুণ্ডের উত্তর ঘাটে এলাম। হিমশীতল পুণ্যবারি অঞ্জলি ভরে নিয়ে মাথায় দিলাম।

আজ আমার জীবনের এমনই একটি দিন, যে দিনটিকে সারা জীবনে আর ভুলব না। আজ সফল হয়েছে এতোদিনের মনস্কামনা। এখনি মন্দিরদ্বার খুলবে, পাবনর্মদা-শংকরের দর্শন-আশীর্বাদ, আরো অবিস্মরণীয়, এমন দিনে অমরকণ্টক মন্দিরে আমিই প্রথম আগন্তুক। শংকর-চরণে আজ আমারই প্রথম পূজা।

৯ই পৌষ ১৩৬৯ সাল, কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথি। অতি শুভদিন আজ। এই পুণ্য দিনে

গঙ্গাস্নানাৎ সহস্র গোদানতুল্যবরম্। সহস্র গাভী দান করলে যে সুফল লাভ করা যায়, আজকের দিনে গঙ্গাস্নানে সেই সুফল। গঙ্গা অনেক দূরে, বহু উত্তরে—বিন্ধ্যপর্বত ও বিন্ধ্যারণ্যের ওপারে। আমি আছি নর্মদার উৎসে। রুদ্রস্য পুত্রী নর্মদা পরাংগতি প্রদায়িনী।

শাস্ত্রে বলেছে—

পুণ্যা কণ্খলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদিবারণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা॥

ভারতবর্ষের বিখ্যাত নদীগুলির সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য জড়িয়ে আছে। শাস্ত্র অনুসারে গঙ্গা পুণ্যময়ী কণ্খলে, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে মহাপবিত্রা। কিন্তু নর্মদার মাহাত্ম্য কোনো তীর্থস্থানের জন্য অপেক্ষা করে নেই। গ্রামই হোক, আর অরণ্যই হোক, নর্মদা সর্বত্র সর্বদা পুণ্যময়ী।

জাহ্নবীস্নান না হোক, নর্মদার বারি আজ আমি মাথায় নেব এই অমরকণ্টক মহাতীর্থে। পুণ্যসলিলা নর্মদা যেখানে পরম অমৃতময়ী সেই উৎসমুখের জলে করব অবগাহন।

দূর আকাশের বিমানযাত্রী যদি নিচের দিকে তাকায় তার মনে হবে ঘন সবুজ এক নিঃসীম সমুদ্রের মাঝখানে বুঝি শতদলবিশিষ্ট এক অপূর্ব শ্বেত-শতদল ফুটে আছে। অম্বিকা-জোড়া ঘন অরণ্যের মাঝখানে ছোট কুণ্ডটি তার চোখে পড়বে না, কুণ্ডের চারপাশে মাথা-উঁচু মন্দিরগুলি মনে হবে যেন প্রস্ফুটিত পদ্মের একটি একটি পাপড়ি। বিস্মিত হবে বিমানযাত্রী—বিমোহিত হয়ে যাবে সে। এই অপূর্ব-সুন্দর দৃশ্যের স্মৃতি সহজে সে ভুলবে না।

নর্মদাকুণ্ডের বাঁধানো চাতালের চারদিক ঘিরে নানা মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দির পাথরের। পাথরের দেওয়ালে ধবধবে সাদা রঙের আচ্ছাদন। প্রধান মন্দির পনেরো-ষোলোটি। কুণ্ডের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে।

নর্মদাকুণ্ডের তীরে চওড়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপরে যুগলমন্দিরে শংকর-নর্মদা আসীন। পাশাপাশি দুই মন্দির, মুখোমুখি তাদের প্রবেশদ্বার। উচ্চতম দুই চূড়া। আয়তনের তুলনায় মন্দিরগুলির উচ্চতা অতিরিক্ত। তারা যেন অরণ্যের দীর্ঘ বৃক্ষ-পঙ্‌ক্তিকে ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলতে চায়।

পূর্বমুখী মন্দিরটিতে নর্মদা মাতা সমাসীন। পশ্চিমমুখী মন্দিরে আছেন নর্মদেশ্বর অমরনাথ। উভয়ের মাঝখানে একই সভামণ্ডপ। কালো কষ্টিপাথরের নর্মদা মূর্তি। উন্নত নাসা, দীঘল চোখ, ক্ষীণ কটি, কঠিন বক্ষ। দেবী যোগিনী কুমারী—চির-

তপস্বিনী যেন। নিরলঙ্কার অঙ্গে সামান্য পুষ্পভূষণ। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের মন্দিরস্থিত শংকরের মুখপানে।

আনন্দবিধায়িনী আত্মজার দিকে তাকিয়ে পিতারও চোখের পলক পড়ে না। লিঙ্গরূপী নয়—দণ্ডায়মান পূর্ণাঙ্গ শ্বেতধবল মূর্তি অমরনাথ শংকরের। প্রতীক নয়, জীবন্ত পিতা যেন। ডান হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গি, নয়নে অপার স্নেহ। প্রসন্ন বাৎসল্যে চেয়ে আছেন কন্যার দিকে।

নর্মদা ও অমরনাথ। এই দুই দেবতার চরণে পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর পরম প্রণাম। এ ছাড়াও নানা মন্দির। অমরকণ্টক মন্দিরময় মহাতীর্থ। কুণ্ডের উত্তর তীরে নর্মদা-মন্দির থেকে কুণ্ড পর্যন্ত আরো চারটি মন্দির—দুটি মন্দির নর্মদা ও শংকরের, আর দুটি চতুর্ভুজের। অমরনাথ মন্দিরের সামনে দুটি—গৌরীশংকর ও গোরক্ষ-নাথ। উত্তর-পূর্ব কোণে মহাদেবজী, উত্তর-পশ্চিম কোণে রোহিণীদেবী। পূর্বতীরে দুটি মন্দিরে পার্বতী ও বালাসুন্দরী। পশ্চিমতীরে দুটি মন্দির—একাদশী ও কৃষ্ণ-মনোহর। দক্ষিণে তিনটি—গৌরীশংকর, শ্রীরামচন্দ্র ও ঘণ্টেশ্বর।

নর্মদাকুণ্ডের পশ্চিম দিকে জলনিঃসরণের একটি ক্ষুদ্র নালী। এরই নাম গোমুখ। এই গোমুখ থেকে অল্প অল্প জল একটি ক্ষুদ্রতর কুণ্ডে ঝরে পড়ছে। এই কুণ্ডটির নাম কোটিতীর্থ। কামমোহিত দেবতারা নর্মদার কাছে পরাজিত হয়ে এইখানে বসে নর্মদাবন্দনা করেছিলেন—সেই বন্দনায় যোগ দিয়েছিলেন যতেক স্বর্গবাসী। এই কোটিতীর্থের জলস্পর্শ করলে সকল বাসনার বিলয়, সকল পাপের নিবৃত্তি। এই গোমুখ থেকে নর্মদাধারা পশ্চিমযাত্রিণী। সেই যাত্রার শেষ আরব সাগরে।

নর্মদাকুণ্ডের এই মন্দিরগুলি একই সময়ে ও একই হাতে নির্মিত হয় নি। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিত্তবান ভক্তের আনুকূল্যে এগুলির প্রতিষ্ঠা। তবে এই কুণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে মারাঠা শক্তির নাম জড়িত। সর্বাগ্রে যাঁর নাম স্মর্তব্য তিনি পেশোয়া প্রথম বাজীরাও।

বালাজী বিশ্বনাথের সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহুবিস্তীর্ণ করেছিলেন। এই বিরাট সাম্রাজ্যকে সুশাসনে রাখবার জন্যে তিনি যেভাবে শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করেছিলেন, তারই ফলে কালক্রমে পুণায় পেশোয়া বংশের সঙ্গে গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া বংশ, ইন্দোরে হোলকার বংশ, বরোদায় গাইকোয়াড় বংশ ও নাগপুরে ভোঁসলা বংশের উদ্ভব হয়।

নর্মদার উত্তরে ও দক্ষিণে মধ্যভারতের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশাল

অংশ বাজীরাও-এর কর্তৃত্বে এসেছিল। দিল্লীর মুঘল সম্রাট ও হায়দরাবাদের নিজাম একযোগে বাজীরাওকে দমন করার চেষ্টা করেন। তিনি উভয়কেই পর্যুদস্ত করেন। সমগ্র ভারতে এক বিশাল ও অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখে-ছিলেন পার্বত্যমূষিক শিবাজী—সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করার পথে সফল ও সার্থক অভিযান করেছিলেন দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাও।

অমরকণ্টকে নর্মদাকুক যেখানে বর্তমান সেখানে অতীতকালে এক গভীর বাঁশবন ছিল। সেই বাঁশবনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল নর্মদার উৎস। এই উৎসকে আবিষ্কার করেন বাজীরাও। সেই সময় থেকে এ তীর্থ জাগ্রত হয়। বেণুবনের মধ্য থেকে নর্মদা প্রকাশিত হন বলে নর্মদাশংকরের অপর নাম বেণ্বেশ্বর।

মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে বাজীরাও-এর প্রতিনিধি ছিলেন গোবিন্দরাও পণ্ডিত। সাগরে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করেন। গোবিন্দরাও ও তাঁর বংশধরেরা যোগ্যতার সঙ্গে এ অঞ্চলে পেশোয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। মান্দলা ও জব্বলপুর জেলাকে তাঁরাই স্থায়ীভাবে পেশোয়া-রাজ্যের অধীনে আনেন। বাজীরাও-এর পুত্র বালাজী বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করেন। কিন্তু এই শিখরস্পর্শ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

বাজীরাও-এর মৃত্যুর ষাট বছর পরের কথা। ইতিমধ্যে নাদির শাহের আক্রমণে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, তেমনি পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা জাতির ভারতে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশায় ভাঙন ধরেছে। পলাশীর যুদ্ধে ভারতবাসীর নূতন পরাধীনতার বীজ উপ্ত হয়েছে—বিশৃঙ্খলা অনৈক্য ও গৃহ-বিবাদের ফলে পেশোয়া মাধবরাও-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হতে চলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পেশোয়া-প্রতিনিধির কাছ থেকে নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলা মান্দলা ও জব্বলপুর অঞ্চলের অধিকার পান অমরকণ্টক তীর্থের পৃষ্ঠ-পোষক হন ভোঁসলারা। কথিত আছে অমরকণ্টকে নর্মদাকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেন এক ভোঁসলা রাজা।

তখন মারাঠা শক্তির মুমূর্ষুকাল। মারাঠারা নানা বিরোধী দলে বিভক্ত। কারো মধ্যে কোনো মিল নেই। এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ তাদের উপর শেষ আঘাত হানতে তৎপর। রাজ্যশাসনে ভোঁসলাদের সুনামও নেই। তাঁরা প্রজাপীড়ক ও স্বার্থপর। পিণ্ডারি দস্যুদের সঙ্গে তাঁদের গোপন মিতালী। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজের হাতে মারাঠা শক্তির চরম বিনাশ হলো। ভোঁসলা রাজা আপ্পা সাহেব সীতাবলদির যুদ্ধে ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণ

পরাজিত হলেন ও রাজ্য হারালেন।

ভোঁসলাদের আমলে নর্মদাকুণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সূত্রে এই কুণ্ড ও তার চার দিকের মন্দিরাদি খুব প্রাচীন নয়। ভারত ইতিহাসের মধ্য ও তৎপূর্ববর্তী যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শৈলীর নিদর্শনও এই মন্দিরগুলিতে নেই।

অমরকণ্টক প্রসঙ্গে আর এক মহীয়সী মহারাষ্ট্রীয় মহিলার নাম করতে হয়। তিনি চিরস্মরণীয়া হোলকার রানী অহল্যাবাঈ। তিনি শংকরের চির-উপাসিকা। শংকরমূর্তিকে তিনি সারাজীবন বক্ষে ধারণ করে রেখেছিলেন। যেমন নর্মদা, তেমনই তিনি। অহল্যাবাঈ মরদেহধারিণী শংকরকন্যা। তাঁর স্মৃতি অমরকণ্টকের প্রাচীনতম যাত্রীনিবাস।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত অমরকণ্টকের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রেওয়া-রাজ। রেওয়া রাজপরিবারের দানদাক্ষিণ্যের কথা এখন অমরকণ্টকবাসীর মুখে মুখে।

স্বাধীনতার পর যখন বৃটিশযুগের করদ ও সামন্ত রাজাদের স্বাধীন সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান আরম্ভ করলেন, তখন বিন্ধ্যের দক্ষিণে পঁয়ত্রিশটি খণ্ডরাজ্যে বাঘেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ড বিভক্ত। বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ড—সুপ্রাচীন চেদীরাজ্যেরই যেন পশ্চিম আর পূর্ব অংশ। দুই অংশে রেষারেষির শেষ নেই।

সর্দার প্যাটেল এই পঁয়ত্রিশটি রাজাকে একসঙ্গে বাঁধলেন। এদের প্রধান প্রমুখ হলেন বাঘেলখণ্ড অন্তর্ভুক্ত রেওয়ার অধিকর্তা। বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডকে এক করে বিন্ধ্যপ্রদেশ নামে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে। রেওয়া তার রাজধানী। বর্তমানে এই কেন্দ্রশাসিত বিন্ধ্যপ্রদেশ মধ্য-প্রদেশ রাজ্যে বিলীন হয়েছে। রেওয়ার আর কোনো রাজত্ব নেই। কিন্তু রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সে যুগের রেওয়া রাজ্য বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া বিভাগ। রেওয়া, সিধি, সাতনা, পান্না, ছতরপুর, টিকমগড় ও শাডোল জেলা নিয়ে এই রেওয়া বিভাগ। বিভাগের মুখ্য নগরী রেওয়া। অমরকণ্টক এই বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব কিনারে। রেওয়া শহর থেকে অমরকণ্টক পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে—দূরত্ব একশো চৌষট্টি মাইল। অমরকণ্টক মন্দিরের সামনে যে বিরাট সুন্দর শ্বেত তোরণটি—সেটি রেওয়ারাজের দান। নির্মাণকাল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ।

বেশ বেলা হয়েছে। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে মন্দির চূড়াগুলি। এখন আর কুণ্ডের জলে নামলে জমে যাবার ভয় নেই। ফুদ্দু লাল এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে দুটি নারকেল। মহার্ঘ ফল। পেণ্ড্রা বাজারে চড়া দামে কিনে হোল্ড-অলের মধ্যে সাবধানে পুরে এনেছিল।
শংকর-নর্মদার অতি প্রিয় পূজা-উপচার।

৫

তিনদিনের বেশী আর একদিনও ফুর্হ লালকে রাখতে পারলাম না। অল্পমেয়াদী কড়ার করেই অবশ্য সঙ্গে এসেছিল—ঘরে নাকি তার ভাইপো-বউ সন্তানসম্ভবা। তাই যতো শীঘ্র ঘরে ফেরার জন্যে সে ব্যস্ত।
তা ছাড়া—নর্মদামায়ীর পূজন তো সারলেন, বাকি দু-চারটে পুরানা মন্দির-উন্দির দেখে লিন—ব্যস, আর কীই বা আছে এই পাহাড়ী শীতের জংলী দেশে।

পাহাড়ী শীতই বটে। পর্বতচূড়ার শীত, গভীর অরণ্যভূমির শীত। একমাত্র ভরসা আকাশ পরিচ্ছন্ন, দিগন্তে কোথাও মেঘের ইশারা নেই। মাঝ-রাত্রে শীতের আঘাতে চকিতে ঘুম ভেঙে যায়—কুকুরকুণ্ডলী হয়ে কম্বলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে হয়, দুরদুর করে বুক। সূর্য উঠতে না উঠতেই বাইরের আহ্বানে প্রাণ টানে। নড়া-চড়া করে মনে হয় বেঁচে আছি। রৌদ্র আনে জীবনের উত্তাপ, আলোক আনে অমৃতের আস্বাদ।
এই ঋতুতে অতিথির কোনো আমন্ত্রণ নেই। এ সময়ে অমরকণ্টকে কোনো যাত্রী আসে না, ধর্মশালাগুলি জনবিরল। কয়েকটি মাত্র দোকান—তার অনেকগুলিরই ঝাঁপ বন্ধ। পথে লোকজন নেই বললেই হয়, শূন্য মন্দিরদ্বার। বিরল পূজার্থী। চারিদিক নিশ্চল, নিশ্চুপ। প্রকৃতির নীরব নিভৃতিতে নর্মদাশংকর যেন আদিম ধ্যানে সমাহিত।
দেবাদিদেবের এই বিশাল তপঃক্ষেত্রে আমি পায়ে পায়ে প্রবেশ করেছি। পৌছেছি নিরূপণবিহীন অনন্ত অতীতের অজ্ঞাত দেশে—অমবকণ্টকের চূড়ায়। একলা আমি। এক অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত ভরে উঠেছে আমার। মনে হচ্ছে, এই হিম-শীতল গোপনতায় এই মহান তীর্থ বুঝি আমারই জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। তার সব মহিমা, সব সৌন্দর্য, সব দাক্ষিণ্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল শুধু আমারই প্রতীক্ষায়।

দ্বিতীয় রাত্রেই বুঝলাম, ফুর্হ লালের আর সইছে না। যতো ভারি তার হোল্ড-অলই হোক না কেন, রেস্টহাউসের সব কটা জানালা দরজাই বন্ধ থাকুক না কেন—ঠাণ্ডায় বেচারা কাহিল! বয়েস তো হয়েছে হাজার হোক।

তবু তাকে উত্তপ্ত করবার জন্যে বললাম—এক দিনেই তো যাই যাই করছ ফুদু´ ! তবে যে বলেছিলে, আগে এক এক বার এসে দিন দশ-পনেরো করে কাটিয়ে গেছ !

গেছি বৈ কি বাবুজী ! একবার এসে তো পুরো দেড় মাস কাটালাম। সে আসতাম রাজাসাহেবদের সঙ্গে। কতো লোক-লস্কর, সান্ত্রী-সেপাই, সঙ্গে লালমুখো বাঘা বাঘা সাহেব। তখন মন্দিরে নারকেল নিয়ে আসতাম না। বাবুজী—আসতাম জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে।

সে কতো দিনের কথা ফুদু´ ?

অনেক সাল হলো। তখন অংরেজী জমানা। মহারাজা মালিক। সারা শাডোলে শিকারী বলতে এই ফুদু´কেই চিনত। এখন দিন বদলেছে, নিজেও বুড়ো হয়ে গিয়েছি—এখন আর আমার খবর কে নেয় ?

১৯৫০-এর আগে অমরকণ্টক ছিল রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত। রেওয়া মহারাজের শিকার-প্রীতি কার অজানা ? তিনিই গভীর অরণ্যে সাদা বাঘ ধরেছিলেন। সেই বাঘকে হলুদ ডোরাকাটা বাঘের সঙ্গে সংগম করিয়ে শাদা বাঘের পরিবার সৃষ্টি করেছেন। প্রাণীজগতের এক মহাবিস্ময়ের সৃষ্টিকর্তা। সারা পৃথিবীর বিস্ময়।

ফুদু´লাল আমাকে বোঝাতে বাকি রাখে নি যে সারা বাঘেলখণ্ডের সবচেয়ে জবরদস্ত বাঘশিকারী সে। বাঘ এখনো আছে, তবে তার আর বয়স নেই, হাতে হাতিয়ার নেই—তাই আমার মতো নিরীহ অহিংস তীর্থযাত্রীর সাথী হতে সে রাজী হয়েছে।

তা ছাড়া, আজকাল দুরবস্থায় পড়ে খানদানী খাওয়া-দাওয়া জোটে না। তাই অজীর্ণ রোগ ফুদু´র নিত্য সাথী। সেই রোগের জন্য সে ডাক্তারী দাওয়াই এনেছে এক বোতল।

সন্ধ্যাবেলা রেস্ট-হাউসের বন্ধ ঘরে হোল্ড-অলের বিছানার উপর কম্বল জড়িয়ে বসে বোতলটি সে খুলল। বড়ো কড়া দাওয়াই। গন্ধটি আমার চেনা। আমার অজীর্ণ রোগ নেই—তাই গন্ধতেই আমার মাথা ঝিমঝিম করে এলো। আমি জানি, এ দাওয়াই ফুরলে ফুদু´র ফিরে না গিয়ে উপায় নেই।

তাই বলে ফুদু´লাল গাইড ফাঁকি দেবার পাত্র নয়। দু-দিনেই চকির পাক ঘুরিয়ে সে আমাকে কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়ে আনল। দেখাল মাঈকা বাগিয়া, মার্কণ্ডেয় আশ্রম, ভৃগু কমণ্ডলু আর জালেশ্বর। তারপর দম ফুরিয়ে গেল তার।

মাঙ্গকী বাগিয়া নর্মদা মাতার বাগিচা বা উদ্যান। মন্দির থেকে মাইল দেড়েক দূরে—পূর্ব দিকে। উঁচুনিচু পাহাড়ী পথ। দুধারে কিছু বসতি ছাড়িয়েই অরণ্যের শুরু। ঘন বনের মাঝখানে এতো বিশাল ও এতো মনোরম একটি উদ্যান কোথায় লুকিয়ে আছে, নিতান্ত সামনাসামনি না পৌঁছলে বোঝাই যায় না। শুধু বিশাল নয়, অতি প্রাচীন উদ্যান। বহুদিনের পুরোনো সব গাছ। ফল ও ফুল উভয় গাছের সমন্বয়। এই অরণ্য-পাহাড়ের রাজ্যে নানা প্রকার ফলফুলের বাগান সাজানো অতি বিস্ময়কর। জননী নর্মদার নামে এমনি মনোরম ও বৃহৎ উদ্যানটি যাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা সত্যিই এক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

সারা অমরকণ্টকে এমন দ্বিতীয় কোনো বাগান নেই। অবশ্য মন্দিরের পশ্চিম দিকে কোটিতীর্থের গায়ে সম্প্রতি নূতন এক গান্ধী স্মারক উদ্যান পরিকল্পিত হয়েছে। এ বাগানটি সবে শুরু, তবে ধীরে ধীরে এটিও একটি অতি মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান হবে। এই মাঙ্গকী বাগিয়ায় গুলবকাওলি ফুলের দেখা পাবার কথা। নামটি পরিচিত—উর্দু কবিরা এই ফুলের অনেক বন্দনা গেয়েছেন। এই ফুল নাকি মধ্যভারতে অমরকণ্টক ছাড়া আর কোথাও মেলে না। ফুর্দু ও গুলবকাওলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই ফুল চোখের পক্ষে খুব উপকারী। অমরকণ্টকে গুলবকাওলির সুর্মা কিনতে পাওয়া যায়।

দুঃখের বিষয়, শীতকালে মাঙ্গকী বাগিয়ার সৌন্দর্য নিষ্প্রভ। গুলবকাওলি ফুল দেখার সৌভাগ্যও হলো না। শুনলাম, গুলবকাওলির চারাগাছও অধিকাংশ উপড়ে নিয়ে এখানে ওখানে লাগানো হয়েছে। বাগানে কয়েকটি জীর্ণশীর্ণ গাছ চোখে পড়ল—কলাপাতি বা কেনা গাছের মতো চারা—পাতাগুলি বাঁশপাতার মতো সরু। সাদা সাদা ফুল হয়, কিন্তু তার রূপ আর গন্ধ অদেখা-অজানাই রয়ে গেল।

মার্কণ্ডেয় আশ্রম মন্দির থেকে মাইল খানেকের মধ্যে—অগ্নিকোণে। এই স্থান মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যার ক্ষেত্র। তিনি সপ্তকল্পজীবী—শংকরের বরপুত্র। প্রতি কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে নর্মদা তাঁকে রক্ষা করেন। শংকর-নর্মদার পরম ভক্ত তিনি। এইখানে বসে তিনি শিবতপস্যা করেছিলেন।

মার্কণ্ডের ভার্গ বংশীয় মহামুনি। কর্দম ঋষির কন্যা খ্যাতির গর্ভজাত ধাতা ঋষির পৌত্র মার্কণ্ডেয়। পিতা মহাঋষি মৃকণ্ডুর বহুদিন পর্যন্ত কোনো পুত্রসন্তান হয়নি। এই দুঃখে ঋষি ও ঋষিপত্নী সর্বদা ম্রিয়মাণ। শেষ পর্যন্ত মৃকণ্ডু পুত্র-লাভার্থে ঘোর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে শূলপাণি শম্ভু তাঁর সামনে আবি-

ভূ́ত হলেন। ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ করে শুধালেন—

মৃকণ্ডু, কী বর তুমি চাও ?

মৃকণ্ডুর মনস্কামনা এবার সিদ্ধ হবে। তিনি বললেন—দেবাদিদেব, আমি অপুত্রক। পুত্র-বর চাই।

প্রীত মহেশ বললেন—

তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট। অচিরে পুত্র লাভ করবে তুমি এবার বলো, কেমন পুত্র তুমি চাও ? আমার বরে শতবর্ষজীবী এক পুত্র লাভ করতে পারো – সে পুত্র কিন্তু মূর্খ হবে। পরিবর্তে মহাপণ্ডিত পুত্রও তোমাকে আমি দিতে পারি—কিন্তু তার আয়ু হবে চোদ্দ বৎসর মাত্র। এখন তোমার যা অভিরুচি !

মৃকণ্ডু বললেন—

আমাকে স্বল্পজীবী জ্ঞানী পুত্র দান করুন। দীর্ঘজীবী মূর্খ সন্তান আমি চাই না।

শংকরের বরে মৃকণ্ডু-পুত্র মহাজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় জন্মলাভ করলেন।

বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলে যখন মার্কণ্ডেয় পদার্পণ করেছেন তখন দেখেন, পিতা-মাতার মুখ বিষাদ-ধূসর, সর্বদা তাঁরা অশ্রুজল বিমোচন করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতে পিতা শিবের আশীর্বাদের কথা তাঁকে জানালেন। বললেন—বৎস, তোমার আয়ুদীপ নির্বাপিত হতে আর দেরি নেই। মহেশের মহাবরে তুমি উজ্জ্বলভাতি অথচ ক্ষণস্থায়ী শিখা—সেই শিখার নির্বাণ আসন্ন জেনে আমরা দুঃখ করছি।

মার্কণ্ডেয় পিতামাতাকে প্রবোধ দিলেন। তারপর সংসার ত্যাগ করে গেলেন। শংকরপ্রিয় এই অমরকণ্টকের গভীর অরণ্যে তিনি শিবতপস্যায় রত হলেন। পণ—হয় তপস্যারত অবস্থায় মৃত্যু, না হয় শিব বরে চিরজীবন লাভ।

এমনিভাবে যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তপস্যা করছেন মার্কণ্ডেয়, তখন তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট আয়ুর অবসান হলো। সেই বিজন অরণ্যের গভীর অন্ধকারে উপস্থিত হলেন মৃত্যুরূপী যম। যম তাঁর গলদেশে কালরজ্জুর ফাঁস পরিয়ে টান দিলেন। সেই মুহূর্তে স্বয়ং আবির্ভূ́ত হলেন শংকর। যমকে তিনি নিরস্ত করলেন, কালকে তিনি প্রতিহত করলেন। মার্কণ্ডেয়কে করলেন মৃত্যুঞ্জয়।

অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম বিশিষ্ট পুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে শংকর-নর্মদার পবিত্র রহস্য মার্কণ্ডেয় কর্তৃক বিধৃত।

মার্কণ্ডেয় আশ্রম অতি মনোরম স্থান। চারধারে বড়ো বড়ো গাছ। বিশাল বৃক্ষ ছায়ার নিচে কয়েকটি প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি। সাধুর শান্ত আশ্রম। প্রসন্ন ঋতুতে সাধুরা এখানে বাস করেন। শিবপ্রসাদজী ব্রহ্মচারী নামে এক মহাপ্রাণ তপস্বী অনেক বৎসর এখানে কাল কাটিয়েছেন।

যথেষ্ট বেলা থাকতে ফুদুর্লাল তাড়া দিয়ে বার করল। জঙ্গলের পথে তিন-চার মাইল যাওয়া, আবার ফিরে আসা। সন্ধ্যার আগে আশ্রয়ে ফেরা চাই।

চলেছি এবার মন্দির থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জনহীন শব্দহীন অরণ্যপথ বেয়ে। মধ্যাহ্নের সূর্য সবে হেলেছে। আরামপ্রদ উত্তাপ। মার্কণ্ডেয় আশ্রম দেখা হলো—এবার গন্তব্য ভৃগুক্ষেত্র।

অমরকণ্টক তীর্থের সঙ্গে পৌরাণিক যুগের আর এক মহামুনির নাম সংশ্লিষ্ট। তিনি ভৃগু। নর্মদার শুরু ও শেষ—দুই প্রান্তেই ভৃগুমহিমা। সাগরসংগমের নিকটবর্তী ব্রোচ বা ভরোচ নগরকে ভৃগুক্ষেত্র বলা হয়। এইখানে মহর্ষি ভৃগু বাস করতেন। এটি তাঁর তপস্যার স্থান। এর নাম ভৃগুকচ্ছ। আর নর্মদার উৎসস্থল অমরকণ্টকেও ভৃগুর তপোভূমি আছে। সেই স্থানের নাম ভৃগু-কমণ্ডলু।

ব্রহ্মার দশ মানসপুত্রের অন্যতম ভৃগু। ব্রহ্মা করেছিলেন যজ্ঞ—সেই যজ্ঞাগ্নির শিখা থেকে ভৃগু আবির্ভূত হন। তাই তাঁকে যজ্ঞসম্ভব বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—তিনজনই ভৃগুকে সমাদর করতেন। ভৃগু একবার ঘুমন্ত বিষ্ণুকে পদাঘাত করে জাগিয়েছিলেন। ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন বিষ্ণুনারায়ণ।

পৌরাণিক ইতিহাসমতে ভৃগু ভারতবর্ষে প্রধান আর্য-ব্রাহ্মণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বংশের নাম ভার্গব বংশ। প্রাচীন ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তারে সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়েরা। তাঁরা বাহুবলে প্রাক-আর্য অধিবাসীদের পরাজিত ও অধীনত করেছিলেন। আর্যসভ্যতার সাংস্কৃতিক প্রচারক ছিলেন মুনি-ঋষিরা। অরণ্য-কান্তারে তাঁরা ছিলেন নির্ভীক অভিযাত্রী। অরণ্য-অন্ধকারে তাঁদের তপোবনগুলি ছিল আর্য-সংস্কৃতির আলোকপ্রদীপ। ভার্গব বংশ প্রাচীন আর্যাবর্ত ছাড়িয়ে পশ্চিমে ও দক্ষিণে আর্য-অভিযানে পুরোধা হয়েছিলেন। এই বংশের প্রধান পুরুষ পরশুরাম—যিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

আনর্তদেশ বা বর্তমান গুজরাট ভার্গবদের আদি বাসভূমি। এইখান থেকে ভার্গব-প্রতিভা সারা ভারতে ছড়িয়েছিল। ভার্গবরা ক্ষত্রিয়দের গুরু ছিলেন, ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। ভৃগুকচ্ছ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতে সমস্ত পশ্চিম উপকূল জুড়ে মহাভার্গব পরশুরাম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের এই দুর্গম পর্বত-অরণ্য অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলেও কোনো আদি ভার্গবের পদক্ষেপ নিশ্চয়ই হয়েছিল। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, ভৃগুমুনি স্বয়ং এই অমরকণ্টকে এসে গভীর শিবতপস্যা করেছিলেন। তাঁর সেই তপোভূমি ভৃগু-কমণ্ডলু।

ভৃগু-কমণ্ডলু নামটি কৌতূহলোদ্দীপক। সেই কৌতূহলের টানে চার মাইল হেঁটে

যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে কিন্তু কিছুটা হতাশই হতে হলো। পর্বতের গায়ে ছোট একটি গুহা। সেই গুহামুখ থেকে এক শীর্ণা জলধারা বার হয়েছে। এই গুহামুখই ভৃগুমুনির কমণ্ডলু। জলধারা কিছু দূরেই অদৃশ্য হয়েছে। তারপর এক ক্ষীণা নদীর রূপ ধারণ করে ন-দশ মাইল দূরে দক্ষিণ দিক থেকে নর্মদা নদীর সঙ্গে মিশেছে। নর্মদার এই উপনদীর নাম করগঙ্গা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাতে না ঘনাতেই রেস্ট-হাউসে এসে আশ্রয় নিয়েছি। রেস্ট-হাউসের চৌকিদারের অনেক অনুগ্রহ। হাতমুখ ধোবার জন্য গরম জল দিয়েছে এক বালতি। তারপর থালি সাজিয়ে দিয়েছে রুটি, ভাজি আর ডাল। সারা দিনের ক্লান্তির পর হাত-পা আর নড়ছে না। সেই সঙ্গে নামছে শীত। চারপাই এর উপর বসেই খাদ্যের থালিটা শেষ করেছি।

সাতটা বাজতে না বাজতেই চারদিক হিম হয়ে এলো। বাইরে গভীর কুয়াশা নামছে। সারা অমরকণ্টকের কঠিনতম শীত এই টিলার মাথায়। শীত আর কুয়াশা ঘিরে আছে আমাদের। তার মাঝখানে আত্মরক্ষার জন্যে দরজা জানলা বন্ধ করেছি। গরম পাৎলুন, সোয়েটার, গরম কোট কিছুই ছাড়ি নি। সব কিছুর উপর কম্বল জড়িয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছি।

ফুর্ত্তলাল তার বিছানার ফাঁক থেকে হাত বার করে বোতল থেকে ক-চুমুক ওযুধ খেয়ে নিল। কতো কী যে ব্যাণ্ডেজ করে করে সারা গায়ে সে জড়িয়েছে তার ঠিক নেই—তবু জ্বরেভোগা বুনো ভালুকের মতো ঠকঠক করে কাঁপছে। বললে—

আজ রাতটা নর্মদাজী বাঁচিয়ে রাখুন বাবুজী!

আমি বললাম - ঘাবড়িয়ো না ফুর্ত্তলাল। রেওয়ার বাঘের মুখে তুমি মরো নি, রেওয়ার শীতেও তুমি মরবে না।

কম্পিত হাতে ব্যাগটা কাছে টেনে নিলাম। তার মধ্যে অতিরিক্ত একটা সোয়েটার ছিল। লাল টকটকে, এই বয়সে পরতে লজ্জা করার মতো রং। তবু বিপদের সম্বল হিসেবে সঙ্গে এনেছিলাম।

সোয়েটারটা ফুর্ত্তর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কম্বলের মধ্যে কান-মাথা ডুবিয়ে দিলাম। কানে এলো ঘণ্টাধ্বনি। অমরকণ্টক মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে।

অমরকণ্টকে তৃতীয় দিন। আজ ফুর্ত্ত চলে যাবে। কাল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত বারে বারে সে অনুরোধ করেছে আমাকে, চলুন বাবুজী, চলুন। বলেছে, এক দিন যদি ক-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে, তারপর এখানে থাকলে মৃত্যু অবধারিত।

আমি তাকে প্রবোধ দিয়েছি, বাঘ-মারা বুড়ো বলে ঠাট্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছি দু-জনেই।

আজ ফুদ্দু ঘুম থেকে উঠেছে আমার আগে। কাঁপতে কাঁপতে চৌকিদারের উনুন-পাড়ে গিয়ে গরম চা এনে আমাকে ডেকে তুলেছে, মুখের কাছে ধরেছে জীবন-দায়ী উষ্ণ পানীয়। তারপর প্রথম কথা বলেছে—

আজ ফিরবার দিন বাবুজী। তাড়াতাড়ি করুন।

প্রভাতের প্রথম ভাষা আমি উচ্চারণ করেছি ফুদ্দুকে ধমক দিয়ে—কী হলো? অতো ছটফট করছ কেন ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই? এখুনি তোমার বাস ছাড়ছে নাকি?

গোঁসা হচ্ছেন কেন বাবুজী? জালেশ্বর দেখা বাকি রয়েছে না?

তুলনা নেই আজকের প্রভাতটির। এতো সুন্দর, এতো মহান, এতো উদার! এ প্রভাত যেন প্রকৃতির প্রসন্নতম আশীর্বাদ!

কাল রাত্রের কুয়াশার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই দিকচক্রবালে। নিঃসীম নীলিমার পূর্বাঞ্চলে সোনার আভাস। সূর্যোদয় যেন স্বর্গের কোন্ অনিন্দ্য পদ্মের আত্ম-উন্মোচন।

পথের জন্য প্রস্তুত হতে যেটুকু সময়, সেই দেরিটুকুও সয় না। রেস্ট-হাউস থেকে বার হয়ে এলাম। সামনে পূর্বাশার দিকে তাকিয়ে ফুদ্দু বললে—জয় নর্মদা! তার-পর রেস্ট-হাউসের পিছনের গেট দিয়ে নেমে কিছুটা গিয়ে পড়লাম পাকা রাস্তায়। এই রাস্তা উত্তরগামী এক বিশাল সড়ক। সবচেয়ে চওড়া, সবচেয়ে সুসংস্কৃত। রেওয়া আর অমরকণ্টকের মধ্যে এই সড়ক সংযোগ রক্ষা করছে। অমরকণ্টক মালভূমিকে আড়াআড়ি উত্তর দক্ষিণে ভাগ করেছে এই রাস্তা। বাঁ দিকে প্রান্তর, ডান দিকে কিছুটা দূরেই গভীর পাহাড়ী খাদ। প্রান্তরের মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল বনস্পতি, ছায়ায় ছায়ায় গ্রাম্য বসতি। ঘুমন্ত কুটীর সব।

মালভূমির মাথায় খাদ্যশস্যের চাষের সুবিধা নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা অধিকাংশই পশুপালক। পথে কয়েকটা বড়ো বড়ো খাটাল পড়ল। খাটাল-ভর্তি বিশালদেহ কালো মহিষ। মাঠেও অনেক মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। কাঁচা রোদের সোনালী হলুদ চিকচিক করছে তাদের গায়ের ধূসর রোঁয়ায়, তাদের বাঁকানো জোড়া শিঙে। চটের দোলাই বাঁধা কয়েকটা রাখাল ছেলে আছে তাদের পিছনে।

ফুদ্দুলালের সংসারী বুদ্ধি খেলে গেল। বললে—বাবুজী, একটু আসুন আমার সঙ্গে। একটা কাজ সেরে যাই।

এক কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে সে হাঁক পাড়ল। বেরিয়ে এলো একটি গ্রাম্য যুবতী।

ফুত্‌র্‌লাল বললে—খোয়া ক্ষীর দেখাও।

অমরকণ্টকের আশেপাশের বস্তির গোয়ালারা খোয়া ক্ষীর বানায়। অপর্যাপ্ত দুধ—ক্ষীর করে চালান দেওয়া সহজ। হাতির দাঁতের রং—যেমন অনবদ্য স্বাদ, তেমনি অপূর্ব গন্ধ। পেণ্ড্রা বাজারে যে দাম, এখানে তার অর্ধেকেরও কম। খোয়া ক্ষীরের বিশাল চারটি তাল ফুত্‌র্‌লাল বিচক্ষণের মতো দরদস্তুর করে ঝুলিতে ভরল। গাঁটের পয়সা মেয়েটির হাতে তুলে দেবার সময় গালমন্দও কিছু দিল। গরগর করতে করতে বললে—

অচেনা দেখে বেটী আমাকে ঠকাচ্ছিস?

প্রায় মাইল চারেক বড়ো রাস্তা ধরে গেলাম। বসতি শেষ হয়েছে। বাঁ দিকে ধু ধু প্রান্তর। ডান দিকে গভীর বন। সেই বন খাদের অন্ধকারে কোথায় নেমে গেছে। ঘন জঙ্গলের ওপারে আবার পাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড়। অরণ্য-ছাওয়া উঁচু-নিচু নানা পর্বতচূড়ার বঙ্কিম রেখা দিগন্তকে আড়াল কবে করে ফুটে আছে।

ডান পাশে পাথরের দুটি বিরাট চাঙড় পাশাপাশি—এক জোড়া নিশ্চল ঐরাবত যেন। তাদের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। এইখানে মোড় নিলাম।

ফুত্‌র্‌লাল বললে—এবার সামনে বাবুজী জালেশ্বর।

পাহাড়ী হাঁটা পথে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী ঢালু বেয়ে সেই পথ নেমেছে। ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে পথ, ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে উৎরাই। দুধারে উঁচু উঁচু প্রাচীন গাছ, সেইসব গাছের রুক্ষ বল্কল ঢাকা মোটা গুঁড়ি আর এবড়ো-খেবড়ো পাথবেব চাঙড় এড়িয়ে এড়িয়ে সরু পথ ঘুরে ঘুরে নেমেছে।

প্রভাত-সূর্যের তির্যক রশ্মি গাছগুলির ঝাঁকড়া মাথা ভেদ করে নিচে পৌছতে পারছে না। ছায়া ছায়া অন্ধকার। তা ছাড়া গড়ানে আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডীতে কোথাও মোটা মোটা শিকড় মাথা তুলে আছে, কোথাও কাঁটালতার কামড়। দূরে ডান দিকে এখনো পর্যন্ত দু-একটি কুটীরের মাথা দেখা যাচ্ছে—কিন্তু প্রাণপণ চিৎকাব করলেও গলার শব্দ সেই কুটিরের ধারে গিয়ে পৌছবে বলে মনে হয় না—দু-ধারের গাছের গুঁড়িতে আর পাহাড়ী দেয়ালে বৃথাই মাথা ঠুকে ফিবে আসবে।

ফুত্‌র্‌লাল আমার সামনে সামনে চলেছে—পদে পদে আমাকে সাবধান করছে। বড়ো সড়কের গোয়ালাদের গ্রাম পার হবার পর জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মেলে নি। এখন এই অন্ধ পাকদণ্ডীতে তো কথাই নেই। মনে হচ্ছে, আমারই মতো গা ছমছম করছে ফুত্‌র্‌রও, তাই সে মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছে—জয় জালেশ্বর মহা-দেব কি জয়, জয় নর্মদামায়ী কী জয়! সে জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি নৈঃশব্দ্যের আকু-লতাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

জালেশ্বর মহাজাগ্রত তীর্থ। পুরাণে এই তীর্থের অনেক উল্লেখ আছে। ত্রিপুরারি শংকর ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করে বিশ্রাম করেছিলেন ভীমা বা চন্দ্রভাগা নদীর উৎসস্থানে। যুদ্ধক্লান্ত শ্রান্ত শিবের স্বেদবারী থেকে ভীমা নদীর উৎপত্তি। সেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমশংকর সমাসীন। ত্রিপুরের তিন পুরের একটি পুর পতিত হয়েছিল নর্মদা-উৎসের নিকটবর্তী এই জালেশ্বরে। এখানেও ত্রিপুরারি শংকরের মহাতীর্থ। জালেশ্বর প্রীত হলে সকল শত্রুর ক্ষয়। তীর্থযাত্রীরা নর্মদাকুণ্ডের জল পাত্র ভরে এনে জালেশ্বরের মাথায় অর্পণ করে। এই নর্মদা-সলিল বাবা জালে-শ্বরের বড়ো প্রিয়।

পাহাড়ের ঢালুতে কিছুটা সমতল ভূমি। তারপর কয়েক পা এগিয়েই গভীর খাদ। এই সমতল ভূমির মাঝখানে জালেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

ছোট সাদা রঙের মন্দিরটি। দরজার মুখে বৃষভ-নন্দী। দ্বারশীর্ষে ঘণ্টা। ডান দিকের চাতালের পাশেই বেশ বড়ো একটি ইঁদারা। এক পাশে মনোরম একটি আশ্রম। আশ্রমে সাধুর কুটির। আশ্রমের উদ্যানে গোলাপ গাঁদা বৈজয়ন্তী প্রভৃতি ফুলের গাছ।

শূন্য কুটীর, শূন্য মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শীতের সকালে একটি পাখির 'ডাকও নেই। বাগানে অনেক মৌসুমী ফুল ফুটেছে। ওরা বুঝি আপনি ফোটে, আর আপনি ঝরে যায়। শুধু বোধ হয় দুপুর বেলায় গুনগুন করে আসে মৌমাছিরা। মন্দিরের মধ্যে বসে আছেন জালেশ্বর মহাদেব। পূজাবিহীন, উপচারবিহীন শুষ্ক শিবলিঙ্গ।

এ আমাকে কোথায় আনলে ফুর্হুলাল? মার্কণ্ডেয় আশ্রম বা ভৃগু-কমণ্ডলুর নির্জনতায় বিস্মিত হই নি। কিন্তু জালেশ্বর যে মহাতীর্থ! পূজারী নেই, একটি পূজার্থী নেই! শুনেছিলাম, মেলার সময় নর্মদা-কুণ্ড থেকে জালেশ্বরের মধ্যে যাত্রীর অবধি থাকে না। এখন শীত—তাই বলে মহাদেব এতো নিঃসঙ্গ, এতো একাকী?

আমি অপ্রস্তুত পথিক, কোনো পূজোপচার নেই আমার সঙ্গে। না পত্র-পুষ্পাঞ্জলি, না ধূপ প্রদীপ। পাশে একটি কূপ আছে কিন্তু তার গভীর থেকে জল তোলার কোনো উপায় নেই। বাবার মাথায় এক অঞ্জলি জল দিতেও পারলাম না। আছে শুধু প্রণাম। সেই বিজন মন্দিরে শুষ্ক শীতল পাথরে লুটিয়ে প্রণাম করলাম ত্রিপুরারি জালেশ্বর মহাদেবের চরণে।

হঠাৎ কানে এলো মানুষের গলা। ফুর্হুলালের নয়—আর কারো। এমনি নির্জনে

এ কণ্ঠের অধিকারী কে ? চমকে উঠতে হয়।

উঠো, উঠো ভাইয়া ! ইয়ে লেও, শিবজী কা শির্ পর চড়াও !

ঠিক পিছনেই ছায়া। ফিরে তাকালাম, উঠে দাঁড়ালাম খাড়া হয়ে।

রুক্ষ ধূসর আলুলায়িত চুল, রোদের সোনালী লাগা রুক্ষ গেরিমাটির মতো গায়ের রং। রুক্ষ রক্তিম হ্রস্ব চোলিব বন্ধনে বিদ্রোহী যৌবন, নাভির নিচে খয়েরী রঙের খাটো ঘাগরা। হাতের শক্ত কব্জিতে মোটা কঙ্কণ, পায়ে আরো মোটা জুড়ি-মল, ঘন পল্লব-ছাওয়া কালো চোখ, সাদা দাঁতে যেন বিদ্যুৎ-ঝলক !

ডান হাতের পিতলের ঘটিটি এগিয়ে দিল। ঘটি ভর্তি জল।

কোথা থেকে কখন এলো এই একলা পূজারিণী—নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হয়ে ? অপ্রত্যাশিত ভাগ্য আমার। দ্বিরুক্তি না করে ঘটিটি নিলাম হাত বাড়িয়ে। মহাদেবের মাথায় দিলাম প্রভাতের প্রথম জলাঞ্জলি।

মেয়েটিও জালেশ্বরের মাথায় জল ঢালল আমাব পাশে দাঁড়িয়ে। তারপর ঘাগরার প্রান্ত থেকে বার করল এক জোড়া রক্ত-গোলাপ। একটি গোলাপ আমায় দিল। মহাদেবের মাথায় দিলাম। আর একটি গোলাপ দিল সে।

ফুচুঁ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে। মেয়েটি ফুচুঁর দিকে তাকিয়ে ধমকের স্বরে বললে—লাও, লাও, তুমভী পানি চড়াও !

তারপর দাঁত বার করে হাসল।

৬

পিতলের সানকি ভর্তি মোটা চালের ভাতের উপর ফুটন্ত গরম ডালের হাতাটা উলটে দিল অযোধ্যাপ্রসাদ। তার উপর ছড়িয়ে দিল একমুঠো মুচমুচে নামকিন। বললে—গরমাগরম খেয়ে নিন বাবুজী—আরাম পাবেন।
পেণ্ড্রার ফিরতি বাস চলে গেছে। সেই বাসে উঠেছে ফুর্তু আর তার হোল্ড-অল। আমাকে ফেলে যেতে ফুর্তুর মন সরে নি। সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই অজ্ঞাত অপরিচিত অরণ্যরাজ্যে আমি থেকে যাব। তার কর্তব্যে সে ত্রুটি করে নি। মোটামুটি যা দেখাবার সবই আমাকে দেখিয়েছে। হাঁউমাউ করে তারপর প্রতিবাদ জানিয়েছে। অভিমান ভরে ফেরত দিতে চেয়েছে আমার লাল সোয়েটারটা। শেষ পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে বলেছে—রাতবিরেতে আপনাকে বাঘে খাবে বাবু!
কিন্তু ফুর্তুলাল কেমন করে জানবে কতো কী আমার অদেখা রয়ে গেছে অমরকণ্টকে—যা দেখানো তার সাধ্যের বাইরে!

এবার আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, সম্পূর্ণ একা। পূর্ব পরিচিত কেউ আর নেই। এইবার চোখ ভরে আমি দেখব, কান ভরে আমি শুনব, অনুভব করব প্রাণ ভরে। একান্ত অচেনা বলেই অচেনাকে চিনবার আকুলতায় মুহূর্তে মুহূর্তে মন্থিত হবে মন। কেউ আর ডাকবে না নাম ধরে, তাই যাকে ভালো লাগবে, পরমানন্দে তাকেই ডাকব কাছে, শুধোব তার নাম।
ওরা অনেকেই অনেক দিন আমাকে বলেছে—এ তোমার কেমন ব্যাভার? একলা একলা ঘুরে বেড়াও, সঙ্গে প্রিয়জন বন্ধু-বান্ধব না থাকলে ভালো লাগে নাকি? সঙ্গী ছাড়া কি বেড়ানো যায়? সঙ্গী থাকলে কতো সুখ! সঙ্গী সঙ্গীকে দেখে, ভ্রমণের আনন্দে যোগ দেয়, অবসাদ মোচন করে, গালগল্প করে একাকীত্বের বিস্বাদ ক্লান্তিকে ঘুচিয়ে দেয়। সঙ্গী থাকলে কি জাত যায়?
না, সঙ্গী থাকলে সত্যিই জাত যায় না। সেই জন্যেই তো একলা একলা ঘুরি। সঙ্গী থাকলে জাত খোয়ানো যায় না, ভোলা যায় না নিজের পুরোনো নাম।
ওরা বলে—নিঃসঙ্গ ভ্রমণিক তুমি, তুমি স্বার্থপর উদাসীন!
প্রতিবাদ করিনে, কিন্তু ওদের কথা সত্যি নয়। স্বার্থপর নই বলেই নিঃসঙ্গ তীর্থ-

যাত্রা আমার প্রিয়। সঙ্গীর মায়া না কাটালে সঙ্গী জোটে না। মনে ব্যাকুলতা ফোটে না সঙ্গীত্বের। সেইসব পথের সঙ্গী পথপ্রান্তের মিত্র। গোধূলি আকাশের বর্ণচ্ছটার মতো ক্ষণিক তাদের সাহচর্য, কিন্তু দিনে দিনে বিচিত্র আভায় বিচিত্র রঙে তারা প্রোজ্জ্বল।

নতুন সঙ্গী অযোধ্যাপ্রসাদ। বাস স্ট্যাণ্ডের ধারের ভাজিপুরীর দোকানের সে কারিগর। সে ই আমার অমরকণ্টকবাসী প্রথম বন্ধু।

রেস্ট হাউসের চৌকিদার করজোড়ে বললে—যদি অনুমতি করেন, আপনার খানা পাকানো হতে রেহাই দিন। এই জাডে একলা মানুষের জন্যে আলাদা রসুই করতে বড়ো কষ্ট হয়। অযোধ্যার দোকানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কথাটা সত্যি। সারা রেস্ট-হাউস সার্কিট-হাউসে দ্বিতীয় কোনো অতিথি নেই। মাত্র একজনের জন্যে রান্না করার মজুরি পোষায় না, বিশেষ করে এমনি হাড়-কাঁপানো শীতের সকাল-সন্ধ্যায়।

ভালোই হলো আমারও। আর একটা বন্ধন ঘুচল। অযোধ্যা আদর করে ডেকে নিল তার দোকানে। ভোরে জাব্বাজুব্বি চাপিয়ে যখন রেস্ট হাউস থেকে নেমে আসি, তার অনেক আগেই তার কাঠের উনুনের গনগনে হাঁ-র মুখে কেটলি-কড়াই চেপেছে। উনুনের ধারে খদ্দেরের জমায়েত। সবাই উবু হয়ে আগুনে হাত-মুখ সেঁকছে। ভুসো কম্বলে পিঠ-মাথা ঢাকা। কানে জড়ানো ফেট্টি। অযোধ্যা ফুটন্ত গরম চা আর ঝুড়িভাজা নামকিন সামনে ধরে। দুপুরে মোটা ভাত, রাত্রে মোটা রুটি। সঙ্গে ডাল, ভাজি আর চাটনি। মহিষের ঘন দুধ আর খোয়া ক্ষীরের লাড্ডু অতিরিক্ত।

স্থায়ী দোকান। বারো মাস খোলা থাকে। সামনে নিকোনো মাটির শক্ত মেঝেতে কয়েকটি সবুজ রং করা বেঞ্চি আর হাই-বেঞ্চি। বাসের ড্রাইভার ক্লীনার কণ্ডাক্টররা আমার সঙ্গে খায়। খায় গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, গোয়ালা আর কাঠুরিয়ারা। রাত্রে বেঞ্চিগুলো সরিয়ে মেঝের উপর চট-কম্বলের বিছানা পড়ে। ঝাঁপ বন্ধ করে শুলে কাঠের উনুনের নিভন্ত আঁচে বেশ ওম হয়ে থাকে জায়গাটা।

আমি সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এর ওর সঙ্গে আলাপ করি। লম্বা লম্বা হাঁটি, কখনো বা রাস্তার রোদ্দুরে বেঞ্চি পেতে বসে থাকি। সারাদিন শেষ করে রাত্রের খাওয়া সেরে টিলার মাথায় উঠি—আশ্রয় নিই রেস্ট হাউসে।

অমরকণ্টককে একটি লোকরঞ্জক ভ্রমণকেন্দ্র করা মধ্যপ্রদেশ সরকারের অভিলাষ।

তার প্রথম উপায়স্বরূপ অমরকণ্টকের সঙ্গে বিভিন্ন দিকে পাকা সড়কের সংযোগ ব্যবস্থা। পববর্তী পর্যায়ের কাজে লেগেছেন অমরকণ্টক নগরবিকাশ বোর্ড। গহন অরণ্যভরা এই দুরধিগম্য মালভূমিকে নাগরিক সৌকর্যে সম্পন্ন করা সহজ ব্যাপার নয়। তবু মনে হয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন হবে অমরকণ্টকে। অমরকণ্টক আর সে অমরকণ্টক থাকবে না।

লালমাটির পশ্চিমগামী রাস্তাটি বিরাট চওড়া। তার দুপাশের অরণ্যকে যতো-দূর সম্ভব পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দুধারে ছোটবড়ো নানা সরকারী আধা-সরকারী দপ্তরের বাড়ি উঠছে। বড়ো বড়ো প্লটে বেসরকারী লোককে জমি বিলিও করা হচ্ছে। সেইসব কোনো কোনো প্লটে বাড়ি তৈরি ও শুরু হয়েছে।

সরকারী প্রধান অবদান ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস। পাওয়ার হাউস সাধারণত দিনান্তে জাগ্রত হয়, গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে। সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এই পাওয়ার হাউস থেকে সরকারী ভবনগুলিতে মন্দিরে ও প্রধান রাস্তার ধারে ধারে বিজলী আলো। ছোট ছোট দোকানপাটে ও স্থানীয় অধিবাসীদের কুটীরে অবশ্য ইলেকট্রিকের প্রসাদ এখনো পৌছয় নি।

এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ডাকঘর, সংস্কৃত বিদ্যালয়, বনশিক্ষা কেন্দ্র, হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতি। সম্প্রতি স্থাপিত সার্কিট হাউস ও রেস্ট হাউস যথেষ্ট আরামদায়ক আশ্রয়স্থল। রানী অহল্যাবাঈ-এর প্রাচীন ধর্মশালা ভেঙে সেখানে একটি খুব বড়ো যাত্রীনিবাস সরকারী প্রযত্নেই গড়ে উঠছে।

অমরকণ্টকের এধারে ওধারে নানা খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পুরোমাত্রায় আরম্ভ হয়েছে। নানা স্থানে খনিজসন্ধানী বিভাগের তাঁবু। তাছাড়া মন্দির-বাজার থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরপশ্চিমে বনের মধ্যে বক্সাইট আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে ভূমিসাৎ হচ্ছে অরণ্য, ভূমির গভীরের গুপ্তধন তোলার কাজে তৎপর হয়েছে এক ভারতবিখ্যাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। কাজে লেগেছে আদিবাসী মেয়ে-পুরুষের দল।

• দোকানে বিজলী আলো আনবে, অযোধ্যাপ্রসাদের এ শখ অনেক দিনের। যেদিন থেকে পাওয়ার হাউস চালু হয়েছে, প্রায় সেদিন থেকেই। অমরকণ্টকের সবচেয়ে বড়ো দোকান, বাস স্ট্যাণ্ডের ধারে মোড়ের মাথায় সবচেয়ে সেরা পজিশন। কী শীত, কী বর্ষা, বছরে একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে না। চা-জলখাবার তো মেলেই, ভাত-রুটির ঢালাও বন্দোবস্ত। ক-জন সরকার কর্মচারী বাঁধা খদ্দের। রাত্রে মেহমানদের আশ্রয় দিতেও কার্পণ্য নেই। একবার যদি ইলেক-

ট্রিক আনতে পারে, তাহলে আর দেখে কে? জলুসে-রোশনাইতে ফেঁপে উঠবে ব্যবসা, ফেটে পড়বে ভাগ্য।

আমি বললাম—তা বিজলী আনতে অস্থবিধে কী তোমাদের?

মালিক বেজার বাবুজী। একদম মত নেই। বলে, বিজলী আনলে কারবার জ্বলে যাবে!

মালিক থাকে পেণ্ড্রায়। বছরে একবার আসে শিবরাত্রির মেলায়। অযোধ্যা শুধু প্রধান কারিগর নয় ম্যানেজারও বটে। পিছনের ঘরে তার স্ত্রী থাকে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে। পর্দার আড়ালে বসে কুটনো কোটে, রুটি বেলে।

অযোধ্যা বলে—শহর বাজারে থেকেও শেঠের মনটা বিলকুল গাঁইয়া রয়ে গেল বাবুজী। নইলে এমনি তার ধারণা? এই দেখুন না, এখানে একটা গানাবাজানার আয়োজন করছি। দোকানেই হবে, সারা পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক আসবে। খুব-সুরত নাচওয়ালী সারা রাত নাচবে, পাম্প বাতিতে কি তার রূপের খোলতাই হয়?

আমি বললাম—কিছু ভেবো না অযোধ্যা। আর কটা বছর যেতে দাও, তোমার এই দোকান জব্বলপুরের রইস হোটেলকে হার মানাবে। পাকা বাড়ি হবে, মেঝেয় কার্পেট পড়বে, দেয়ালে রঙিন পর্দা। ডাইনিং হলে কাঁচের টেবিলে কাঁচের বাসন আর রূপোলি কাঁটাচামচ বিজলি-টিউবের জ্বলজ্বলে আলোয় ঝকমক করবে।

উজ্জ্বল অথচ কিছুটা ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাল অযোধ্যা। আমার কথা কতোটা বুঝল সে-ই জানে। শুধু বললে—তখন আমার কী হবে বাবুজী?

তখন কি আর আটা মাখবে তুমি? না কাঠের জালে লোহার চাটুতে রুটি বানাবে? তখন তুমি কালো পাৎলুন আর সাদা গলাবন্ধ কুর্তা পরে টেবিলের ধারে বসে ঘণ্টা বাজাবে। সেই ঘণ্টা শুনে ছুটোছুটি করবে তোমার কর্মচারীরা।

অযোধ্যাকে যে আশ্বাস দিয়েছি—শংকর করুন সে আশ্বাস অনতিবিলম্বে সত্য হোক। অমরকণ্টকে ইলেকট্রিক এসেছে, মাইন খোলা হচ্ছে, কারখানার সম্ভাবনা জাগছে। তার অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্ত রূপে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা আর মেহনতী মানুষের ভিড় পায়ে পায়ে এসে এখানকার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতাকে নষ্ট করবে, এখানকার মানুষকে পাপবিদ্ধ করবে, এখানকার প্রশান্ত নির্মল প্রকৃতিকে মলিন করবে, এমনি বাঁকা কটাক্ষ আমি করি নি। আমি নিতান্ত সরলভাবেই এখানকার উন্নয়ন-পরিকল্পনার উপর আস্থা রেখেছি। কামনা করেছি অমরকণ্টক দিনে

দিনে বহুতর তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের সহজগম্য ও আকর্ষণীয় হোক। পথঘাট সুগমতর হোক, যানবাহন ব্যবস্থা উন্নততর হোক, আশ্রয় আরো পর্যাপ্ত ও আরামদায়ক হোক।

প্রথম কোনারক গিয়েছিলাম চল্লিশ মাইল বালুকা সমুদ্রের উপর পায়ে হেঁটে, গভীর রাত্রে নদী সাঁতরে। রাত দশটায় পুরী থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, পৌছে-ছিলাম পরদিন অপরাহ্নে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলাম চার মাইল দূরের গ্রাম থেকে চাল সংগ্রহ করে। আজ শত শত মোটরবিহারী প্রতিদিন সকালের প্রাতরাশ খেয়ে পুরী-ভুবনেশ্বর থেকে বার হন, ফিরে আসেন রাত্রির খানার আগে। দুপুরে কোনারকের হোটেলে হোটেলে চিকন চালের ভাতের সঙ্গে মাংসের সুরুয়া। রাত্রি-বাসের অভিরুচি হলে ডানলোপিলোর শয্যা। এটা কি মন্দ?

যে তীর্থ যতো দুর্গম, যতো ক্লেশকর, সেই তীর্থের মাহাত্ম্য ততো বেশি এ আমি বিশ্বাস করি নে। আমি বিশ্বাস করি যে তীর্থে যতো বেশি ভিড়, সেই তীর্থই ততো বড়ো। ভক্তের প্রার্থনামন্ত্রেই দেবতার ঘুম ভাঙে, ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আকাঙ্ক্ষা। ভক্তসম্মিলনই তীর্থের প্রাণ।

শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রী আচার্য শংকর। সমগ্র ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম তিনি বারে বারে পরিভ্রমণ করেছিলেন পদব্রজে। ভারতের চার প্রান্তে তিনি চার মঠ স্থাপন করেন। পশ্চিমে দ্বারকা ক্ষেত্রে সারদা মঠ, পূর্বে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ এবং উত্তরে হিমালয়ের কোলে বদরীনারায়ণের পদতলে জ্যোতির্মঠ। আজ ভারতের সর্বতীর্থ দর্শন করিয়ে আনছে শত শত যাত্রীবাহী অগুনতি স্পেশ্যাল ট্রেন। গৌড়াবতার শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিমে বৃন্দাবন থেকে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন পায়ে হেঁটে। এখন মথুরা থেকে বৃন্দাবন আর ত্রিবান্দ্রম থেকে কেপ পর্যন্ত সামান্য পথটুকুও পদযাত্রার কথা কেউ ভাবে না। পঞ্চপাণ্ডব থেকে প্রবোধ সান্যাল পর্যন্ত চরণ সম্বল করে যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। সেই কঠোর পরিব্রজ্যার কথা আজ গল্পকথা মাত্র।

তাই বলে তীর্থের মাহাত্ম্য কমে নি। ভক্ত যদি আরাধ্যের কাছে পৌছবার পথটা সুগম করে নেয়, আরাধ্য-সকাশে বাসসুখটা একটু সহনীয় করার চেষ্টা করে, তাতে দেবতারই লাভ।

মরুতীর্থ হিংলাজ দুরূহ বলেই জাগ্রত হয় নি। অথচ হিঙ্গুলা শ্রেষ্ঠ সতীতীর্থ। পীঠ-নির্ণয়ের তালিকায় সর্বপ্রথম তার নাম। সেখানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়েছিল। অথচ সতীর কড়ে আঙুলটি মাত্র যেখানে পড়েছিল, সেই কালীঘাটের মাহাত্ম্য অতুলনীয়। সেই কালীঘাট ঘিরে আধুনিক সভ্যতার কুম্ভীপাক। ভারতের সব-

চেয়ে জনবহুল সমস্যাসঙ্কুল এবং আবর্জনা-বিপুল নরক-নগরী কলকাতায় তার অবস্থান।

হিংলাজ বর্তমানে ভারত সীমান্তের বাইরে মাহাত্ম্য তার বিস্মৃতির গর্ভে। শিব-শিখর কৈলাস এমনিতেই দুর্গম—বর্তমানে চীনের কবলিত। কিছুদিন পরে ইন্দ্রপুরী মেরু পর্বতের মতো কৈলাসও পৌরাণিক কল্পনায় আশ্রয় পাবে। কিন্তু বারাণসীর আশ্রয় ত্রিলোকনাথের ত্রিশূলে। তার কারণ বারাণসী ভারতের মধ্য-স্থানে। আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নাব্য নদী গঙ্গার কূলে, আর্য সংস্কৃতিধারার মহাসংগমে। অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানে যেমন আছে, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে বারাণসীর আবেদন। লক্ষ ভক্তের পূজা-আরাধনায় অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ সেখানে চিরজাগ্রত। ত্রিকালজয়ী চিরন্তন তার মাহাত্ম্য।

অযোধ্যাব ভাজিপুবীর দোকান যেদিন খানদানি হোটেলে রূপান্তরিত হবে ততো দিনে অমরকণ্টক একটি অতিপ্রিয় শৈলনিবাসে পরিণত হবে। লোকজন বাড়বে, দোকান-পসার জমবে, উপাজনক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। পাহাড়ী পথের ধারে মনোরম পরিবেশে ছবির মতো সাজানো পেট্রোল স্টেশন বসবে, মনমাতানো বোম্বাই ছবির প্ল্যাকার্ড পড়বে নবনির্মিত সিনেমা হাউসে।

তাই বলে অমরকণ্টকের মাহাত্ম্য মলিন হবে না। অমরকণ্টক পাঁচমারি নয়। পরাধীন যুগের পরাশ্রিত সভ্যতার বিলাসগ্লানি তার অঙ্গে নেই। তীর্থের আমন্ত্রণে পুণ্যের আবেদনে অমরকণ্টক চিরমহান। স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা-প্রযত্নের সঙ্গে ধর্মের চির-আবেদন অমরকণ্টককে মধ্যপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ শৈলপুরীতে পরিণত করবে। এর রূপায়ণ পূত হবে নর্মদা শংকরের আশীর্বাদে।

এবং সেই সঙ্গে যা সর্বান্তঃকরণে আশা করি—অমরকণ্টকের কর্ণমন্দিরাদির সংস্কার ও সুরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হবে।

অমরকণ্টকের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন কর্ণমন্দির। এই মন্দিরের মহিমা আজ অবলুপ্ত, এর প্রতিষ্ঠাতার নাম পর্যন্ত বিস্মৃত। খুবই কাছে—তবু যাত্রীরা কদাচিৎ এই মন্দির দেখতে যায়। মহাকাব্যের এক মহাবীর নায়কের নাম এই মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—সেই নামগৌরবে একে ঘিরে পৌরাণিক কল্পনা।

নর্মদা মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে কর্ণমন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি সেই কল্পনারই প্রতিধ্বনি করলেন। বললেন—কুন্তীর প্রথম সন্তান সূর্যপুত্র কর্ণ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

মহাভারতের সেই কর্ণ ?

হাঁ মহারাজ, সেই কর্ণ। জন্মমুহূর্তে কলঙ্কের ভয়ে মাতা যাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি প্রথম পাণ্ডব। নিতান্ত ভাগ্যের অভিশাপে কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে ভ্রাতা অর্জুনের হাতে যিনি হীনভাবে ধ্বংস হন। সেই কর্ণই শংকরের আরাধনা করেছিলেন অমরকণ্টকে। তাঁরই মন্দির ঐ কর্ণমন্দির।

সূতপুত্র বলে ঘোষিত কর্ণের ক্ষাত্র পরিচয় ছিল না। দুর্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করে চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ করেন। কর্ণ এই নর্মদা-উৎসে এসেছিলেন কবে ? সেই মন্দিরে শংকরের পূজারতি স্তব্ধই বা হলো কেন ?

আমি প্রশ্ন করলাম—

কিন্তু সেই মন্দির পরিত্যক্ত কেন মহারাজ ?

কর্ণের নিজেরই পাপে। জীবনে অনেক অভিশাপ তিনি কুড়িয়েছিলেন। পরশু-রামকে ছলনা করে তিনি তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছিলেন। জানতে পেরে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, চরম মুহূর্তে ব্রহ্মাস্ত্রশিক্ষা তিনি বিস্মৃত হবেন। অযথা ধেনুবধ করায় এক মহাতেজা ব্রাহ্মণের শাপে জীবনের শেষ যুদ্ধে মেদিনী তাঁর রথের চাকা গ্রাস করেছিল। কিন্তু এসব পাপ কিছুই নয়। এপাপের প্রায়শ্চিত্ত তো তিনি জীবন দিয়েই করে গিয়েছিলেন—তাই না ?

ঠিকই তো।

পুরোহিত বলে চললেন—

সূর্যের ঔরসে তাঁর জন্ম, বিষ্ণু ঘোষণা করেছিলেন, তার দাতাকর্ণ নাম, ইন্দ্র তাঁকে দিয়েছিলেন মহাশক্তি। কিন্তু এমন মহাপাপ তিনি করেছিলেন, যার ফলে নর্মদা-শংকর তাঁকে ক্ষমা করেন নি, প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর পূজা।

কী এমন মহাপাপ কর্ণ করেছিলেন ?

বৃদ্ধ বললেন—

কুরুপাণ্ডবের দ্যূত-দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করুন। যুধিষ্ঠির সব হারিয়ে শেষ পণ রেখে-ছিলেন পাঞ্চালীকে। এই দানও তিনি হারলেন। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় টেনে নিয়ে এলেন, তখন সেই মহাসতীর বস্ত্রহরণের প্রস্তাব কে করেছিল জানেন ? মনে পড়ে, ঐ বর্বর কুৎসিত উৎসবে সবচেয়ে উৎসাহ আর উল্লাস দেখিয়েছিলেন কে ? ঐ সূতপালিত কর্ণ। নারীর এই চরম অপমান চিরপবিত্রা নর্মদা সহ্য করেন না, সহ্য করেন না নর্মদা শংকর।

এ অবশ্য পৌরাণিক কল্পনা মাত্র।

বেলা থাকতে থাকতে কর্ণমন্দিরের দিকে হাঁটা দিলাম। নর্মদামন্দির আর কোটি-

তীর্থের মাঝখানের লালমাটির রাস্তা দিয়ে পূর্বদিকে। নর্মদামন্দিরের প্রাচীর ছাড়িয়ে দুধারে উন্মুক্ত প্রান্তর। এধারে ওধারে কয়েকটা মলিন কুটীর। কিছুটা এগিয়েই রাস্তা সরু হতে হতে রুক্ষ মাটিতে বিলীন হয়েছে। পাহারা দিচ্ছে কাঁটা-লতা আর বন্য গুল্ম। দশ মিনিটও নয়, এরই মধ্যে সম্পূর্ণ জনপরিত্যক্ত। মানুষ-জন নেই, একটি পশু চরে না। পিছনে গভীর বন।

বনের মুখেই বিশাল উঁচু এলাকা। সেইখানে সুপ্রাচীন অর্ধভগ্ন মন্দিররাজি! সমস্ত এলাকা জুড়ে পাশাপাশি সামনে পিছনে বিভিন্ন উচ্চতার পাঁচ ছ'টি মন্দির। লাল পাথরে তৈরি, মহান তাদের স্থাপত্য, অপূর্ব তাদের গঠন ও কারুকার্য, আকাশ-ছোঁয়া তাদের চূড়া। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটির নাম রংমহল, একটি কেশবনারায়ণ, একটি মৎস্যেন্দ্রনাথ ও সর্বপ্রধানটির নাম কর্ণমন্দির।

ঠোকর খাচ্ছি মাটির উপর জেগে-ওঠা মোটা শিকড়ে—পা জড়িয়ে ধরছে কাঁটা-লতার দল। এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রয়েছে ছোট বড়ো প্রস্তরখণ্ড। ফাটা দেয়ালের গা থেকে মোটা শিকড় বেরিয়েছে। সেই শিকড়ের চাপে চিড় ফেটে কবে দেয়ালটা খানখান হয়ে যাবে তারই অপেক্ষা।

সামনের মন্দিরটিতে ঢুকে দেখি জীর্ণ চীর পরিহিত কয়েকজন জটাধারী বসে আছে। যেমন হতশ্রী, তেমনি নোংরা। ফাটা মেঝের এধারে ওধারে অঙ্গারের স্তূপ, রাত্রি-বেলাকার ধূনির অবশেষ। তারা একবার ঘোলা চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল নির্বাক নিরাসক্তিতে।

আর কেউ কোথাও নেই। চারিদিকে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধ। কেমন ভয়ে গা শিরশির করে উঠল। নিতান্ত সন্ত্রস্তভাবে পাশ কাটিয়ে আমি পিছন দিকে এগোলাম। পূজা-হীন পরিত্যক্ত নিষ্প্রাণ সব প্রস্তরস্তূপ। দিনান্তের সূর্যালোকে কর্ণমন্দিরের রক্তাক্ত চূড়া।

অমরকণ্টকের প্রাচীনতম মন্দির এই কর্ণমন্দির। মহাভারতের কর্ণ এই মন্দির নির্মাণ করেন নি। খাজুরাহোর মন্দিরগুলির প্রায় সমসাময়িক অমরকণ্টকের এই আদি শংকরমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কর্ণদেব। তিনি চেদীমহাচন্দ্র নামে খ্যাত ছিলেন। এই মন্দিরের নির্মাণকাল দশম একাদশ শতাব্দী। ইতিহাস তাদের ভুলেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এপর্যন্ত অমরকণ্টকের এই আদি মন্দির-গুলির দিকে ফিরে তাকায় নি। পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনের আশ্রয়টুকুও তারা পায় নি। তাদের গায়ে নীল এনামেলের সরকারী বিজ্ঞপ্তিটুকুরও পাত্তা নেই। অমর-কণ্টকের শংকরভক্তের দল তাদের খোঁজও রাখে না। তারা শুধু শেষ অবলুপ্তির চরম ভাগ্যের জন্য যুগ যুগ ধরে নিভৃতে অপেক্ষা করে আছে।

৭

কাঁচা-হলুদ রোদ-রাঙানো গেরুয়া মাটির পথ। সেই পথে বাদামী ঘাগরা উড়িয়ে হেলে দুলে ঝমর-ঝমর চলে—মনে হয় এক ঝলক সোনালী আলো যেন চলেছে ওকে ঘিরে। কপাল আর কানের কুণ্ডল, হাতে কঙ্কণ আর পায়ে মল। তাদের বিচিত্র নিপুণ কারুকার্যে সূর্যরশ্মি পড়ে স্ফুলিঙ্গের মতো ঝলসে ঝলসে ওঠে,—ছটায় ধাঁধিয়ে যায় চোখ। চোখ কিন্তু ফেরে না, আটকে থাকে ওর অতিপিনদ্ধ চোলির স্ফুরিত রেখায়, ওর উড্ডীন উত্তরীয়ের রঙিন প্রান্তে।

কুবের-কিংকর যক্ষের ভাগ্যে প্রেমের অভিশাপ। সেই অভিশাপে হিমালয় প্রান্তের অলকাপুরী থেকে সে নির্বাসিত হলো একেবারে মধ্য ভারতের রামগিরিতে। কামনার মোক্ষধাম সেই অলকা, যেখানে কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা। সেই অলকায় বিরহী যক্ষের মেঘদূতের যাত্রা। পথিশ্রমক্লান্ত মেঘের প্রথম বিশ্রাম আম্রকূট পর্বতে। পরবর্তী যাত্রা বিন্ধপদমূলবাহিনী বিশীর্ণা রেবার তীরে তীরে।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত অমর কাব্যে বর্ণিত আম্রকূট বা অমরকূটই অমর-কণ্টক। গভীর কাননশোভিত শিখরের রূপ সুন্দরী ধরিত্রীর শ্যাম স্তন ইব। যার আকর্ষণে গিরিশীর্ষে স্তব্ধগতি মেঘ, সেই চারুনয়না বনচরবধূর দেখা আমি বুঝি পেয়েছি। ঐ সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো চিনেছে—কিন্তু কাজল চোখের এক পলকের কটাক্ষে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়—ফিরেও তাকায় না আর। জালেশ্বরের মন্দিরে ওকে দেখেছিলাম, নিজে থেকে আলাপ করেছিল। তা কি ভুলে গেছে?

গলাটা যতোদূর সম্ভব নিরাসক্ত করে অযোধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটা কে হে?

অযোধ্যা বললে—কার কথা বলছেন?

ঐ যে চলে গেল ঘাগরাওয়ালী।

ও তো বাঞ্জারিন। দেওকী ওর নাম।

বনচরবধূই বটে। বাঞ্জারা এ অঞ্চলের এক বিচিত্র খণ্ডজাতি। ওদের পরিবার আছে, কিন্তু সংসার নেই, স্থায়ী কোনো বাস নেই। ওরা যাযাবর যুথবদ্ধ অবস্থায় এখানে

ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কৃষি-সভ্যতা ওদের টানতে পারে নি, স্থায়ী গৃহবাসী কৃষক-জীবন ওদের জন্যে নয়। পূর্বতন পশুপালক স্তরে ওরা মহানন্দে রয়ে গেছে। ওদের দলে থাকে মহিষের পাল। তাদের ওরা চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। চারণক্ষেত্রের পাশে এখানে ওখানে সাময়িক ডেরা বাঁধে। দুধ বেচে, খোয়া ক্ষীর বানিয়েও বেচে। কিছুদিন এক জায়গায় থাকে, তারপর আবার ডেরা তুলে অন্যত্র পাড়ি দেয়। কোনো কোনো দলে মহিষে টানা গাড়ি থাকে, তাতে থাকে জঙ্গলের কাঠ। শীতের রাত্রে খোলা আকাশের তলায় কাঠের আগুন জ্বেলে নিদ্রা দেয়।

মেয়েপুরুষ উভয়েরই বিচিত্র পোশাক। পুরুষদের রঙিন খাটো ধুতি আর কুর্তা। হাতে মোটা লাঠি। মেয়েরা পরে চড়া রঙের ছড়ানো ঘাগরার উপর পিঠ খোলা অতি হ্রস্ব চোলি। তাতে যুবতীদের পুষ্ট দেহশ্রী উদ্ধততর হয়ে প্রকাশ পায়। অনেকে নেয় একটা অযত্নলম্বিত ওড়না।

সবচেয়ে চোখে পড়বার মতো মেয়েদের অলঙ্কার। গহনা ওদের বড়োই পছন্দ। মন্দিরার মতো দেখতে বড়ো বড়ো কুণ্ডল ওদের কানে, কপালে ঠিক সিঁথির মুখে আরো বড়ো একটা কুণ্ডল, হাতে ভারি কেয়ূর, পায়ে মোটা খাড়ু। অলঙ্কার অধিকাংশই তামার বা রাং-পিতলের—কিছু কিছু রুপোরও থাকে। কিন্তু আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতীক তারা। অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্য, নিখুঁত ছিলেকাটা গায়ে আলো পড়ে ঝকঝক করে।

বাঞ্জারা মেয়েরা নির্দিষ্ট পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে। তারা পরিবারবদ্ধ, কিন্তু ঘর করে না এক ঠাঁই। আলাদা করে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার পাতবার অভিলাষ তাদের নেই, গৃহনীড় তাদের জন্য নয়। নিত্য পথিকগোষ্ঠীর তারা অংশ।

তাই আশ্চর্য হলাম অযোধ্যার কথা শুনে। বললাম—তা দল কই ওর? আর কাউকে তো দেখলাম না সঙ্গে?

অযোধ্যা বললে—দল ওর নেই বাবুজী, ও ঘরওয়ালী হয়ে গেছে।

বাঃ, এতো ভারি আশ্চর্য!

শুধু আশ্চর্য নয়, বাবুজী, বড়ো দুঃখেরও। ওর পথও নেই, ঘরও নেই!

দেওকী অমরকণ্টকে এসে পৌঁছেছিল বছর তিন আগে। তার দল সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিল বাস স্ট্যাণ্ডের পাশের ঐ ঝাঁকড়া নিমগাছের তলায়। অযোধ্যার হোটেলের ওপারেই রাস্তার উপর মোহনের পানের দোকান। মোহন বিধবা মায়ের বড়ো ছেলে। ছোট ভাই রতন। পান জর্দা বিড়ি সিগারেট থেকে দেশলাই মোমবাতি ধূপ সাবান গন্ধতেল সবই দোকানে আছে। মোহনই কেবল আজকাল নেই।

মোহনের ফরসা রং, সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো চুল। দিব্যি বাবুলোক সে—গরমকালেও সর্বদা গায়ে রঙিন ছিটের ফতুয়া। ব্যবসায় বুদ্ধি তার পাকা। অনেক যত্নে আর অনেক পরিশ্রমে সে দোকানটা জমিয়েছে যাতে এখন রাত্রিবেলা একজোড়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন জ্বলে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার অন্য গুণও আছে। সে ছড়া বানায়, গান গায়, বাঁশি বাজায়।

তখন বসন্তকাল। নিম আর শিরীষের নবীন পাতায় মলয়ের শিহরণ। ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে দেওকী চলেছিল সামনে দিয়ে। তার ঘাগরার রঙে মোহনের চোখ ঝলসে গেল। তার ঘন বুক আর গুরু শ্রোণীর দিকে তাকিয়ে যৌবনের রক্ত উঠল চঞ্চল হয়ে। তার কালো চোখের পল্লবছায়া আর ভ্রূবিলাসের নেশায় ঝিমঝিম করে এলো মাথা।

মোহন ঐ বিজাতীয় পথিক মেয়েটাকে ডাকল গলা বাড়িয়ে—এই শোন্!

দেওকী সামনে এ'লা। আন্দোলিত তরঙ্গের উচ্ছলতা সহসা স্তব্ধ যেন।

মোহন বললে—পান খাবি?

ভ্রূভঙ্গি করল দেওকী। টিকোলো নাকটা কুঁচকোলো এতটুকু। মুখ ঘুরিয়ে বললে—পান আমি খাই নে।

কাছাকাছি লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়েছিল। এখন শুধু সোচ্চার ঠাট্টার অপেক্ষা। মোহনের তোয়াক্কা নেই। চেঁচিয়ে বললে—আরে পান না খাস, দাঁড়া। গন্ধতেল নিয়ে যা, চুলে মাখবি।

দেওকী দু-পা এগিয়ে দাঁড়াল দোকানের সামনে এসে। ভীষণ রেগেছে সে, থম-থম করছে মুখ। দিকে দিকে ঘুরে বেড়ায়—এমনি পান-তেলের আমন্ত্রণ তার অজানা নয়। সাদা দাঁতের পাতি মুহূর্তের জন্যে ঝিলকিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা নোংরা গালাগালি মোহনের মুখে ছুঁড়ে মারল সে।

অন্য কেউ হলে সেই গালাগালের উত্তরে আরো অশ্লীল একটা বিদ্রূপ করে বেয়াড়া আলাপটা সাঙ্গ করত। কিন্তু মোহন তা করল না। দোকানের পাটা থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে দুহাত দিয়ে সোজা জড়িয়ে ধরল মেয়েটার ডান হাত।

অযোধ্যা বললে—

আশ্চর্য ব্যাপার বাবুজী, সেই হাত আর ছাড়াতে পারল না মেয়েটা। পান খাইয়ে, গান শুনিয়ে বাঁশি বাজিয়ে মোহন ওকে বশ করল। ওর দল চলে গেল, ও রয়ে গেল এখানে—মোহনের কাছে।

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম—

বাঃ, সোনার শিকল পায়ে পরল বনের পাখি!

ঠিক বলেছেন, তবে দুঃখের কথা, সোনার শিকল নয়, লোহার বেড়ি।

রাস্তার মোড়ে দুটো বেঞ্চি বার করে দিয়েছিল। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বেঞ্চিতে বসে আমরা গল্প করছিলাম। ভোরবেলাটা খুব কুয়াশা ছিল। এখন চনচনে বেলার রোদটা খাশা আরামপ্রদ। রাস্তার ওপারের পানের দোকানে বসে চুন ঘুঁটছিল এক পাকা বুড়ী। টসটসে পাকা রং, পাকা চুল, মুখভর্তি পান।

অযোধ্যা ডাকল—ও মায়ী, শুনে যা, কথা আছে।

মেদবহুল চেহারাটাকে সযত্নে নামিয়ে বুড়ী কাছে এলো। আমার সামনে দাঁড়িয়েই একগাল হাসি।

অযোধ্যা বললে – তোর পুতহুর কথা হচ্ছিল বাবুজীর সঙ্গে।

অমনি কালো হয়ে গেল বুড়ীর মুখ। বললে—হা আমার কপাল! ঐ বাঢ়ের জল ঘরে ঢুকেই তো আমার ঘর ভাসিয়ে নিল বাবুজী! ও তো বহু নয়, ও সর্বনাশী!

আমি বললাম—কেন? বেশ তো তোমার বউ। অল্প বয়েস, দেখতে সুন্দরী, জোয়ান চেহাবা। তা ছাড়া শুনলাম তোমার ছেলে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে!

সুদক্ষ অভিনয়ে কপাল চাপড়ে বুড়ী বললে—

সেই তো কাল হলো। বড়ো ছেলিয়া আমার মোহন, মা বলতে অজ্ঞান ছিল। দুদিনের বহুটা শয়তানী করে মা বেটাকে আলাদা করে দিল, ভাই-এ ভাই-এ কাজিয়া লাগাল। এক দূকান ভেঙে দুসরা দূকান করল শেষ পর্যন্ত।

কেন? তোমাব ও দোকান চালায় কে?

আমি চালাই বাবুজী। এই বুড়ী আর আমার ছোট ছেলিয়া রতন।

রতনকে আমি চিনি। কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা। পাতলা মলমলের পাঞ্জাবির উপর রঙিন চেককাটা পশমী সোয়েটার, সিল্কের মাফলার গলায়। মাথায় তেল-জবজবে তেড়ি, মুখে পান-জর্দার খোশবাই। তার কাছ থেকে সিগারেট কিনেছি দু-একবার। দাদা মোহনকে এ পর্যন্ত দেখি নি—কিন্তু অমরকণ্টকে এই ছোকরা-টাকে নিতান্ত বেমানান বলে মনে হয়েছে।

ঘর-ভাঙানি পুত্রবধূর উপর রাগে কিড়মিড়িয়ে উঠল বুড়ীর দাঁত। বুঝলাম তার উপর ঝাল ঝাড়তে সদাই সে প্রস্তুত, তা যার সামনেই হোক। সেই ঝাল ঝাড়ার সুযোগ দিতেই বুঝি অযোধ্যা তাকে ডেকেছে।

অযোধ্যা শেষ পর্যন্ত বুড়ীকে ধমক দিয়ে ভাগাল। বুড়ী গজগজ করেই চলল—

এতো করে কী পেলি তুই হারামী! যাকে বাঁধলি তাকেই কি রাখতে পারলি?

মুখে লাথি মেরে চলে গেল না? টাকা মেরেছিস, দুকানের মাল মেরেছিস, সে সব কি তোর থাকবে? মার বুক ভেঙেছিস, ধর্ম তোকে দেখবে?

আমি অযোধ্যাকে শুধোলাম—কী বলে গেল ও?

অযোধ্যা নিচু গলায় বললে—ঐ জংলী স্ত্রীকে নিয়ে মা-ভাই-এর সঙ্গে থাকতে পারে নি মোহন। গলির মধ্যে আলাদা একটা ঘর নিয়ে উঠে গিয়েছিল। বুড়ী একটা পয়সা একটুকরো মাল বড়ো ছেলেকে দেয় নি। আলাদা ছোট একটা দোকান করেছিল মোহন। কিন্তু চার মাস হলো মোহন চলে গেছে অমরকণ্টক ছেড়ে।

সে কী? যার জন্যে এতো কাণ্ড সেই সোহাগিনীকে ছেড়ে? কোথায় গেল?

কেন গেল, কোথায় গেল, কেউ জানে না। দেওকী হয়তো জানে, কিন্তু মুখ খোলবার মেয়ে ও নয়! দেওকীর আজ আর কেউ নেই। আলাদা হয়ে ভাঙা দোকানঘরে থাকে একলা। মাঝে মাঝে খেতিতে খাটে। তাই তো বলছিলাম বাবুজী, মেয়েটার জাতও গেছে, ঘরও গেছে!

আমার মনশ্চক্ষে ঐ দেওকী মেয়েটার ছবি ভাসতে লাগল।

সত্যি ও যেন কলস্বনা তটিনী, বেগবতী লাবণ্যলীলা। ওর চুলে দিগন্ত-মেঘের ছায়া, ওর চাহনিতে বিদ্যুৎ-ঝলক! ওর যৌবন-রেখার আমন্ত্রণে ঘরের আগল ভাঙবে, ওর ভ্রূভঙ্গির ইশারায় ঘরের মানুষ সব ভুলে বার হবে, ওর রঙিন ঘাগরার হাতছানিতে পার হবে অন্তবিহীন পথ। তাই তো স্বাভাবিক। ঘরের অর্গলে ও ধরা দিল কেন? কেন সেধে পায়ে পরল সংসারের বাঁধন? কিসের নেশায়, কিসের আশায়?

সেই নেশা ঘুচেছে, সেই আশা টুটেছে। কিন্তু রয়ে গেছে বন্ধন। সেই বাঁধনের বেদনা বুঝি বড়ো বাজছে আজ! তাই বুঝি ও একলা একলা ঘুরে বেড়ায়, তাই নিভৃতে যায় জালেশ্বরের মন্দিরে। কী কামনা তার মনে? কী প্রার্থনা সে করে? অলকাগামী পূর্বমেঘ অমরকণ্টক পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে বৃথাই তার অন্বেষণ করে।

অনেক বেলা থাকতে থাকতে যাত্রা শুরু করেছিলাম। শোণ নদের উদ্গমস্থানের উদ্দেশে। অমরকণ্টক থেকে সোজাসুজি মাইল দুই অগ্নিকোণে শোণমুড়া বা শোণ নদের উৎস। তবে পায়ে হেঁটে যেতে অনেক দীর্ঘতর আঁকাবাঁকা পথ।

গঙ্গার বিশিষ্ট উপনদ শোণ। প্রায় পাঁচশো মাইল শোণের দৈর্ঘ্য। অমরকণ্টক থেকে নর্মদা পশ্চিমাভিমুখী, শোণের গতি উত্তর-পূর্ব দিকে। অমরকণ্টক থেকে উৎপন্ন হয়ে শোণ শাডোল জেলার মধ্য দিয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। বাঘেলখণ্ড

অতিক্রম করে কৈমুর পর্বতমালার দাক্ষিণ দিকে পূর্বমুখী চলেছে শোণ। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় পৌঁছে শোণের গতি উত্তর-পূর্ব দিকে। বিহারের রাজধানী পাটনার কাছে দানাপুর থেকে মাইল দশ দূরে শোণ গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছে।

শোণ নদী নয়, নদ। ভারতের পবিত্র সপ্তনদের অন্যতম। রামায়ণ-মহাভারতে বিভিন্ন পুরাণে কালিদাসের রঘুবংশে শোণের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বর্ণনা অনুসারে শোণ নদ মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র নগরও ছিল এই নদের তীরে। শোণ নদের অপর নাম হিরণ্যবহ। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস ও আরিয়ান তাঁদের ভারত-বিবরণীতে এই নদের উল্লেখ করেছেন।

কিছুটা তৃণভূমি অতিক্রম করেই পথ আঁকাবাঁকা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘন বন। বিশাল উঁচু উঁচু গাছ—মাঝখান দিয়ে সর্পিল পথ। সেই পথ গিয়ে পৌঁছেছে অমরকণ্টক পর্বতচূড়ার পূর্ব কিনারায়। আধ মাইল আগে থাকতেই পথ সংকীর্ণ পার্বত্য পাকদণ্ডীতে পরিণত হয়েছে। পাশ দিয়ে চলেছে শীর্ণা একটি জলধারা। কখনো বা অরণ্যের মধ্যে পাথরের ফাটলে ফাটলে অদৃশ্য হয়ে। এই সলিল-রেখাই শোণ নদের উৎস।

সঙ্গে আর দুটি যাত্রী। ব্যাপারী লোক, গৌরেলার বাসিন্দা। অমরকণ্টকের মোড়ের ধারে একটা দর্জির দোকান আছে। এই দোকানে মোটা ধুতি-চাদর আর সস্তা কম্বলের ও স্টক থাকে কিছু কিছু। এরা বাসের মাথায় গাঁটরি চাপিয়ে এনেছে এই দোকানে সাপ্লাই-এর জন্যে। দর্জিদেরই মেহমান এরা, দুদিন কাটিয়ে ফিরে যাবে। কয়েকবারই এসেছে অমরকণ্টকে, কিন্তু শোণমুড়া দেখা হয় নি এ পর্যন্ত। আমাকে সঙ্গী পেয়ে খুশী। আমিও গৌরেলা থেকেই এসেছি। এদের সঙ্গে গৌরেলা বাজারের গল্পে গল্পে পথের দূরত্ব ভুলে হেঁটে চলেছি।

নদী যেখানে সমুদ্রে মেশে তার নাম মোহানা। মোহানায় পৌঁছতে পৌঁছতে নদীর বুক উদার থেকে উদারতর হয়—গতি হয় শ্লথ থেকে শ্লথতর। বহুদূর উৎস-মুখ থেকে বহু যোজনব্যাপী পথ সে পরিক্রমা করেছে, পার হয়েছে কতো মরুপ্রান্তর জনপদ, স্পর্শ করেছে কতো ঘাট, প্লাবিত করেছে কতো শ্যামল ক্ষেত্র। এক মনে সে চলেছে—একই ধারায়, একই লক্ষ্যে। এবার তার যাত্রা হবে শেষ। এবার তৃপ্তিভরা ক্লান্তি। এবার সে মন্থর - তাই তার বুকে কখনো জোয়ার কখনো ভাঁটা। তার স্রোতে সাগরস্রোতের আসা-যাওয়া।

আর নদী যেখানে আরম্ভ হয় সেখানে তার ক্ষীণা জলধারা উদ্দামগতি। তারুণ্যের

চাপল্যে চঞ্চলতার আবেগে সে আত্মহারা। উপল-উচ্ছল বঙ্কিম-তীব্র বাঁধনহারা তার বেগ। শৈলশিখর থেকে সে যখন জলপ্রপাত হয়ে অতল নিম্নে ঝরে পড়ে তখন তার অভিযাত্রী প্রাণ নির্ভীক উল্লাসে মৃত্যুঞ্জয়।

শোণভদ্রের সেই মৃত্যুঞ্জয় রূপ দেখতে আমরা চলেছি। ক্ষীণা জলধারা ক্রমে প্রচণ্ড বেগবতী পার্বত্য তটিনীতে পরিণত হয়েছে। বড়ো বড়ো গাছের কালো গুঁড়ি আর উপলখণ্ডের পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে। পাথরের বাধা মানছে না, গহ্বরের বাধা মানছে না। তার জলধারার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বিজনকান্তারের অসংখ্য কিন্নরীর পায়ে যেন নিররচ্ছিন্ন কিংকিণী বাজছে।

স্রোতপিচ্ছল পাকদণ্ডীর পথে সন্তর্পণে পা ফেলে আমরা এগোতে লাগলাম। পথ ক্রমেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মূল স্রোতের মধ্যে পুরোপুরি পা ডোবালে এক টানে কোথায় নিয়ে যাবে! স্রোতের গা ঘেঁষে ঘেঁষে আমরা অচেনা সামনের দিকে নেমে চলেছি। শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম শোণভদ্রের প্রপাতশীর্ষে।

অমরকণ্টক পাহাড়ের পূর্বগাত্র। পথ এখানে ফুরিয়েছে—আর ঢালু নেই। পাহাড় এখানে দুর্মদ প্রাচীরের মতো। সেই প্রাচীরের কিনার থেকে শোণভদ্র ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বহু নিচের কান্তারভূমিতে।

কতো নিচু তা ধারণা করা অসম্ভব। শত শত ফুট, হাজার হাজার ফুট হবে। সেখানেও গভীর বন, বিশাল উঁচু উঁচু গাছ, কিন্তু কোনো গাছের চেহারা আলাদা করে চোখে ধরা পড়ে না। শুধু গাঢ় সবুজ—উপর থেকে মনে হয় রূপার এক বিশাল-ব্যাস জীবন্ত লম্ব যেন গভীর কোন্ সবুজ গহ্বরের অন্ধকারে গিয়ে বিলীন হয়েছে। সেই গহ্বর থেকে কোন্ পথে কোন্ দিকে শোণধারা প্রবাহিত হয়েছে তা দৃষ্টির বাইরে।

প্রপাতের মুখে লোহার মোটা রেলিং। রেলিং-এর তলা দিয়ে জলধারা কিনার থেকে উপচে পড়ছে। কিনারে দাঁড়িয়ে সাবধানে মাথা হেঁট করে প্রপাতধারা লক্ষ্য করছিলাম, সহযাত্রী একজন বললে—

•সামনে দেখুন বাবুজী, ঐ দূরে!

প্রপাত যেখানে নেমেছে সেই নিম্নভূমি ঘন বনের ঘন সবুজ। পর্বতগাত্রের ছায়া সেই সবুজকে গাঢ়তর করেছে। তারপর অরণ্যের পারে বাদামী-হলুদ তৃণক্ষেত্রের বিস্তার। তারও পারে সুনীল চক্রবাল যেখানে ধরিত্রীতে মিশেছে সেখানে জনপদের আভাস। কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ির সারি, বাগানের চিহ্ন, পথের রেখা। দিগন্তের গায়ে অপরাহ্নের মেদুর আলোয় চিত্রার্পিত মনুষ্য-সমাজ। অবিস্মরণীয়

অপূর্ব দৃশ্য !
সহযাত্রী বললে—
চিনতে পারছেন ? ঐ হলো কেওচি গ্রাম।
কেওচি ?
হাঁ জী। বাসে আসতে পথে কেওচি পড়েছিল—মনে নেই ?
মনে পড়েছে বই কি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে কেওচি ডাক বাংলোর রাঙা ছাদটা। ঠিক না ?

আশ্রমবাসী সাধুকে প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা, এই শোণভদ্রের উৎসে কোনো মন্দির নেই কেন ?
প্রশ্নটা স্বভাবতই মনে এসেছিল। প্রপাতের কাছে ডানদিকেই আশ্রমটি। পথের ধারেই আশ্রমদ্বার। দ্বারের মাথায় লতার মুকুট। কানে মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ আসতে দ্বার ঠেলে ভিতরে ঢুকে ছিলাম।
বেশ উঁচু চাতালের উপর আশ্রম। চারদিক ফুলগাছ দিয়ে ঘেরা। পিছন দিকে আর একটি দরজা আছে। দুটো দরজাই বেশ শক্ত করে বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।
প্রৌঢ় সাধু দাওয়ায় বসালেন। কুশল প্রশ্ন করে দিলেন দুটি লাড্ডু ও এক ঘটি পানীয় জল। শিবজীর প্রসাদ। আশ্রমেই তিনি পূজা করেন। স্থায়ী বাস—সময় সময় চেলা জোটে দু-একজন।
সাধুজী বললেন—স্রোতের কিনার ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে এসেছেন তো ?
তা এসেছি।
তারপর এই জলপ্রপাতও তো দেখলেন।
দেখলাম, কিন্তু কোথাও একটি মন্দিরও তো চোখে পড়ল না। নর্মদা-উৎসে এতো বড়ো মন্দির। আর শোণের উৎসে কোনো মন্দির নেই! কোনো পূজা নেই!
সাধু বললেন—শোণও বড়ো পবিত্র নদ। ব্রহ্মার নয়নাশ্রু থেকে শোণের সৃষ্টি। তবে মনে হয় নর্মদামায়ী আছেন বলেই শোণ এখানে তীর্থ বলে জাগ্রত হন নি। তা ছাড়া আর একটা কারণ তো দেখেই এসেছেন!
আমি বললাম—কী কারণ বলুন তো ?
লোকে তীর্থে আসে মুক্তির আশায়। স্নান, জপ, হোম, শ্রাদ্ধ ও দান—তীর্থে

এই পঞ্চক্রিয়া। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্নান। লক্ষ্য করে তো দেখলেনই এখানে স্নানের কোনো উপায় নেই। তীর্থে স্নানই পুণ্য। বারি আছে অথচ স্নান-সুযোগ নেই এমনি স্থানে পুণ্যার্থীর মন ভরে না। শোণ এখানে ঝরনা, জলপ্রপাত।

আপনি বলছেন সেই জন্যই শোণমুড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম নিদর্শন হয়েই রইল, মন্দিরময় তীর্থে পরিণত হলো না?

আমার সহযাত্রীরা আশ্রমে ঢোকে নি। আগেই তারা চলে গেছে। সাধুর আমন্ত্রণে আশ্রমে ঢুকে কথায় কথায় অনেকটা সময় গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে বেশি দেরি নেই।

সাধু মুচকি হেসে বললেন—আর একটা কারণও আছে। সেই কারণের জন্যেই আপনাকে আর বসিয়ে রাখব না। উঠতে হবে আপনাকে।

আশ্চর্য হলাম সাধুর কথায়।

তিনি বললেন—কিছু মনে করবেন না। শোণের এই জলধারা বন্য পশুদের বড়ো প্রিয়। সব বন্য শ্বাপদরা সন্ধ্যার পর এখানে জল খেতে আসে। আপনি আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি অমরকণ্টকে ফিরে যান!

অ্যাঁ, বলেন কী?

সত্যিই বলছি, সন্ধ্যার পর শোণের ঝরনায় বাঘে এসে জল খায়। আশ্রমের চারপাশে রাত্রে ঘুরে বেড়ায়। আমরা ভালো করে দরজা বন্ধ করে চিলেকোঠায় শুয়ে রাত কাটাই।

আর দ্বিধা নয়, কথা নয়। দাঁড়াবার সময় নেই এক মুহূর্ত। আশ্রম থেকে বার হয়ে এলাম, সঙ্গে সঙ্গে খিল পড়ল দরজায়।

অরণ্যের মাথায় অনেক রোদ এখনো আছে, কিন্তু পথে আর দুপাশে ছায়া-ছায়া ধূসরতা। পায়ের নিচে ঝরনার শীতল স্রোত আর পিছল পাথর। ফিরতি পথ ঢালু নয়, খাড়াই। মন যতো চায়, পা ততো জোর চলে না। হাঁটু ভেঙে উঠতে হয়—একবার পা হড়কালে যাত্রা শেষ। হয়তো জীবনও শেষ।

দুধারের ঘন অটবীর মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওর মধ্যে কারা আছে জানিনে। ভালুক আছে চিতা আছে বাঘ আছে। সারাদিন বনের মধ্যে অনেক ঘুরেছে ওরা—এবার তৃষার্ত। শোণ-ঝরনার জলপান করে তৃপ্ত হতে আসবে। রোজই আসে, আজই আসবে না কেন? এসে আমাকে দেখে জানাবে তাদের হিংস্র ভয়াল অভ্যর্থনা।

চারিদিক নিঃশব্দ—একটি পাতাও কাঁপছে না। প্রাণভয়ব্যাকুল নিঃসঙ্গ আমি প্রাণপণ বেগে পালাচ্ছি এই অরণ্যপথের মধ্যে দিয়ে—হাঁটছি আর হাঁপাচ্ছি। নিজের বুকের মধ্যেকার হাঁপানির শব্দ শুধু নিজের কানে শুনছি !

পথে এখনো অনেক আলো। পথ চিনে এগোবার অস্থবিধে নেই। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ধূসরতা নেমে এসেছে। আসন্ন মৃত্যুর মতো ধূসরতা। দুপাশের বন ঘন কালো, মনে হচ্ছে এই পথের উপরও অচিরে অমনি কালো নেমে এলো বলে। কুটিল কালো নৃশংস মৃত্যু !

পিছনে হঠাৎ খসখস করে একটা শব্দ হলো। ভীষণ চমকে উঠলাম—ঠোক্কর খেলাম একটা পাথরে। কাঁপতে কাঁপতে একটা শিকড় ধরে উঠে দাঁড়ালাম! কার শব্দ, কিসের শব্দ ?

ততোক্ষণে জলধারা শেষ হয়েছে। খাড়াইও শেষ হয়েছে। সামনের পথও কিছুটা চওড়া হয়েছে। কিন্তু কে শব্দ করল ? কে অনুসরণ করছে নিভৃতে ? এবার শেষ চেষ্টা বাঁচবার। দেহমনের সব শক্তি সংহত করে পূর্ণ বেগে দৌড় দিলাম।

দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছলাম পথের বাঁকে। এখানে দুটি সরু পথের সংগম। একটি গিয়েছে বাঁ দিকে, একটি ডান দিকে। কোন্ পথে যাব স্থির করতে মুহূর্তের জন্যে থেমেছি এমন সময় কানে এলো এক অদ্ভুত গর্জন ! ডান দিক থেকে গর্জনটা উঠছে। একবার নয়—বার বার !

সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত হাত-পা নিশ্চল হয়ে গেল ! আসবার সময় লক্ষ্য করিনি যে দুটি পথ এখানে মিশেছে ! কোন্ পথে যাব, কোন্ পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাবে অরণ্যে ? অজানা গহনে !

আর যাবই বা কেন ? কেন এই রুদ্ধশ্বাস পলায়ন ? পা দুটো তো স্থাণু হয়ে গিয়েছে—শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে গলা ! শ্বাপদের ঐ হুংকার আরো কাছে এগিয়ে আস্থক ! এবার শুধু নিশ্চল নিশ্চিত প্রতীক্ষা !

চুপ করে দাঁড়ালাম। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি অরণ্য সেদিকটা অনেক পাতলা। অদূরে শস্যক্ষেত্র। তার উপর দিগন্তের মেঘে দিনান্তের রক্ত-আভা।

বনের ধারে অল্প নিচু খাদ। তার পরেই ক্ষেতের মধ্যে কে একটা মানুষ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিছনে মেঘের আলো—চেহারাটা শুধু কালো হয়ে ফুটে রয়েছে !

ও যদি কাছে আসে ! ও যদি দেখিয়ে দেয় পথ, যদি এই আসন্ন ভয়ংকর থেকে নিয়ে যায় পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ! শুকনো গলায় স্বরের জোয়ার এলো—খাদের ধারে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলাম।

শুনেছে আমার ডাক। ছুটে আসছে মনুষ্যমূর্তিটা মাঠের মধ্য দিয়ে। কে ও

মানুষটা ? চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন ? দেখেছি যেন কোথায় ? চেনা হোক অচেনা হোক—ও মানুষ। নিঃসঙ্গ বিপন্ন মানুষের পরম বন্ধু মানুষ।

খাদের ঠিক নিচে যখন পৌছল তখন ওকে চিনলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনে আবার গর্জন উঠল।

বাঁচাও, দেওকী বাঁচাও !

খাদের ধার থেকে লাফ দিলাম। গড়াতে গড়াতে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

পৌছেছি মানুষের আশ্রয়ে—পেয়েছি মনুষ্যত্বের প্রাণদায়ী স্পর্শ !

শক্ত করে বন্ধ রেখেছি দুচোখ। শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছি ওকে।

কানে শুনলাম—

ভাইয়া, আরে এ ভাইয়া ! কেয়া হুয়া তেরা ভাইয়া ?

৮

ঘূর্ণাবর্তে মজ্জমান মানুষ যেমন প্রাণপণে ভগ্ন ভেলার কাষ্ঠখণ্ডকে চেপে ধরে তেমনি আমি চেপে ধরেছিলাম দেওকীকে। তুলনাটা পছন্দসই না হলেও অবস্থাটা প্রকৃত। বাঁ পা-টা মচকেছে, কিন্তু ব্যথা টের পাবার মতো অবস্থা নয়। সারা শরীর ঠকঠক কাঁপছে।

দেওকী আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল। খাড়া করে দাঁড় করাল আমাকে। ভয়ার্ত শিশুকে ভোলাবার মতো করে গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

ডরো মত্‌ ভাইয়া, কিস্‌ লিয়ে ডর্‌না ইত্‌না ?

আমি কম্পিত ঠোঁটে উচ্চারণ করলাম—

বাঘ ! জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ডাকছিল—শোনো নি ?

তাই না কি ? শের তাড়া করেছিল পিছনে ? কী সর্বনাশ ! লড়তে কেমন করে ? সঙ্গে হাতিয়ারও তো নেই ! তা দৌড় লাগাওনি কেন ?

আশ্চর্য বন্যবালা ! কণ্ঠে ভয়ের বিন্দুতম আভাস নেই, যেন কৌতুক করছে আমার সঙ্গে ! বললাম—রাস্তা বুঝতে পারি নি। তোমাকে না দেখলে ধরতেই পারতাম না কোন্‌ দিকে বাজার আর কোন্‌ দিকে বন।

আবার তেমনি ঠাট্টার সুরে বললে—

আর ভয় নেই ভাইয়া। আমি যখন আছি বাঘ বন ছেড়ে মাঠে নামলেও কিছু করতে পারবে না। আমাকে দেখলেই পালিয়ে যাবে। নাও, এবার আস্তে আস্তে ফিরে চল।

গোড়ালিটা খচখচ করছে, জ্বালা করছে হাঁটু। খাদ বেয়ে হেঁটে নেমেছিলাম না গড়িয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। সহজ ভঙ্গিতে দেওকী তার কাঁধটা এগিয়ে দিল ! তার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে মাঠের মধ্য দিয়ে এগোলাম। দিগন্তে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার।

প্রান্তর পার হয়ে একটি সরু রাস্তা শুরু হয়েছে। সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে কটা বাঁক ঘুরলেই এক পাশ থেকে অমরকণ্টক মন্দিরে পৌছানো যায়। পিছনের এই রাস্তাটি আমার জানা ছিল না।

সেই রাস্তার উপর ঝাঁপবন্ধ ছোট একটি ঘর। দেওকীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। এবার সে বললে—ভাইয়া, এই আমার আস্তান।।

রক্ষাকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা ছিল না। তাছাড়া ভাব বিনিময়ের জন্যে ভাঙা হিন্দী বুলি আমার সম্বল। দুহাতে ওর ডান হাতটা ধরে বললাম—

তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ দেওকী!

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল দেওকী। রঙ্গভরা হাসি। বললে—প্রাণ বাঁচিয়েছি বই কি, এবার পানভী খাওয়াব। একটু বোসো, বিশ্রাম করো?

ঝাঁপটা তুলে দিল। একটি ছোট বেঞ্চি বার করে দিল রাস্তার ধারে। ভিতরে ঢুকে ত্বরিতে লণ্ঠন জ্বালাল একটা।

বড়ো রাস্তার পিছন দিকে এই পাড়াটা। ছোট ছোট ঘর, নিবু নিবু আলো। সামনে কানাতের পর্দা। আধো-অন্ধকার পথে লোকজন নেই বললেই হয়।

দুটি ছোট ছোট নাড়ু আর এক ঘটি জল দেওকী এনে রাখল বেঞ্চির ধারে। দরজার সামনে দাওয়ায় বসে বললে-পানি পিয়ো ভাইয়া, আমি দুটো পান সাজি।

আমি বললাম—আবার পান কেন দেওকী, পান লাগবে না।

হাসিমুখে বললে—বাঃ, পান না খেলে চলবে কেন? এতো আমার পানেরই দূকান।

পায়ের ব্যথাটা কমে গেছে। কিন্তু আকণ্ঠ তৃষ্ণা। ঘটির জলটা ঢকঢকিয়ে গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে লম্বা একটা শ্বাস ফেললাম। বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে অনেকটা স্বাভাবিক লাগতে লাগল। দম ফুরিয়ে গেল এতোক্ষণের হাঁপানির।

ছোট্ট ঘরটা। মেঝেতে চট বিছানো। সামনে পান সাজার সরঞ্জাম। পান ভিজিয়ে রাখার মাটির ডাবর, চুন আর গোলা খয়ের মাটির ঘটে। টিনের কৌটোয় সুপুরি। একটা অ্যালুমিনিয়মের থালা, তাতে ছোট ছোট বাটি। বিভিন্ন বাটিতে লাল-হলুদ মসলা, ভাজা দোক্তা, জর্দা পিলাপাতি। পিছনে কাঠের তাক। তাতে বিক্রির নানা টুকিটাকি। সস্তা সিগারেট, বিড়ি, মোমবাতি, দেশলাই, শ্লেট, পেনসিল, চটি খাতা।

মাথা নিচু করে পান সাজতে সাজতে দেওকী হঠাৎ মুখ তুলল। বললে—তুমি আমার নাম কী করে জানলে ভাইয়া?

জেনেছি অযোধ্যার কাছ থেকে। সেই আমাকে বলেছে।

পান হাতে নিয়ে দোকানের চৌকাট পার হলো দেওকী। হাতে পান দিয়ে পাশে এসে বসল চৌকিতে।

বললে—নাম বলেছে, আর কী বলেছে অযোধ্যা ? ভালো লোক পেয়ে খুব বুঝি লাগিয়েছে আমার নামে ?

না, না, লাগাবে কেন তোমার নামে? খুব ভালো কথাই তো বলেছে। তবে হ্যাঁ, লাগাবার লোকের অভাব নেই। যা লাগাবার সব লাগিয়েছে তোমার শাশুড়ী।

খিলখিল করে হাসল দেওকী। হেসে গড়িয়ে পড়ল একেবারে।

ও, তাহলে আমার শাশুড়ীর সঙ্গেও তোমার আলাপ হয়েছে ভাইয়া ? রত্‌নার দুকানে পানভী খেয়েছ !

খেয়েছি বই কি—হাসির জবাবে হেসে বললাম।

কেবল আমার সঙ্গেই আলাপ হয় নি !

আলাপ হয়েছিল তো। উত্তরে বললাম—সেদিন সেই জালেশ্বরের মন্দিরে। তার-পর তুমি রোজ সামনে দিয়ে ঝমর-ঝমর মল বাজিয়ে চলে যাও, ফিরেই তাকাও না। আমি বিদেশী লোক, ভিন্ন ভাষায় কথা বলি। রাস্তার মাঝখানে ডাকি তোমায় কোন্ সাহসে ?

আবার রঙ্গভরে হাসল দেওকী। ভারি মজার হাসি, যতোটা সারল্য ততোটা কৌতুক। যতোটা কাছে টানে, ততোটা সাবধান করে।

বললে—তোমার একদম সাহস নেই ভাইয়া। বাঘকে ডরাও, মেয়েমানুষকেও ডরাও।

আমি মুখে কিছু বললাম না। মুখভর্তি দেওকীর সাজা পান, ভুরভুরে জর্দার গন্ধ। মনে মনে বললাম—

বাঘের হাত থেকে পালাতে হবে বলেই তো তোমাকে পেলাম দেওকী।

দামী শিক্ষা দিয়েছিল শিউচরণ। বাবু শিউচরণ বলে তার নামডাক—হরিদ্বারের শ্রবণনাথ যাত্রীনিবাসের ম্যানেজার। সেই শিক্ষা দেশভ্রমণের পরম পাথেয়।

ভোর থেকে শ্রবণনাথ শিবের মাথায় অসংখ্য স্নানার্থীর ফুল-বেলপাতা-জল পড়ত। সারাদিনে স্তূপাকার। বিকেলবেলা পাণ্ডাবাড়ির এক ছোকরা ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করত সারাদিনের পূজা-উপচারের সঞ্চিত আবর্জনা। শিবলিঙ্গের গায়ে মাথায় এলোপাথাড়ি চালাতো মুড়ো ঝাঁটা—দু-মিনিটে জঞ্জাল হটিয়ে ঢেলে দিত দু-বালতি জল।

আমি তাকে ডেকে বললাম—

বাবা, যে কদিন আমি আছি, তোমার এই ডিউটিটা আমিই নিলাম। এ-কদিন তোমার ছুটি।

সন্ধ্যার কিছু আগে গেরুয়া গামছাটা জড়িয়ে মন্দিরে যেতাম। দুহাতে ফুলবেল-পাতা কুড়িয়ে নিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতাম। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সযত্নে মুছিয়ে দিতাম বিগ্রহ—তারপর মুছতাম মন্দিরের মেঝে আর সিঁড়ির ধাপ। মুড়ো ঝাঁটার মার থেকে শ্রবণনাথজীকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্যে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল শিউচরণ। আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল তাদের সান্ধ্য আলোচনার আসরে।

শিউচরণ অতি রূপবান্ যুবক। মিষ্টভাষী, সদালাপী—কবিও বটে। মুখে মুখে সে কবিতা বানায়। যাত্রীনিবাসের খোলা দালানে সে সন্ধ্যাবেলা চেয়ার-বেঞ্চি বিছিয়ে বসে। কয়েকজন পণ্ডিত ও সুরসিক স্থানীয় ব্যক্তি এই সান্ধ্য আসরের নিত্য সভ্য। তীর্থযাত্রী সাধুও দু-একজন করে জোটেন। সাহিত্য-পুরাণ-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মহিষের মোটা দুধে সযত্নে বানানো সিদ্ধির পানীয় মেজাজী আলাপচারীদের মধ্যে পরিবেশিত হয়।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দসমন্বিত হিন্দীতে আলোচনা হয়। মোটামুটি আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে জড়তা আসে। নিজে যখন কিছু বলি, তখন বলি ইংরেজীতে। বিদেশী ভাষার দূরত্বের বাধায় কাছে আসতে পারিনে।

একদিন শিউচরণ বললে—

আপনি ইংরেজীতে বলেন কেন? হিন্দীতে বলুন।

আমি বললাম—মাপ করবেন শিউচরণবাবু, আমি আপনাদের হিন্দী কথা মোটা-মুটি বুঝতে পারি সবই, তবে আপনাদের মতো হিন্দী বলতে তো পারিনে। বলতে গেলেই ভুল বলে ফেলব, তাই লজ্জায় বলিনে।

আশ্চর্য শিক্ষা দিল শিউচরণ। বললে—

গাঙ্গোলীবাবু, ইংরেজী ভাষাই কি আপনি ইংরেজের মতো শুদ্ধ বলতে পারেন? ইংরেজ তো আপনি নন! ইংরেজী হিন্দী কোনোটাই আপনার মাতৃভাষা নয়। সাহেবের মতো ইংরেজী বলতে না পারলে যদি লজ্জা না হয়, তা হলে আমাদের মতো হিন্দীতে কথা না বলতে পারলেও লজ্জা কি.সের? দেশের লোকের সঙ্গে লোকভাষায় কথা বলবেন—শুদ্ধ হোক, ভুল হোক, কী এসে যায়! ইস্ লিয়ে শরমাতেহেঁ কিঁউ?

আর ভু.ল করি নি। হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা অযোগ্যতা নিয়ে গত এক যুগ ধরে যতো টানা-পোড়েন, সে রাজনৈতিক লীলাখেলা। হিন্দী লোকভাষা, সাধারণ মানুষের ভাষা। একটি মাত্র ভারতীয় ভাষা, যা দিয়ে সর্বভারতের সকল মানুষের সঙ্গে মোটামুটি ভাবের আদান প্রদান চলে। এমনকি ত্রিবান্দ্রমের বাস

ড্রাইভার ও কন্যাকুমারীর পাণ্ডা পুরোহিতের সঙ্গে। হিন্দী নাকি বড়ো দুর্বল ভাষা, নিতান্ত অনুন্নত ভাষা। এই ভাষায় লাগসই শব্দের বড়ো অভাব—এই ভাষায় তাঁহা-তাঁহা সাহিত্যসৃষ্টি হয় নি। সেইটেই এই ভাষার প্রধান গুণ। দুর্বল দেশের অনুন্নত জাতির অতি উপযুক্ত লোকভাষা হিন্দুস্থানের হিন্দী।

এই লোকভাষায় কথা বলতে আমি আর ভয় পাইনে, লজ্জা পাইনে। হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ নাকি বড়ো শক্ত। প্রমাণ—লিঙ্গভেদ বিশেষ্য-বিশেষণ ছাড়িয়ে ক্রিয়াপদে গিয়েও পৌছেছে। এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে—লক্ষ্য করে দেখেছি অধিকাংশ সাধারণ হিন্দীভাষীই মাথা ঘামায় না। আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ। কোনো ভাষাভাষীই ব্যাকরণ সম্মত কথা বলে না। আমার ভাবনা কী?

তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার উদার ভাণ্ডার থেকে যে রত্ন বাংলা ভাষা আহরণ করেছে, সে রত্ন হিন্দীতেও আহরিত। পণ্ডিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ক্রিয়াপদে বা পুংলিঙ্গে-স্ত্রীলিঙ্গে ভুল করতে পারি—কিন্তু যদি ওজনদার বিশেষ্য-বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারি, তা হলে তাঁরা হিন্দী অনভিজ্ঞ বলে ক্ষমা করে নেন, অশিক্ষিত বা মূর্খ বলে অবজ্ঞা করেন না।

এই সাহস নিয়েই স্বচ্ছন্দে আলাপ করছিলাম অমরকণ্টক সংস্কৃত বিদ্যালয়ের আচার্যের সঙ্গে। অমরকণ্টক পোস্ট অফিস আর সংস্কৃত বিদ্যালয়, একই এলাকার মধ্যে। বিদ্যাশ্রমের ছাত্রসংখ্যা অল্প। ছাত্ররা গুরু-সন্নিধানে আশ্রমে বাস করে। শিক্ষা করে সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রাদি। সংলগ্ন পাঠাগারে বই-পুঁথি কিছু কিছু আছে।

চারিদিকে পাঁচিলের ধারে ধারে তরুশ্রেণী। মাঝখানের প্রাঙ্গণে বুড়ো নিমগাছের কাণ্ড ঘিরে বাঁধানো গোল বেদী। সেই বেদীর মাঝখানে বসে আছেন বৃদ্ধ আচার্য। এদিক-ওদিক তাঁর ছাত্ররা। আচার্যের আলোচনা তারা সকলে মন দিয়ে শুনছিল। পোস্টমাস্টারও যোগ দিয়েছেন এই ছাত্রদলে।

পায়ে পায়ে বেদীর কাছে এগিয়ে দিয়ে আচার্যকে অভিবাদন করলাম। বৃদ্ধ আমাকে পাশে বসিয়ে কুশল সম্ভাষণ করলেন।

আমি সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলাম—

আমি অপরিচিত আগন্তুক, আপনার শিক্ষাদানের কোনো বাধা সৃষ্টি করছি না তো?

সহাস্যে আচার্য বললেন—মোটেই না, আমরা সাধারণ আলোচনা করছিলাম। তুমি আমাদের মধ্যে এসেছ, এতে আমরা খুশীই হয়েছি বেটা। তোমার পছন্দ-

মতো আলোচনাই আমরা করব।

আমি বললাম—

তা হলে এই পুণ্যতীর্থ অমরকণ্টকের কথা কিছু বলুন।

আমার প্রশ্নে আচার্য খুশী। বললেন—বেশ, প্রথমে শোনো অমরকণ্টক নামটি কেন হলো, এই নামের অর্থ কী। বলো তো অমর কাকে বলে?

আমি বললাম—

'যার মৃত্যু হয় না, তিনিই অমর। দেবাসুরে মিলে সমুদ্র মন্থন করেন। সেই মন্থনে সাগরগর্ভ থেকে অমৃত উত্থিত হয়। সেই অমৃত দেবতারা লাভ করেন, পান করে অমর হন।

ঠিকই বলেছ। অসুররা অমৃতের ভাগ পান নি, বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করে তাদেব প্রবঞ্চিত করেন। তাই অসুররা অমর হয়নি। কিন্তু অমৃতভাণ্ড স্পর্শমাত্র না করে সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট কণ্ঠে ধারণ করে মহামৃত্যু থেকে সৃষ্টিকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, তিনি চির অমর তাই না?

আমি বললাম—যথার্থ বলেছেন মহাত্মন, নীলকণ্ঠ শিবই প্রকৃত অমর, তিনি মহামৃত্যুঞ্জয়।

সেই শিব-শংকরের নীলকণ্ঠ থেকে এইখানে নির্গতা হয়েছেন অমৃতময়ী নর্মদা। এই স্থানের আদি নাম অমরকণ্টক নয়, অমরকণ্ঠ। অমরকণ্ঠেশ্বর এখানে আসীন। নর্মদাকুণ্ডে অমরকণ্ঠেশ্বর আছেন। তাঁকে আমি দেখে এসেছি, পূজা দিয়েছি। শুধোলাম—তাহলে অমরকণ্ঠ অমরকণ্টক হলো কী করে?

আচার্য আনন্দ সহকারে বললেন—

সে ব্যাখ্যা অন্য। বাক্যটি হলো অমরাণাং কটঃ। বা অমরদের দেহ। এখানে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে বিপর্যস্ত নিপীড়িত হয়েছিল দেবতাদের দেহ। অমরনালা বলে ঐ ক্ষীণ ধারাটি আছে না? ঐ অমরনালা প্লাবিত হয়েছিল দেবাসুরের রক্তে। অমরাণাং কটঃ—এই বাক্য থেকে অমরকণ্টক শব্দটি এসেছে। সহজ শব্দার্থ অনুসারেও অমরকণ্টক নামটি অতি উপযোগী। এই স্থান ছিল আর্য দেবতাদের কণ্টকস্বরূপ। এই কণ্টককে সহজে তাঁরা ওঠাতে পারেন নি।

আশ্চর্য হয়ে আচার্যের কথা শুনছিলাম। তাঁর শিক্ষায়তনের পাশেই ডাকঘর। আধুনিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশকেন্দ্র। ডাকঘরের পাশে দাঁড়ালে মনে হয় বর্তমানে সভ্যতার চাবিকাঠি হাতের মুঠোয় আছে। এর সঙ্গে আছে মোটর, আছে রেল, অর্ণবপোত, আকাশযান। একে নিয়ে আছে ইলেক্‌ট্রিসিটি, টেলিগ্রাফ,

টেলিফোন, বেতার, রাডার। সেই ডাকঘরের প্রতিবেশী সংস্কৃত পণ্ডিতকে এ যুগ যেন স্পর্শ করে নি। ইতিহাসের সীমান্তহারা কোন্ মহা অতীত মহা প্রাচীন যুগের পুরাণের ছায়ায় সমাহিত তাঁর মন।

মহানিমের ছায়ায় সেই বিশাল বেদীমূলে বসে সেই মনের সহযাত্রী আমি হলাম।

আচার্য বললেন—

এই মহাভারতে দেবাসুরের সংগ্রাম কম হয়েছে বেটা? সেই আর্য-অনার্যের লড়াই আজই কি শেষ হয়েছে? বিন্ধ্য পর্বতের কাহিনী স্মরণ করো।

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে বিন্ধ্য পর্বতমালা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ঠিক মধ্যস্থলে মহা প্রাচীর। দুরতিক্রমণীয় বাধা। গান্ধার থেকে কাশী পর্যন্ত সমস্ত আর্যাবর্ত তখন আর্য-সভ্যতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু সেই আর্য-সূর্যের গতি দক্ষিণ ভারতে স্তব্ধ। মাথা উঁচু করে সূর্যকে অবরোধ করেছেন বিন্ধ্য। বিন্ধ্যের এই বাধাকে প্রথম কে অতিক্রম করেছিলেন জানো? তিনি মহামুনি অগস্ত্য।

আমি বললাম—

অগস্ত্যের কাহিনী আমার মনে আছে। কে বড়ো, এই নিয়ে বিন্ধ্য আর মেরু পর্বতের মধ্যে হলো ঝগড়া। এই ঝগড়ায় কাঠি বাজালেন নারদ। সুমেরুকে হারাবার জন্যে বিন্ধ্য তাঁর শিখর এতো উঁচু করলেন যে আকাশের সূর্যেরও তা পার হবার উপায় রইল না। সূর্যের পরিক্রমা বন্ধ। সৃষ্টি মৃতপ্রায়। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর অনুরোধে বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্য গেলেন বিন্ধ্যের কাছে। শিবভক্ত বিন্ধ্যকে শংকরও অনুরোধ করলেন। বিন্ধ্য কী করেন? গুরুকে দেখে অবনতমস্তকে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। অগস্ত্য আশীর্বাদ করে বললেন—প্রিয় শিষ্য, আমি একটু দক্ষিণ ভ্রমণে যাচ্ছি। যতোদিন না ফিরে আসি, তুমি এমনি প্রণত হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ফিরে এলে আবার মাথা তুলবে। কিন্তু অগস্ত্যের সেই দাক্ষিণাত্য যাত্রা সত্যিকারের অগস্ত্যযাত্রা অগস্ত্য আর ফিরলেন না—শিষ্য বিন্ধ্যের মাথা চিরদিনের মতো নত হয়ে রইল। সূর্যদেবের ডিউটি বহাল রইল।

আমার কথা শুনে আচার্য খুশী। বললেন—

গল্পটা ঠিক বলেছ বেটা। এ হলো পুরাণকাহিনী—ইতিহাস নয়। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ আর মহাকাব্যের মধ্যেই ইতিহাসের সংকেত। অগস্ত্যই ভারতের প্রথম আর্য অভিযাত্রী, যিনি বিন্ধ্য পর্বত পার হয়ে দক্ষিণে বিন্ধ্যারণ্যে পৌঁছেছিলেন, সেই অনার্য-অধ্যুষিত গহন কাননে আর্য উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আর্য-সভ্যতার আলোক-রশ্মিকে তিনিই প্রথম আহ্বান করেছিলেন বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে।

আচার্য বলে চললেন—পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধবর্ণনার শেষ নেই। অসুরের আক্রমণে ইন্দ্রের সিংহাসন বারে বারে টলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেবতারাই হয়েছেন বিজয়ী। আর্য-অনার্যের কতো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইঙ্গিত পুরাণের ছত্রে ছত্রে! এই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ক রাম। অগস্ত্য ছিলেন ঋষি, তিনি আর্য ধর্ম আর্য মন্ত্রকে নিয়ে এসেছিলেন বিন্ধ্যের দক্ষিণে। রাম ছিলেন মহা ক্ষত্রিয়, সূর্যবংশীয় যুবরাজ। তিনি ক্ষাত্র কূটনীতি ও রণশক্তি দিয়ে রাক্ষসদের পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে উড়িয়ে ছিলেন আর্য বিজয়-পতাকা। দাক্ষিণাত্যের অনার্য-সম্রাট রাবণকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন।

পোস্টমাস্টার মন দিয়ে আচার্যের কথা শুনছিলেন। তিনি শুধোলেন—রাবণকে দাক্ষিণাত্যর সম্রাট কেন বলছেন গুরুজী? তিনি তো লঙ্কার রাজা, সে লঙ্কা তো সেতুবন্ধের পারে?

ঠিকই বলেছ বেটা, কিন্তু সেই লঙ্কা কোথায় ছিল, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের তর্কের যে শেষ নেই! চলো বেটা, সেই লঙ্কার সন্ধানে আমরা যাত্রা করি।

চতুর্দশ বর্ষ বনবাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পত্নী জানকী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে আর্য-কুলতিলক রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করলেন। অযোধ্যা থেকে দক্ষিণে মির্জাপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাতীর পর্যন্ত রাম লক্ষ্মণ ও সীতা আসেন সুমন্ত্রের রথে। এখানে এসেই অনার্য রাজশক্তির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ। তিনি রামের বন্ধুস্থানীয় হলেও নিষাদ জাতীয়। শৃঙ্গবেরপুরের রাজা গুহ। শৃঙ্গবেরপুরের দক্ষিণে গঙ্গার উত্তর তীরে সুমন্ত্রকে পরিত্যাগ করে তাঁরা নৌকাযোগে গঙ্গা অতিক্রম করলেন। সেখান থেকে তাঁরা গমন করলেন গঙ্গা-যমুনা সংগমের অভিমুখে। তারপর ভরদ্বাজ আশ্রম হয়ে পৌঁছলেন চিত্রকূটে।

চিত্রকূট এক মহাতীর্থ। উত্তর প্রদেশের বান্দা জিলায় অবস্থিত, প্রয়াগ থেকে ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে—চিত্রকূট পর্বতের পাশ দিয়ে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। সেই মন্দাকিনী এখনো আছে, তার স্থানীয় নাম পৈসুনি। চিত্রকূট থেকে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেই অনার্য-অধ্যুষিত রাক্ষস শাসিত গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন—যার নাম দণ্ডকারণ্য।

চিত্রকূটের অল্প দক্ষিণেই বিন্ধ্য পর্বতমালা। বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তর সানু থেকেই দণ্ডকারণ্যের শুরু। এই অরণ্যের শেষ কোথায়, তা আর্য ঋষিরা জানতেন না। তাঁরা অগস্ত্যের পথ অনুসরণ করে বিন্ধ্যের দক্ষিণ ভাগের অরণ্যসানুতে স্থানে স্থানে আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু অনার্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার মতো কোনো ক্ষাত্রশক্তি ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে নি। প্রথম এলেন

রাম। অগস্ত্যের আশ্রম তিনি পরিদর্শন করলেন।

দণ্ডকারণ্য কতো বিশাল, পূর্বে পশ্চিমে দক্ষিণে কতো দূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তার কোনো ধারণা আর্যদের ইতিপূর্বে ছিল না। তাই কোথায় পঞ্চবটী, কোথায় কিষ্কিন্ধ্যা, কোথায় লঙ্কা, তা নিয়ে কোনো স্থির নিষ্পত্তি আজ পর্যন্ত হয় নি। তারপর আর্য সভ্যতা দক্ষিণে যতো বিস্তৃত হয়েছে, রাবণের লঙ্কাকেও মানচিত্রের ততো তলার দিকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সভ্যতা যখন ভারতের দক্ষিণ উপকূল স্পর্শ করেছে, তখন ভারতের মাটিতে পা রাখবার স্থানটুকু রাবণের জোটে নি। তিনি তাঁর মহৈশ্বর্যময় লঙ্কাপুরী সমেত নির্বাসিত হয়েছেন রামেশ্বরের সমুদ্রপারে।

পঞ্চবটীতে আশ্রয় নিতে রামকে নির্দেশ দেন অগস্ত্য। পঞ্চবটী যেখানেই থাক—দণ্ডকারণ্যের মধ্যেই ছিল এবং অগস্ত্য-আশ্রম থেকে মাত্র দুই যোজন দূরে ছিল। এই পঞ্চবটী রাবণের রাজধানী থেকেও সহস্র সহস্র যোজন দূরে নিশ্চয়ই ছিল না। পঞ্চবটী ছিল রাবণ রাজ্যের জনস্থান অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন রাবণ-ভ্রাতা খর, সেনাপতি মহাবলী দূষণ। এখানে বাস করতেন রাবণ-ভগ্নী সূর্পণখা। এইখানে রামের সঙ্গে রাক্ষস-শক্তির প্রথম যুদ্ধ। যে যুদ্ধে রামের হাতে খর ও দূষণের মৃত্যু।

জনস্থানে খর-দূষণ ও রাক্ষস সেনাদের নিধনের সংবাদ দ্রুতবেগে লঙ্কায় গিয়ে জানিয়েছিল অকম্পন। রাবণ সীতাহরণের জন্য পঞ্চবটীতে এসেছিলেন অশ্বতর বা বা খরবাহিত রথে চড়ে। অতএব সহস্র যোজন দূর থেকে নয়।

সীতার সন্ধানে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে অঙ্গদ হনুমান প্রমুখ যে বানর নেতারা দিকে দিকে পরিভ্রমণ করছিল বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা পৌঁছল। সেইখানে তারা শুনল তরঙ্গসংকুল সমুদ্রের ঘোর গর্জন। এইখানে জটায়ু-ভ্রাতা সম্পাতির সঙ্গে বানরদের সাক্ষাৎ হয় ও তারা সংবাদ পায় যে, এই তরঙ্গপ্রান্তের দক্ষিণে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছেন। এইখানে বিন্ধ্য পর্বতমালার মহেন্দ্র পর্বতের শীর্ষ থেকে লাফ দিয়ে হনুমান লঙ্কায় গিয়ে পৌঁছোন।

আচার্য বললেন—

এই বিন্ধ্য পর্বত কোন্ বিন্ধ্য পর্বত? এই তরঙ্গসংকুলা বারিধির উত্তর তীরে পর্বতমালা কোথা থেকে এলো? যে প্রচণ্ড জলরাশিকে অতিক্রম করে হনুমান রাবণ-রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন সেই জলরাশি কি নর্মদা?

এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আচার্যের কথা শুনছিলাম। তাঁর আলোচনা কোন্ সূত্রে কোন্ পথে আমাদের নিয়ে চলছিল প্রথমটা ধারণাই করতে পারি নি। এবার চমকে উঠলাম। বললাম—গুরুজী, আপনার কি মত—

আমার কোনো মতই নেই বেটা। আমার শুধু ধারণা। মত প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই। সারাজীবন ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই কেবল পুরাণ পাঠ করেছি। পুরাণের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আছে ভূগোল আছে অর্থনীতি সমাজনীতি আছে, সেই কথা স্বীকার করে আজকালকার পণ্ডিতরা গবেষণা করছেন। আমার কি আর দিন আছে ?

একটু থেমে আবার বললেন আচার্য—

এই নর্মদামায়ীকে বড়ো ভক্তি করতেন রাক্ষসরাজ রাবণ। তিনি ছিলেন পরম শংকরভক্ত। এই নর্মদাই ছিল তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমান্ত। উত্তর ভারতের আর্য-পূজিত গঙ্গা ছিল তাঁর রাজ্যের বাইরে তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে এই নর্মদাই গঙ্গা। পুণ্যতোয়া নর্মদায় অবগাহন এবং এখানকার মধুময় দক্ষিণ পুলিনে বিশ্রাম তাঁর বড়ো প্রিয় ছিল। নর্মদাতীরে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করে তিনি পূজা করেছিলেন। এই নর্মদাস্রোতকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন হৈহয়পতি কার্ত-বীর্যার্জুন। সেজন্যে রাবণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের রাজ-ধানী ছিল মাহিষ্মতী —নর্মদার উত্তর তীরে।

দিন শেষ হয়ে আসছে। নিমের ছায়া দীর্ঘ হয়েছে। মৃদু হেসে আচার্য বললেন— কথায় কথায় তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম না কি ?

আমি লজ্জায় আর কোনো কথা বললাম না। এইবার শেষ আশ্চর্য কথা গুরুজী বললেন—

অমরকণ্টকের মাহাত্ম্য শুনতে চেয়েছিলে বলেই তো নানা কথা উঠল বেটা ! অনেক পণ্ডিত বলেন, লঙ্কারাজ্য ছিল এইখানেই। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে দণ্ডকা-রণ্যের কেন্দ্রে নর্মদার উৎসমুখে। সুন্দরকাণ্ডের ত্রিকূট পর্বতই এই অমরকণ্টক। এ অঞ্চলের আদিবাসীরা আজও নিজেদের রাবণবংশী বলে থাকে।

আচার্য উঠলেন। তাঁর সায়ংক্রিয়ার সময় হয়েছে। পোস্টমাস্টার আমাকে ছাড়-লেন না। তাঁর দাওয়ায় বসিয়েই একপেট খাইয়ে দিলেন।

পোস্টমাস্টারের সঙ্গে বার হতে প্রায় সাড়ে আটটা হলো। অযোধ্যার দোকা-নের কাছাকাছি গিয়ে দেখি এলাহী কাণ্ড—হইহই ব্যাপার ! কর্নার প্লটে অযো-ধ্যার দোকান, দুধারে বড়ো রাস্তা। সারা রাস্তায় পেশাপেশি লোকের ভিড়। ওপারের দোকানগুলোতেও লোক ভর্তি। ভিড়ের একটা ঘন চাপ রাস্তার ওপরে রতনের পানের দোকানে।

অযোধ্যার হোটেলের চেহারাই বদলে গেছে। টেবিল-চেয়ার-আলমারি-র‍্যাক

সব ফরসা। সারা মেঝেতে চট আর কানাত বিছোনো। দেয়ালের কোণে কোণে এক সার নিচু বেঞ্চি মাত্র। মাঝখানে সাদা ফরাস, তার উপর একটি ছোট রঙিন জাজিম। ফুল পাম্পওয়ালা চার-ছটা পেট্রোমাক্স জ্বলছে। আলোয় আলো।

গান শুরু হয়েছে। চড়া পর্দায় হারমোনিয়াম বাজছে। বাজছে ডুগি-তবলা। অযোধ্যা আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো। বললে—

ভিতরে আসুন বাবুজী, জায়গা আছে আপনাদের।

অযোধ্যার দোকানে তিলধারণের স্থান নেই। কেবল মাঝখানের চাদর-জাজিম পাতা আসরটা একটু ফাঁকা। সে জায়গাটা শিল্পীদের জন্যে—গণ্যমান্য দর্শকদের জন্যেও বটে।

আমি বললাম—আমার জন্যে ভেবো না অযোধ্যা। একটু ঘুরে ফিরে দেখি, ঠিক সময় ভিতরে গিয়ে বসব।

উৎসবের আয়োজন প্রচুর। নাচ-গান এবং যাত্রা। অনুপ্‌পুর পেণ্ড্রার সাংস্কৃতিক লড়াই অমরকণ্টকে অযোধ্যার দোকানে আজ রাত্রে। অনুপ্‌পুর থেকে যাত্রার দল এসেছে—তারা শোনাবে নল-দময়ন্তী পালা। পেণ্ড্রা থেকে এসেছে এক খুবসুরত নাচনেওয়ালী যার ঠমক-চমকের তুলনা নেই। রতনের পানদোকানের পিছনে আলাদা পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে তার ড্রেসিং-রুম করা হয়েছে। এক ঘণ্টা ধরে সে সাজছে। তার নাচ দিয়েই অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। লোকজন অধৈর্য। সময় কাটাবার জন্যে উদ্বোধন-সঙ্গীতের পরেও রামভজন গান হচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে।

একপাল লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রতনের দোকানের ওপর। সেখান থেকেই বার হবে নর্তকী। উর্বশী-মেনকার সগোত্র সে। চৌকির দুই পুলিশ সেখানে খাড়া। তাদের মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা মোটা ওভারকোট, কোমরে বেল্টে আটকানো তিন-ব্যাটারি টর্চ। বাঁ-হাতে বন্দুক।

বন্দুক দেখে আশ্চর্য হলাম। বললাম—সিপাহীজী, ভিড় হঠাবেন দরকার হলে, তা গোলি বন্দুকের জরুরতটা কী?

পুলিশ বললে—হুজুর, আমরা রাত-পাহারাদার। সারারাত আমরা মন্দির-বাজার টহল দিই। তাই বন্দুক থাকে সঙ্গে।

আমি বললাম—তাতেই বা বন্দুক কেন? বন্দুক মেরে চোর-ডাকু খতম করবেন?

চোর-ডাকু নয়, বাবুজী—বাঘ। গভীর রাত্রে কোনো কোনো দিন বাজারেও বাঘ আসে। মহিষের বাচ্চা তুলে নিয়ে যায়। মানুষ পেলে মেরে দেয়। দরকার মতো বন্দুকের আওয়াজ করে বাঘ তাড়ানো আমাদের ডিউটি।

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উদ্দাম রক্তস্রোত। সুরসভাতলে চিত্তচমৎকারিণী উর্বশী নাচছে। পেট্রোমাক্সের আলোয় তার স্তনহার থেকে যে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাতে ঝলসে যাচ্ছে চোখ। প্রায় কান পর্যন্ত টানা মোটা করে কাজলপরা চোখে যে কটাক্ষ হানছে তাতে বিদীর্ণ হচ্ছে বুক। তার বাহুসঞ্চালনে কুচ-স্পন্দনে নিতম্বদোলনে আসরে যেন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। সেই সঙ্গে বাজছে উদ্দাম ঢোলক। সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়াম সি-শার্পে বিলাপ করছে। সেই বিলাপে গলা মিলিয়ে নর্তকী মাঝে মাঝে গেয়ে উঠছে—

এসো এসো কৃষ্ণ-কান্হাইয়া এসো, গাঁওকা সব্‌সে জোয়ান মর্দানা এসো, আমার বিরহ-সন্তাপ নিবারণ করো—এই ঘন আঁধিয়ার কঠিন জাড়কা রাতমে আমার বুকের লহু আচ্ছাসে গরম করে দাও!

আশ্চর্য ঢোলকের সঙ্গতটি। নাচের প্রতিটি ছন্দকে ঢোলকের শব্দ উচ্ছ্বসিত করে তুলছে, প্রস্ফুটিত করে তুলছে নর্তকীর প্রতিটি দেহ-আবেদন। কে বাজাচ্ছে পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু এটা বুঝছি ঐ ঢোলকই নাচের প্রাণস্বরূপ। যে অভিমান যে আবেদন নাচের মধ্যে অর্ধস্ফুরিত, ঢোলকই করছে তার সরব উচ্চারণ। ছন্দ যখন সমে এসে পৌছচ্ছে তখন সমস্ত দর্শকের মনে দুঃসহ চাঞ্চল্যের বান ডাকাচ্ছে ঐ ঢোলক।

নৃত্যের আকুলতা যখন উচ্ছ্বাসে আকর্ষণে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন নর্তকীর পাশে উঠে দাড়াল ঢোলকওয়ালা। উত্তাল নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম ভঙ্গিতে সে বাজাতে লাগল। হইহই পড়ে গেল আসরে।

ঢোলকওয়ালার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। দামী গরম ট্রাউজারস্‌, মার্কিন ছাঁটের রংবাহার জার্কিন, তার নিচে পেট্রোমাক্সের আলোয় জ্বলজ্বলে স্ফটিকসাদা টেরিলিন শার্ট। ফরসা ধবধবে সুন্দর মুখ, ব্যাকব্রাস করা কালো চুল।

মুখটা বড়ো চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! লোকটা মনে হচ্ছে অজানা নয়! যদি অজানাই হয়—তাহলে কি বোম্বাই-ফিল্মের কোনো হীরো এখানে এসে জুটল?

নাচ থামতেই ছুটে আসরের মধ্যে ঢুকলাম। ঢোলকওয়ালার কাছে থেকে দেখতে হবে—জানতে হবে চেনা কি অচেনা?

আরে, এ যে অমিত! আমার অনেক চেনা পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অমিতচন্দ্র! খিদিরপুরের এক বেসরকারী দপ্তরে সকালে যে হাজিরা দেয়, বিকেলবেলা বল পেটায় ময়দানে! ভবানীপুর থেকে গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত যার সান্ধ্যবিহার, বসুশ্রীর কফিহাউসের যে মস্তান কাপ্তেন! ডানাকাটা পরী হাওয়াই চাকী করে

এখনো মর্তে নামে নি বলে বিয়ের বয়স পার হয়েও এখনো যার বউ জুটল না—সে কি না এই অমবকণ্টকের বাজারে দোহাতী নাচওয়ালীর সঙ্গে ঢোলক বাজিয়ে নাচছে !

৬

গিরিসানুবৃত গভীর অরণ্যানী। জগৎ থেকে যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কুটীর নেই, আশ্রম নেই। দুধারে শুধু প্রাচীন প্রাচীন গাছ, বন্যলতা, কণ্টকগুল্ম। চিহ্ন নেই জনমানুষের। কোথাও শীর্ণ একটি পথরেখা—সলিল-সন্ধানী বন্যজন্তুরা বুঝি সেই পথ বানিয়েছে। কোথাও শীর্ণা একটি জলধারা—সেই জলধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করতে আসে অরণ্য-শ্বাপদরা।

সেই পথে চলেছে অপূর্ব সুন্দরী নারী। রুক্ষদেহা, রুক্ষকেশী, ভূষণবিহীনা। অর্ধ-বসনমাত্র-সম্বলা। রাজনন্দিনী রাজবধূ সে। ভাগ্যদোষে বিজন অরণ্যমধ্যে পরি-ত্যক্তা। স্বামী তার মহারাজ—বর্তমানে রাজ্যহারা সর্বস্বহারা অর্ধোন্মাদ। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এই বনমধ্যে প্রাণপ্রিয়া মহিষীকে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেছে। এখন মন্দভাগিনী একাকিনী পথ খুঁজে খুঁজে ফিরছে বিন্ধ্যারণ্যের গভীরে। অশ্রুধারায় ভেসে যাচ্ছে দুচোখ—নিবিড় নিস্তব্ধতাকে মথিত করে ধ্বনিত হচ্ছে তার করুণ ক্রন্দন—

হা নল, হা প্রিয়তম নল, কোথায় তুমি !

অযোধ্যার দোকানের আসরে বসে নল-দময়ন্তীর পালা শুনছি। গহীন শীত, গভীর রাত। ইতিমধ্যে পেট্রোমাক্সে পাম্প পড়েছে দুবার। নল-দময়ন্তী মহাভারতে শাশ্বত প্রেমকাহিনী। সেই অবিনশ্বর কাহিনীকে মেকল পর্বতচূড়ার বন্য সরল আরণ্যক অধিবাসীদের কাছে পরিবেশন করছে অনুপ্‌পুরের ভ্রাম্যমাণ অশিক্ষিত যাত্রাদল। হিন্দী-ছত্রিশগড়ী অর্বাচীন ভাষার মাধ্যমে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই শুনছে। পতি-পরিত্যক্তা বিদর্ভ রাজকন্যা সুমুখী দময়ন্তী পথহীন অরণ্যে বিলাপ করছে—অশ্রু-সজল হতে বাকি নেই কারো চোখ।

দময়ন্তী বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। নিষধ রাজপুত্র নল হংসদূতের সাহায্যে দময়ন্তীর প্রণয় লাভ করেন। দময়ন্তীর রূপগুণের খ্যাতি স্বর্গমর্তে ছড়িয়েছিল। তাঁর স্বয়ংবর সভায় পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম, স্বর্গের চিরজীবী দেবগণ। দময়ন্তী মালা দিলেন মর্তপ্রণয়ী নলের কণ্ঠে।

দেবহিংসার ক্রূর ছলনায় নল রাজ্য হারালেন, সম্পদ হারালেন। সর্বস্ব হারিয়ে হলেন বনবাসী। সঙ্গে নির্ভূষণা পতিব্রতা দময়ন্তী। অমর্ত্যবাসীরা নলের অঙ্গবস্ত্র

পর্যন্ত হরণ করলেন, কেবল সতীকে উলঙ্গিনী করতে তাঁদের সাহসে কুলোলো না। নল আর দময়ন্তী এক বস্ত্র পরে বনমধ্যে চলতে লাগলেন।

নল বললেন—

দময়ন্তী, এই ভাগ্যহারা পতিকে পরিত্যাগ করার এবার সময় হয়েছে। বিদর্ভে যাও। সুখে থাকবে সেখানে।

চারুনেত্রী দময়ন্তী বললেন—

প্রিয়তম, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার দুঃখ। তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি যেখানে, আমিও সেখানে। ছাখো না, ভাগ্যের কী সুমহান আশীর্বাদ! একই বস্ত্রে ভাগ্য আমাদের দুজনকে বেঁধেছে।

ভাগ্যের সেই বন্ধন প্রেমের সেই গ্রন্থিকে একদিন কাটলেন ভাগ্যহত নল। বিন্ধ্যারণ্যের গভীরে তৃণশম্পতলে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে রাজরানী—মধ্য রাত্রে নল আস্তে আস্তে উঠলেন। খড়্গ দিয়ে দুই অঙ্গে জড়ানো বস্ত্রটি সাবধানে দুখণ্ড করে কাটলেন। একখণ্ড বস্ত্র আবৃত করে রইল দময়ন্তীর বরতনু, অন্য খণ্ডটি কোমরে জড়িয়ে সেই নিভৃত রাত্রির অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন নল।

বিরহবেদনার আবেগে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে যাত্রার দময়ন্তীর পরচুল খসে এসেছে! দেহাতী ভাষায় করুণ সুরে তীব্র স্বরে সে গাইছে নলবিচ্ছেদগীতি—সেই সুরে সুর মিলিয়ে জলদে উঠছে নামছে বেহালার তান।

আলুলায়িত পরচুল, শীতের রাতেও আসরের গরমে গায়ে জবজবে ঘাম, চোখের কোণে আঠা-আঠা কাজল আর দুগালে আধ-মোছা পেণ্ট—দুহাত সামনে বাড়িয়ে আস্তে আস্তে সামনে পা ফেলে ফেলে করুণ বিলাপে সভাস্থলকে মুহ্যমান করে নাটকীয় এক্সিট করল যাত্রার নায়িকা। আসরের বাইরেও ভিড়ে ভিড়—ত্রস্তে লোকজন দুফাঁক হয়ে গেল, দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে সে গেল রতনের দোকানের গ্রীনরুমে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লারিওনেটে তীব্র সুরে শুরু হলো ইণ্টারভ্যাল-সংগীত, বোম্বাই ফিল্মের গানের প্রাণমাতানো সুর—আসরে উঠে দাঁড়ালো নিপুণ ঢোলন্দাজ অমিতকুমার। অমিতকে এই আসরে দেখে আমি বেবাক অবাক হয়ে গেছি। লক্ষ্য করে দেখেছি. এতোক্ষণ—ও কেবল ঢোল-বাজিয়েই নয়, খোদ প্রডাকশন ম্যানেজার। অনুপ্-পুর আর পেণ্ড্রা—দুই দলেই ওর সমান খাতির। ব্যস্ততার অন্ত নেই। এখন ওর সামনাসামনি না যাওয়াই ভালো। মনের বিস্ময় মনেই চাপা থাক।

কোটের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে আমিও বার হয়ে এলাম। মিলিয়ে গেল বিড়ির ধোঁয়া আর কাশির আওয়াজ। কয়েক পা হাঁটতেই সব ফাঁকা। কনকনে

শীত, নির্মেঘ কালো আকাশে জ্বলজ্বলে তারার মেলা।
পশ্চিমে ঐ তারাভরা আকাশ যেখানে অরণ্যঘেরা গভীর চক্রবালে মিশেছে—ঐখানেই পরিত্যক্ত হয়েছিল বিদর্ভকন্যা দময়ন্তী। ঐ ঋক্ষ পর্বতের পাশ দিয়ে পথ খুঁজে ফিরেছিল প্রোষিতভর্তৃকা রাজবধূ, স্বামীর সন্ধানে—পিতৃগৃহ বিদর্ভ রাজপুরীর সন্ধানে। খুঁজে খুঁজে আর ঘুরে ঘুরে পৌছেছিল চেদীরাজ্যে। চেদী আর বিদর্ভ রাজবংশ একই বংশের শাখা, উভয়েরই পূর্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয়। চেদীরাজ সমাদরে দময়ন্তীকে পিতৃগৃহে পৌছে দেন।
নল-দময়ন্তী পালা দময়ন্তী-বিলাপেই তুঙ্গস্পর্শী। এই দৃশ্যই সবচেয়ে জমাট, দর্শকের মরমে গিয়ে বেঁধে। পরের দৃশ্যের জন্য তাড়াতাড়ি আসরে না ফিরলেও চলবে। হাঁফ-ধরা ভিড়ের বাইরের শীতটাও ভালো।

রাস্তার ওপারের মাঠে খালি বাস কয়েকটা দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিন সারারাত বাসে কেউ না কেউ থাকে—ডাইভার, ক্লীনার। দু-একজন যাত্রীও। আজ নিশ্চয় কেউ নেই। যাত্রা শুনছে। মনে ভাবলাম, একটা বাসের মধ্যে ঢুকে একটু ঝিমিয়ে নিলে কেমন হয়। আসরের আলো বাস থেকেও চোখে পড়বে, কানে আসবে গান-বাজনার স্বর।
কয়েক পা এগিয়েছি, কানে এলো—
ভাইয়া?
দেওকী, তুমি?
আধো অন্ধকারে ছায়া-ছায়া ওর দেহের রেখা, চিকচিক করছে ওর চোখ।
হ্যাঁ ভাইয়া, আমি। যাত্রা ছেড়ে উঠে এলে কেন?
আমি বললাম—তুমি আমায় দেখলে কী করে? কোথায় ছিলে?
দেওকী বললে—সন্ধ্যেবেলা রাস্তার ধারে ইঁট বিছিয়ে পানের দূকান দিয়েছিলাম। ঐ রত্‌নার দূকানেরই এক পাশে। দেখতে পাওনি?
না দেওকী, চোখে পড়ে নি তো?
পালা শুনতে গিয়ে দূকান করা হলো না। মালপত্র ঘরে তুলে আসরের কিনারে গিয়ে বসলাম। আমি তোমাকে দেখেছিলাম ভাইয়া, ঠিক লক্ষ্য ছিল কোথায় তুমি বসে আছ!
উঠে এলে কেন?
দেখলাম তুমি উঠে এলে, তাই পিছনে পিছনে আমিও এলাম। দেখলাম মাঠের দিকে হাঁটছ—তা এসে ভালোই করেছি, তাই না? যদি আবার শের পাকড়ায়,

—পাহারা দিতে হবে তো ?

রাগ হলো ওর কথা শুনে। মাঝরাতের অন্ধকারেও ওর ভিজে চোখে ঠাট্টার ঝিলিক। বললাম—তুমি যাও দেওকী, পাহারা দেবার লোক কাছে আছে। রাত-পাহারাওয়ালা, হাতে বন্দুক।

উত্তরে দেওকী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—যাবোই তো ? রাত বিরেতে তোমার পিছনে ঘুরব না কি ?

তাই যাও।

আমি কয়েক পা এগোলাম।

পিছন থেকে দেওকী আবার ডাকল, নরম মিঠে গলায়—তা মাঠের মধ্যে তুমি কোথায় চলেছ ভাইয়া ? যাত্রা শুনবে না ?

আমার বড়ো ঘুম আসছে দেওকী, ঐ বাসের মধ্যে শুয়ে আমি ঘুমব।

কী আফসোস ! কী শরমকী বাত ? বাসের মধ্যে শুয়ে থাকবে তুমি ? ছি-ছি ! চলো, তুমি আমার ঘরে চলো—সেখানে আরামসে লেট যাবে !

খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরল। কী কাণ্ড—বলে কী, করে কী মেয়েটা ! বিদেশ বিভূঁই, নিঝুম রাত ! বাঘতাড়ানী আদিবাসী যুবতী, সংসারের খাঁচায় পোরা লোলুপ বাঘিনী। চিৎকার করে মুক্তি নেই, বরং বিপদ সমধিক।

সন্ত্রস্ত চাপা গলায় বললাম—আমার ঘুম পালিয়ে গেছে বিলকুল, আমি এখন যাত্রা শুনতে যাব।

আবার ঝরনার মতো শব্দ করে হাসল দেওকী। হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে—তা যাবে যাও ! কিন্তু এবার আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘরে যাব। আমাকে ঘর পর্যন্ত একটু পৌঁছে দেবে না ভাইয়া ?

ওর স্বচ্ছ হাসিতে ওর এই কথাগুলির কোমলতায় কী এক মায়া ছিল, কৌতুকের পিছনে কেমন একটা শান্ত আর্দ্রতা ছিল—আমি ওর সঙ্গে না গিয়ে পারলাম না। যাত্রার ভিড় এড়াবার জন্যে ও মাঠের পাশ দিয়ে ঘুর পথ নিল, সে পথে আমিও চললাম। দুপাশে ছোট ছোট কুটীর—একটিতেও আলো জ্বলছে না। ঘরে নিশ্চয়ই কেউ নেই, ঝাঁপ বন্ধ, সবাই যাত্রার আসরে। সেখানে ইণ্টারভ্যালের বাজনা থেমেছে। আমরা চলেছি—আমাদের ঘিরে আছে রাত্রির নিস্তব্ধতা, নির্জনতা আর অন্ধকার।

দেওকী হঠাৎ নিচু গলায় বললে—ভাইয়া ভয় পেয়েছিলে ?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

দেওকী আবার বললে—

ভাইয়া, আমাকে কোনো ভয় নেই। জানো, যাত্রা শুনতে শুনতে মনটা বড়ো উদাস হয়ে গেল, চোখের জল খালি খালি ঝরে পড়তে লাগল। তাই তোমাকে উঠতে দেখে ভাবলাম—যাই, ভাইয়ার সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি। রাগ করেছ তুমি ? অন্যায় করেছি ভাইয়া ?

প্রথম আলাপ থেকে মেয়েটা ভাইয়া বলে ডেকে আসছে আমায়। শেঠ না, সাব না, বাবুজী না—ভাইয়া। এ এক আশ্চর্য সম্বোধন। এই সম্বোধনের গভীরতা হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সহসা যেন মনের মধ্যে বেজে উঠল দময়ন্তীর বিলাপ। যাযাবরী প্রিয়দর্শিনীকে সমাজ-সংসারের অরণ্যে পরিত্যাগ করে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে ওর প্রিয় দয়িত—এ অরণ্যে কেউ ওর আপন নয়, কেউ ওর সুহৃদ নয়, তাই বুঝি পথের সন্ধানে পরবাসী পথিককে নিভৃতে আহ্বান করছে—ভাইয়া !

পায়ে পায়ে দেওকীর ঘরের কাছে পৌঁছে গেছি। বললে—আর আসতে হবে না ভাইয়া, এবার তুমি যাও।

শংকর জানেন কারুণ্যের কোন্ অমৃত স্পর্শে অভিষিক্ত হয়েছিল আমার হৃদয়। আমি বললাম—

না বহিন, দরজা খোলো, রোয়াকে চাটাই পাতো একটা—আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব।

আশ্চর্য হওয়ার কথা দেখলাম শুধু আমারই—অমিতের নয়। দেওকীর হাতের চা খেয়ে তার গায়ের কম্বলটা নামিয়ে ভোরবেলা যখন অযোধ্যার দোকানে ফিরে এলাম তখন তারও উনুনে কেটলি চেপেছে। গনগনে আঁচের ধারে অতিথির কিন্তু আজ নিতান্ত অভাব। একটি ধারের ঝাঁপ কেবল খোলা হয়েছে—মেঝের কানাতের উপর ঠাসাঠাসি করে কুঁকড়ি হয়ে ঘুমচ্ছে যাত্রাদলের লোকজন। কম্বলে নাক-মাথা সব ঢাকা। কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রের যুদ্ধক্লান্ত অবস্থা। উলেন মোজায় ঢাকা অ্যামবাসাডার জুতোয় মোড়া পা দুটো গরম উনুনের গায়ে লাগিয়ে পাশের টুলের উপর বসে দাঁতে বুরুশ ঘষছে অমিত। মার্কিন-ছাঁট জার্কিনের কলারের উপর টক-টকে লাল মাফলার।

উত্তেজিত বিস্ময়টা কাল রাত থেকে মনের মধ্যে পুষে রেখেছি, দৌড়ে কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম—অমিত !

আসুন দাদা, অমিত মুখ ঘুরিয়ে বললে—আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। অযোধ্যা বললে আপনি ভোর-ভোরই এখানে আসেন।

তা তুমি এখানে কী মনে করে অমিত ? এই অমরকণ্টকে ?

বাঃ, কাল দেখলেনই তো, দন্তবিকশিত হাসি হেসে অমিত বললে—যাত্রাদলের ঢোল বাজাতে !

কাল তুমি আমায় দেখেছিলে ?

দেখব না কেন ? তাছাড়া আপনারই জন্যে তো এখানে আসা ?

আশ্চর্যের উপর ডবল আশ্চর্য। আমি এসেছি ও জানল কী করে ? রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর মোড়ে কবে শেষ দেখা ! বলিরামের মিঠে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হবু ফিল্ম ডাইরেকটরদের সঙ্গে হইহই আড্ডা দিচ্ছিল, আমি তো তখন পাশ কাটিয়েই গিয়েছিলাম !

আমি বললাম—আমি অমরকণ্টকে এসেছি সেকথা তোমায় বলল কে ?

বলব কেন ?

পাশের টুলে বসলাম। দু-গ্লাস গরম চা সামনে ধরল অযোধ্যা। চায়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ধীরে-সুস্থে জট খুলল অমিতকুমার।

বাল্য ও কিশোরের অধিকাংশ কাল অমিতের কেটেছে মধ্য প্রদেশে পেণ্ড্রায়। পেণ্ড্রার স্কুলে সে পড়েছে, সেখানকার মাঠে সে প্রথম ফুটবলে লাথি মারতে শিখেছে। বড়ো হয়ে কলকাতায় গেলেও পেণ্ড্রার সঙ্গে সংযোগ তার বিচ্ছিন্ন হয় নি। যে কোনো লম্বা ছুটির সুযোগ পেলেই সে পেণ্ড্রায় চলে আসে। বাল্যের সঙ্গিরা যারা এখনো সেখানে আছে, তারা প্রায় সকলেই স্থানীয় ব্যবসাদার। কারো খাবারের দোকান, কারো কাপড়ের আড়ত, কেউ বা মাছের চালানদার। একজন আবার হোটেল মালিক। অমিত পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে বসে সংস্কৃতি আর কর্মজীবনের দুস্তর ব্যবধানকে অতিক্রম করে। বিরুদ্ধ জীবনযাত্রার সব বিচ্ছেদ ভুলে তারাও তাকে আগের মতন কাছে টেনে নেয়, সহর্ষে বলে—আ গয়া, কলকাত্তাকা কলমবাবু।

এবার পেণ্ড্রায় এসে হোটেলওয়ালার কাছে অমিত শুনল এক বাঙালিবাবু একলা গিয়েছে অমরকণ্টকে। কৌতূহলে খাতা খুলে দেখল আমার নাম। বাজারে শুনল আর এক বন্ধু নাচওয়ালীর দল নিয়ে অমরকণ্টক যাচ্ছে। দ্বিরুক্তি না করে অমিত দলে ভিড়ে গেল। বন্ধু বললে—ইয়ার, তুম নাচকে সাথ্ ঢোলক বাজাওগে ?

অমিত বললে – জরুর !

চায়ের গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে অমিত বললে—আপনার জন্যেই আসা দাদা। পেণ্ড্রায় দু-এক বছর অন্তর আসি, কিন্তু অমরকণ্টক বহুদিন আসি নি। আপনার টানেই এবার আসা হোলো।

দেখতে দেখতে অযোধ্যার দোকানে সকালবেলাকার আসর জমজমাট হয়ে উঠল। নাচনেওয়ালীর ম্যানেজার, যাত্রার অধিকারী, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল অমিত। অমিত আমাকে দাদা ডাকে সেই সুবাদে সকলের দাদা হয়ে গেলাম। অযোধ্যাকে অর্ডার দিলাম এক এক প্লেট নামকিন সকলের সামনে রাখতে। আর এক এক গ্লাস চা।

সামনে দিয়ে দেওকী চলেছে ঝমর-ঝমর মল বাজিয়ে। রুক্ষ চুলের রাশ ঢেকে হলুদ ওড়নাটা গলায় মাথায় জড়ানো। দেওকীর সঙ্গে কাল রাত্তিরে আমি গেছি, কারো না কারো হয়তো চোখে পড়েছে। ওর সঙ্গে আমার পরিচয়টা সকলের সামনে সহজ করে নেওয়া ভালো।

খুব সহজভাবে গলা বাড়িয়ে আমি ডাকলাম—

দেওকী, ও দেওকী ?

দোকানের ধারে দেওকী এলো। চোখে রাত্রিজাগরণের ম্লানিমা। হেসে বললে— কী ভাইয়া !

অমিতকে দেখিয়ে বললাম—এই হ্যাখো দেওকী, আমার ভাই। শহর থেকে এসেছে।

দেওকী অমিতের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল একবার—তারপর শুধোল—আপন ভাই ?

আমি বললাম—আপন ভাই না হলে কি ভাই হয় না? তুমি যেমন আমার বহিন, ও ঠিক তেমনি আমার ভাই।

তাই বুঝি ? ভ্রূভঙ্গি করল দেওকী। তারপর দাঁত বার করে বললে—

পাতানো ভাই তো ? পাতানো বহিন মিঠা আর পাতানো ভাই খাট্টা !

দেওকীর আবির্ভাবেই তো আড্ডায় চমক লেগেছিল, এবার তার কথার ভঙ্গি ফুর্তির হিল্লোল বইয়ে দিল। অপ্রতিভ অমিত বললে—বাঃ, আমি হয়ে গেলাম খাট্টা ?

চোখ পাকিয়ে দেওকী বললে—নিশ্চয় ! আমি বুঝি দেখি নি ? কাল সারারাত খুবসুরৎ নাচনেওয়ালীর পায়ে পায়ে ঢোলক বাজালে, তখন তো বড়া ভাইয়ের খোঁজ পড়ে নি ! বা রে আমার সকালবেলার চা-নামকিন খানেওয়ালা ভাইয়া !

সবাই হেসে উঠল। অমিত বললে—ভালো জ্বালা, তা তুমিও চা-নিমকিন খাও না দাদার পয়সায় ! বারণ করছে কে ?

আমি বললাম—চা খাবে দেওকী ?

না ভাইয়া, স্নান আছে, শিবপূজনভী বাকী আছে।

দেয়ালের কোণে মোটা তোশক বিছিয়ে কে একজন ঘুমচ্ছিল। কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল তার। কম্বলের মধ্যে থেকে উঠে এসে দাঁড়াল। ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, ব্রণভর্তি গালে গোলাপী পেণ্ট। পরনে ঢোলা পায়জামা আর চেক কটস্-উলের লম্বা ঝুল শার্ট। কাঁপতে কাঁপতে উনুনের কাছে এসে উবু হয়ে বসেই মিনমিনে গলায় ডুকরে উঠল—

আমার চা-নামকিন ?

অমিত ধমকে উঠল ছোকরাটাকে দেখে। বললে—ছট্টু, ইধার আ ! এই ছাখ, এই আমার দাদা। আগে পায়ের ধুলো নে ব্যাটা, চা-নামকিন পালিয়ে যাচ্ছে না।

কায়ক্লেশে রোগাপটকা দেহটা টেনে এনে ঢিপ করে ছোকরা পায়ের ধুলো নিল আমার। তারপর আবার ধপ করে বসে পড়ে ঢুলতে লাগল।

আমি বললাম—এটি কে অমিত ?

ঐ তো নাচনেওয়ালী দাদা, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু ! কাল কেমন নেচেছিল বলুন তো ?

আমি হাঁ করে আধঘুমন্ত ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হায়, হায় ! এই মেনকা-উর্বশী, কাল রাতে যার নৃত্যলাস্যের আমন্ত্রণে তামাম জোয়ান মরদ দর্শকের এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে ?

দেওকী রঙ্গ করে বললে—ক্যা তাজ্জব! এই নাচনেওয়ালী, তুমহারা দিল তোড়-নেওয়ালী ? তুমি একদম খাট্টা ছোটা ভাই !

রাগে লাল হয়ে উঠল অমিতের মুখ। চিড়বিড়িয়ে উঠে বললে—খুব যে বলছ, তুমি এমন নাচতে পারো ?

শান্ত কৌতুকভরা কণ্ঠে দেওকী বললে—

রাগ কোরো না ছোটা ভাই, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আর শোনো, আমি যদি নাচি তাহলে তোমার আর ঢোলক চাপড়াতে হবে না, জীবনভোর বুক চাপড়েই কাটবে।

আবার হাসির রোল। কাল রাত্রের শেষ প্রহরে যে দেওকীকে দেখেছিলাম, এ দেওকী সে দেওকীই যেন নয়। দেওকীর এই রঙ্গিণী রূপ আমি ভাবতেই পারি নি। আশ্চর্য মেয়েটা !

অযোধ্যা যে কতোদিন হলো মেয়েটাকে জানে সেও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিল। আমি প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করতে চাইলাম। বললাম—

দেওকীর সঙ্গে আমার কী করে আলাপ হলো জানো, অযোধ্যা ? পরশুদিন বিকেলে শোণভদ্র দেখতে গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যা

ঘনিয়ে এলো। পথ হারিয়ে গেল। একটা লোক নেই কোথাও। এমন সময় পিছনে শুনলাম বাঘের ডাক। বাঘ আমি অনেক মেরেছি, বাঘকে আমি ভয় পাইনে। কিন্তু সেদিনকার অবস্থা ছাখো। জনমানুষ নেই, পথ চিনিনে—হাতে বন্দুকও নেই। চিৎকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এমন সময় দেওকী আমাকে বাঁচাল। তাই তো দেওকীকে আমি বহিন ডাকি!

কী করে বাঁচাল বাবুজী?

মাঠের ওধারে কোথায় যাচ্ছিল। চিৎকার শুনে ছুটে এলো। পথ চিনিয়ে আমাকে বাজারে পৌঁছে দিল।

অযোধ্যা সরল মনে বললে—একটা বন্দুক কাছে থাকলে বড়ো ভালো হয়। আপনার বন্দুকটা কেন সঙ্গে নিয়ে এলেন না বাবুজী?

ফুর্তু লালের অনুকরণ করে বললাম—চিনী হামলার সময় বন্দুকের বড়ো দরকার অযোধ্যা। তাই লালবাজারের পুলিশের বড়ো সরকারের কাছে ওটা জিম্মা করে দিয়েছি।

দেওকী চুপ করে শুনছিল। সে আমার প্রাণদাত্রী, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার পরম উপকারের কথা আমি বলছি। এবার আর কৌতুক-বিদ্রূপ নয়, এইবার তার চুপ করে থাকারই কথা।

উঠে দাঁড়াল। বললে—বহুত কাম আছে, এবার আমি চলি।

দু-পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে এসে উদাস কণ্ঠে বললে—

ভাইয়ার মনে সত্যিই ভয়-ডর নেই। ভাইয়া আমার সত্যিই বন্দুকধারী বীর-শিকারী। কিন্তু ক্যা আজব, সেদিন জঙ্গলের কিনারে স্রিফ সম্বরের ফুকার শুনে আমার ভাইয়ার কাপড়া খারাব হোয়ে গেল!

এ দেওকী সে দেওকী নয়! এই পরিহাসনিপুণা মুখরা বাক্যবিলাসিনী। দিনের আলোয় এই প্রখরা প্রহাসিনী।

গভীর রাত্রের নির্জনতায় সে স্তিমিত প্রদীপের ম্লানিমা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল আমার পাশে। কোলের উপর হাতদুটি জড়ো করে রেখে। খুলে রেখে ছিল তার অলঙ্কার—সিঁথির আর কানের কুণ্ডল। ঘরের কোণে রাখা আধ-নিবন্ত লণ্ঠনের আলো। সেই আলোর রেখা পড়েছিল তার আলুলায়িত কেশে, তার আধ-বোজা চোখের পক্ষ্মকোনায়। ঘনিয়েছিল রহস্যের ছায়া-অন্ধকার।

দাওয়ায় পেতেছিল চাটাই-এর উপর একটা জীর্ণ শতরঞ্জি আর ছেঁড়া কাঁথা। আমি বললাম—

দেওকী, তুমি একলা এখানে থাকো ?

একাই থাকি ভাইয়া, আর কে থাকবে আমার ?

ভয় করে না ?

ভয় তো মানুষকে, বদমাইশকে। বদমাইশ আমাকে ভয় পায়, তা ছাড়া আর সবাই আমাকে ভালোবাসে। তুমিও তো আমাকে ভালোবাসো, তাই না ভাইয়া ?

বাসি বই কি দেওকী। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। ভাই বলে ডেকেছ। তা ভাইয়ার ভালোবাসার কথা ছেড়ে দাও—একটা কথা বলবে ?

বলো।

মোহন নাকি তোমায় ছেড়ে গেছে ? আর ফিরবে না ?

নীরবে হাসল দেওকী। বললে—ওর মা বলেছে বুঝি ?

আমি বললাম—

শুধু তোমার শাশুড়ী কেন, অনেকেই বলেছে। অযোধ্যাও বললে, তোমাদের পেয়ার টুটে গেছে। মোহন দেশান্তরী হয়ে গেছে, কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

দেওকী বললে—

ওরা কেউ জানে না ভাইয়া—মোহন আমার প্রীতম, আমাকে ছেড়ে কোথাও সে যাবে না। আবার ফিরে আসবে।

মোহন যখন দেওকীকে বশ করল তখন তার ইয়ার-মহলে ধুম পড়ে গেল। মোহন বাঁশি বাজায়, গান করে, আর দেওকী জানে আদিবাসী বিচিত্র নাচ। বন্ধুরা বললে—জংলী মেয়েটাকে নাচওয়ালী করে নিয়ে চল্ ঘুরি, দু-চার সাল ফুর্তিও করে নি।

কিন্তু তা আর হলো না, কারণ দেওকীও ভালবাসল মোহনকে। ভালবাসার জোয়ারে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ভালবাসার উদ্দামতায় তাকে পাগল করল। ব্যবসা তার মাথায় উঠল, বন্ধুবান্ধব ছাড়ল—ঘর পর্যন্ত ছাড়ল মোহন। কিন্তু দেওকী মোহনের একমুহূর্তের ছাড়াছাড়ি নেই। সারাদিন দুজনে মিলে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়, একজন বাঁশি বাজায় অন্যজন নাচে, কারণে অকারণে হাত ধরাধরি করে ছুটোছুটি করে, নিভৃত বৃক্ষছায়ার নিচে প্রেম করে নির্লজ্জভাবে। দেওকী সংসারের মেয়ে নয়, যাযাবরী বনচারিণী সে, তার বাসনার উচ্ছ্বাস অন্তঃপুরের বাধা মানবার নয়। বসন্তের মদির রাতে মুক্ত আকাশের নিচে সে দয়িতের বাসরশয্যা পাতে।

রতন আর তার মা দোকানটা চালায়। মোহন মাঝে মাঝে আসে, হাত পেতে টাকা নেয়। ছোট ভাই-এর উপর হম্বিতম্বি করে, মার গালাগাল খায়।

দেওকীকে একদিন বলে—চল্ দেওকী, ঘর সাজিয়ে বসি, দোকানটা গুছিয়ে নিই।

দেওকী হিহি করে হাসে। বুকের উপর লুটিয়ে মোহনের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—যাবিই তো! সময় এলে যেতেই তো হবে। সময় হলেই তোকে বলব। এখন ঘরে গেলে এমনটি পাবি?

দেওকী আমাকে বললে—

সালভোর কেটে গেল, কিন্তু সময় এলো না ভাইয়া—পেটে ছেলিয়া এলো না আমার। হাসি, নাচি, রাতভোর পিয়ার করি—কিন্তু কোল খালিই রইল আমার। মাঝে মাঝে দেখি মোহনের মুখও ভার, সেই মুখ দেখি আর বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে আসে।

একদিন শুনলাম শাডোল হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার এসেছে, সরকারী কুঠিতে উঠেছে। মোহনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেলাম। বললাম—ডাক্তার সাব, পেটে ফল ধরে না কেন আমার? কী দোষ আছে আমার, দেখে দাও।

দেওকীকে দেখে আর তার নিলাজ স্পষ্ট আবেদন শুনে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হয়েছিলেন ডাক্তার সাহেব। তিনি সার্কিট হাউসের বারান্দা থেকে দেওকীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ভালো করে পরীক্ষা করে তাকে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কতোদিন বিয়ে হয়েছে?

এক সালের উপর সাব!

ডাক্তার বললেন—তোমার কোনো ভয় নেই, মা হবার জন্যেই তুমি তৈরি হয়েছ। তোমার স্বামী কোথায়? ডাকো তাকে।

মোহন গুটিগুটি ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার চোখ পাকিয়ে বললেন—বউ-এর ছেলে হয় না বলে তুমি তার উপর খুব হামলা করো—তাই না?

মোহনের মুখে কথা নেই। সে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

দেওকী ত্রস্ত গলায় বললে—নেহী নেহী সাব, ও আমাকে খুব পেয়ার করে, কেউ হামলা করে না আমার উপর।

ডাক্তার বললেন—কোনো দোষ নেই তোমার বউ-এর। একবার শাডোলে নিয়ে যাবে—শীতের আগে। আমি হাসপাতালে কদিন রেখে ঠিক করে দেব।

এবার ঠকঠক করে কাঁপবার পালা দেওকীর! সে অনভিজ্ঞা কিশোরী নয়। পথে

পথে অনেক ঘুরেছে, অনেক দেখেছে, জেনেছে। বললে—কাটাছিঁড়া করতে হবে ডাক্তার সাব ?

ডাক্তার সেকথার উত্তর দিলেন না। মোহনকে বললেন—কী করো তুমি ?

পান বিড়ির দূকান সাব!

খসখস করে কাগজে লিখলেন ডাক্তার সাহেব। কাগজের টুকরোটা দেওকীর হাতে দিয়ে বললেন—

ফুরসত করে তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দেবে শাণ্ডালে, হাসপাতালে আমার কাছে। এই কাগজ দেখালেই আমার দেখা মিলবে। ও আগে যাবে। আমি ব্যবস্থা করবার পর ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তাই ভালো।

প্রণয়ের উচ্ছ্বাস কাটল, প্রণয় কিন্তু টুটল না। দেওকীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো মোহন। ঘরে ঠাঁই মিলল না, দোকানের শেয়ার মিলল না।

দেওকী বললে—ভাই-এর সঙ্গে কাজিয়া কোরো না, নূতন দোকান বানাও।

গলির মধ্যে দোকানঘর একটা নিল মোহন। হাতে পুঁজি নেই, মনে জোর নেই। জোর দিল দেওকী। খেতিতে জন খেটে সে উপায় করতে লাগল। কোনো রকমে টিমটিমে দোকান সাজালো। এইটুকু আশ্রয় গড়ে তুলতে গেল আরো কয়েক মাস।

সার্কিট হাউসের চৌকিদার সেদিন শুনেছিল ডাক্তার সাহেবের কথা। দেওকীকে তিনি ঘরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন দেখে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। তারপর দরজা খুলে মোহনকে ডাকবার সময়ই সে এসে দাঁড়িয়েছিল পর্দার পাশে। তার কানাকানি সে পৌঁছে দিয়েছিল রতনের কানে।

দেওকী বললে—তারপর নয়া আস্তানা বানাতে আমাদের যখন জান নিক্‌লে যাচ্ছে ভাইয়া তখন এক'দিন সন্ধ্যেবেলা একলা পেয়ে রতন আমাকে ডাকলে। কুৎসিত ইঙ্গিত করে বললে—কী ভাবী, বাচ্চা চাও ? একরাত আমার কাছে এস, আমি বানিয়ে দেব।

আমি বললাম—ছি-ছি! তারপর!

সেই রাত্রেই মোহনের গাঁটরি গুছিয়ে দিলাম, বললাম—আর দেবি নয়, যাও তুমি শাডোলে ডাক্তার সাহেবের কাছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করল দেওকী। আমিও চুপ করে রইলাম। ভাবলাম তারপর চার মাস কেটেছে। সত্যিই কি মোহন শাডোল হাসপাতালে গেছে ? না ভিড়ে গেছে কোনো যাত্রা দলের সঙ্গে ? বাঁশি বাজিয়ে যোগাড় করেছে আর কোনো সঙ্গিনীকে ? ঘরের শৃঙ্খল দেওকীই তার কাটিয়েছে, দেওকীর শৃঙ্খল

ভাঙতে তার কতোটুকু ?
আকাশে তখন ঊষার আভাস।

অমরকণ্টকের সেই আকাশে দিনান্তের ধূসরতা এখন। রাত্রিবেলা অযোধ্যার দোকানে যাত্রাদলের ফীস্ট হবে। অনেক যোগাড়যন্তর, অনেক ব্যস্ততা। আয়োজনের প্রধান পাণ্ডা অমিতকুমার। তাকে সঙ্গে টেনে বিঘ্ন ঘটাতে চাই নি। সারাদিন কাছাকাছি একলা ঘুরে বেড়াচ্ছি। দোকানে-বাজারে, পাণ্ডাপাড়ায়, পোস্ট অফিসে, সংস্কৃত বিদ্যালয়ে। কিছুক্ষণ বসে গল্প করেছি দূরাগত একটা গোয়ালাদলের সঙ্গে।
বিকেলবেলা হাঁটা দিলাম মন্দিরের দিকে। অহল্যাবাঈ ধর্মশালার পুনর্নির্মাণে খুব কাজ হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিস্ত্রি-মজুরদের কাজ। সেখান থেকে প্রবেশ করলাম গান্ধী-উদ্যানে।
কোটিতীর্থের পশ্চিম দিকেই গান্ধী-উদ্যান। চারদিকে সুন্দর রেলিং-ঘেরা। বাগানে চমৎকার ঘাসের বাগিচা। নানা ফুলের গাছ। একটি বেদী। বেদীর উপর গান্ধীজীর মর্মরমূর্তি। কোটিতীর্থ থেকে নর্মদাধারা গান্ধী-উদ্যানের ঠিক মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে উদ্যানের পশ্চিম প্রান্ত পার হয়ে প্রান্তরে গিয়ে পড়েছে। এখানে নর্মদার সঙ্গে মিশেছে আর দুটি ক্ষীণা স্রোতস্বিনী—সাবিত্রী ও গায়ত্রী।
কাল অমরকণ্টক থেকে বিদায় নেব। তাই সকলের সঙ্গেই দেখা করছি। কাছাকাছি সব কিছুই আর একবার দেখে নিচ্ছি। আজ শংকর-নর্মদার শেষ সান্ধ্য আরতি দর্শন করব। মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম।
নর্মদাকুণ্ডের ঘাটে বসে জপ করছিলেন বৃদ্ধ পুরোহিত। ওষ্ঠ দুটি অল্প নড়ছিল, মৃদু উচ্চারণ হচ্ছিল—রেবা, রেবা, রেবা!
আমাকে দেখে জপ বন্ধ করলেন, হাত দেখিয়ে বললেন—
ইধার বৈঠো বেটা।
আমি বসলাম। সংকোচভরে বললাম—আমি আপনার বাধা সৃষ্টি করলাম না তো বাবা ?
কোঈ বাত নেই! রেবা-নাম তো সর্বদাই জপতে হয় বেটা। কভী মুখমে, কভী মনমে। নর্মদামায়ীর কতো নাম জানো ? ভক্তরা কতো নামে তাঁকে ডেকেছে ? কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ নাম রেবা। রেবাই নর্মদার জপমন্ত্র।
যখনই দেখা হয়েছে পাণ্ডাজীকে নানা প্রশ্নে বিরক্ত করেছি। অবশ্য বিরক্ত তিনি কখনো হন নি। তাই এবারও জিজ্ঞাসা করলাম—নর্মদার রেবা নাম হলো কেন

পাণ্ডাজী?

বৃদ্ধ পাণ্ডা বললেন—

ভিত্বা শৈলঞ্চ বিপুলং প্রযাতেব্যং মহার্ণবম্

ভ্রাময়ন্তী দিশঃ সর্বা রবেন মহতা পুরা।

প্লাবয়ন্তী বিরাজন্তী তেন রেবা ইতি স্মৃতা॥

নর্মদা শৈল ভেদ করে বিপুল হর্ষে মহার্ণবের দিকে ধাবিত হলেন, দিক্‌দিগন্ত বিভ্রান্ত ও প্লাবিত করে মহারব উত্থিত করে তিনি পশ্চিম সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হলেন, তাই তাঁর অপর নাম রেবা।

শংকরস্বেদসম্ভূতা নর্মদার রেবা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর এক বিচিত্র লোক-কাহিনী শোনাল দেওকী।

পুরোহিত সান্ধ্য-পূজার আয়োজনে মন্দিরে গেলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। আজ সারাদিন এখানে ওখানে অনেক ঘুরেছি। ঘাটের সিঁড়িতে ক্লান্ত পা ছড়িয়ে বেশ ভালোই লাগছে। ঠাণ্ডাও এখনো বেশি পড়ে নি। আসার পথে বাস ড্রাইভার ভয় দেখিয়ে বলেছিল এমনি সময়ে অমরকণ্টকে বরফ পড়ে। কিন্তু শংকরের আশীর্বাদে তেমন শীত এখানে এবার পড়ে নি। অযোধ্যা বলেছিল টিলার মাথার রেস্ট হাউস ছেড়ে এসে তার দোকানে উনুনের ধারে রাত্রে শুয়ে থাকতে। তারও দরকার হয় নি। আর আজ তো অমরকণ্টকে শেষ রাত।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেওকী এলো। পাশে এসে বসল। নির্জন কুণ্ডতীর। মন্দিরের মধ্যে কয়েকজন মাত্র।

আমি একটু মুচকি হাসলাম। বললাম—কী করে টের পেলে দেওকী—আমি এখানে?

দেওকী বললে—কোথায় আর থাকবে সন্ধ্যেবেলা। হয় অযোধ্যার দোকানে, নয় মন্দিরে। ঠিক খুঁজে খুঁজে এলাম।

বেশ করেছ দেওকী। তুমি এলে, বড়ো ভালো লাগল আমার।

দেওকী বললে—অযোধ্যা বলছিল, কাল তুমি নাকি চলে যাবে ভাইয়া?

হ্যাঁ দেওকী।

উত্তরে কী বলবে দুদিনের পাতানো বহিন দেওকী? বলবে, আর দুদিন থাকো? এই আশাই কি আমি করেছিলাম?

দেওকী শুধু বললে—

একটা কথা তোমাকে বলি ভাইয়া, এই কুণ্ডে আমি একদিন ডুবতে এসেছিলাম।

সেদিন নর্মদামায়ী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমায় বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এই কুণ্ডে আমার পহেলী মেয়েটা মরেছে, আর কেউ মরবে না, এই জল যে মাথায় নেবে তার সকল মনস্কামনা আমি পূর্ণ করব।
নিচু হয়ে কুণ্ড থেকে এক অঞ্জলি জল তুলে নিয়ে দেওকীর মাথায় দিলাম, নিজের মাথায় দিলাম। বললাম—
নর্মদা-শংকরের আশীর্বাদে তোমার সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বলো তো, মোহন কবে ফিরবে ?
দেওকী বললে—
আমার মন বলছে ভাইয়া ডাক্তার সাবের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সব ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে দু-চার মাস ব্যবসা করে কিছু টাকা কামাবে বলেছিল। টাকা এনে আমাকে আবার নিয়ে যাবে। আমাকে সারিয়ে এনে নয়া দূকানটা ভালো করে জমাবে।
তাই হোক দেওকী।
একটু পরে বললাম—নর্মদার প্রথম মেয়ে এখানে ডুবে মরেছিল বললে, কে সে ?
দেওকী গল্প শুরু করল—
অনেক অনেক বছর আগেকার কথা ভাইয়া। তখন এখানে মন্দির কুণ্ড কিছুই ছিল না। বাস ছিল না জনমানুষের। পাহাড়ের মাথায় শুধু গভীর বন, সেই বনের মধ্যে অনেক আমলকী আর হরিতকীর গাছ। দূর গাঁও থেকে কোনো কোনো লোক বনের মধ্যে হরিতকী কুড়োতে আসত।
একদিন একটা গরীব লোক পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের মধ্যে হরিতকী কুড়োতে কুড়োতে ঠিক এইখানটায় এলো। সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ে। মেয়ে ছুটে ছুটে হরিতকী কুড়োয় আর বাপ সেগুলো কাঁধের ঝুলির মধ্যে পোরে। বাপের বড়ো তৃষ্ণা পেল। সামনে বাঁশগাছের বড়ো একটা জঙ্গল। তার মধ্যে কুলুকুলু জলের শব্দ। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বসল, মেয়েকে বললে—যা তো মা, সামনে কোথাও জল পাস্ তো ঘটি করে একটু নিয়ে আয় !
পায়ে পায়ে বাঁশবনের মধ্যে মেয়ে এগোলো। ভিজে ভিজে মাটি, সোঁদা সোঁদা গন্ধ। পা টিপে কয়েক পা যেতেই আস্তে আস্তে জলকাদার মধ্যে তার পা ডুবে গেল। তার আর্তকণ্ঠের চিৎকার শুনে ছুটে এসে বাপ দেখল, তার চোখের সামনে মেয়ে মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।
কন্যাহারা শোকোন্মাদকে গভীর রাত্রে নর্মদা স্বপ্ন দিলেন—
ওরে মূর্খ শোন্, আমিই নর্মদা, এই পাহাড়ের মাথায় অরণ্যের গভীর বাঁশবনের

মধ্যে আমি লুকিয়ে ছিলাম। আমার এই উৎসতীর্থকে তুই প্রচার কর, তোব সর্ব দুঃখ দূর হবে।

স্বপ্নের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল শোকাহত বাপ—

আমার কন্যাটিকে গ্রাস করে আর কোন্ দুঃখ থেকে তুমি আমায় মুক্তি দিতে চাও মা ?

নর্মদা শুধোলেন—তোর কন্যার নাম কী ?

রেবা।

নর্মদা আবার বললেন—

আমার বরে অমর হবে তোর কন্যা! যতোদিন আমি থাকব, ততদিন তোর কন্যার নাম হবে সর্বদুঃখবারণের জপমন্ত্র। তোর কন্যার নামে হবে আমার নাম। আমার দ্বিতীয় নাম হবে রেবা।

সকালে নিদ্রাভঙ্গ হলো। লোকটা দেখল তার ঝুলির সবকটি হরিতকী সোনার হরিতকীতে পবিণত হয়েছে।

১০

অমরকণ্টকে যেদিন পৌঁছেছিলাম সেদিন যীশু খৃষ্টের জন্মদিন—১৯২২ খৃষ্টাব্দের বড়োদিন। আজ ১৯২৩ সালের প্রথম দিন—ইংরেজী শুভ নববর্ষের প্রথম প্রভাত। সপ্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত করেছি অমরকণ্টক মহাতীর্থে, নর্মদাশংকরের আশ্রয়ে। আজ বিদায় নেব। এই সাতটি দিনে অমরকণ্টকে অনেক প্রীতি ও অনেক সৌভ্রাত্রের আস্বাদ লাভ করেছি। আজ যেতে হবে, বলতে হবে—চলি ভাই?

একলা যাব না। ভাগ্য ভালো, মনের মতো সহযাত্রী পেয়েছি। মুখে অল্প অল্প রুক্ষ দাড়ি, মাথার কোঁকড়া চুলে জট ধরা—খালি পা ফাটাফাটা। পরনে খদ্দরের খাটো বহির্বাস আর ধোকড়ের অর্ধছিন্ন ফতুয়া, কাঁধে মোটা কম্বল। মোটা লাঠির আগায় ছোট একটা পোঁটলা। নাম তার সাধু কান্‌হাইয়ালাল।

পরশুদিন দুপুরবেলা বেড়াতে বেড়াতে গান্ধী-উদ্যানে গিয়েছিলাম। সরকারী প্রযত্নে অমরকণ্টকে মৌমাছির চাষ হচ্ছে। গান্ধী-উদ্যানের ধারে মৌমাছিদের চাক বাঁধবার খেলনা-বাড়ি। মৌ-চাষ বিভাগের কর্মী এক মারাঠী যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলাম রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। পিঠে মোলায়েম রোদ।

কোটিতীর্থের কিনার থেকে পাণ্ডাজী ডাকলেন। বললেন—একবার মন্দিরে চলে এসো বেটা।

মন্দিরে তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন কান্‌হাইয়ালালের সঙ্গে। বললেন—সেদিন তুমি নর্মদা-পরিক্রমার কথা বলছিলে বেটা? এই গ্যাখো, ইনি সম্প্রতি এই পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেছেন।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, সিন্ধু, নর্মদা ও কাবেরী—ভারতের পরমপবিত্রা সপ্তনদী। নর্মদা ছাড়া অন্য কোনো নদীর পরিক্রমা-প্রসিদ্ধি নেই। নর্মদাই একমাত্র নদী যার পরিক্রমা সর্বতীর্থসার। ভারতের অন্য কোনো নদনদীর পরিক্রমা মাহাত্ম্য নেই।

পাণ্ডাজী বলেছিলেন—

নর্মদা-পরিক্রমা মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। সর্বতীর্থ ভ্রমণেব সারাৎসার। কেন না এই তীর্থযাত্রায় সংসারীকে সন্ন্যাসী হতে হয়, যাত্রা করতে হয় সর্বরিপু ত্যাগ করে। কতো প্রাচীনকাল থেকে এই পরিক্রমা আরম্ভ হয়েছে কেউ বলতে পারে

না। আজও ভক্ত ও সাধুরা এই পরিক্রমা সাধন করছেন।

নর্মদা-পরিক্রমার কথা অমরকণ্টকে আসার আগেই শুনে এসেছিলাম। পাণ্ডাজীও বলেছিলেন—মোক্ষলাভের বহুত সা মার্গের কথা শাস্ত্রে আছে বেটা—শ্রেষ্ঠ ও ও সহজতম মার্গ এই নর্মদা মার্গ। এই পথে যে যায় সে সংকল্পরহিত হয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পরিহার করেই যায়।

উৎস থেকে সাগরসংগম পর্যন্ত নর্মদার উভয় তটের দৈর্ঘ্য ষোলোশো মাইলের কম নয়। নর্মদাতটের কোনো একস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ ও উত্তর তীরে সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ করে আবার যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরে আসাকে নর্মদা-পরিক্রমা বলে। পথে নর্মদাতটে যতো তীর্থ পড়ে সব তীর্থে রাত্রিবাস করতে ও পূজা দিতে হয়।

নর্মদা কে কংকর, ওয়েহি শিবশংকর। সত্যযুগে নর্মদাতীরে কোটি কোটি তীর্থ ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা কমলেও নর্মদার উভয় তটে অগুন্‌তি তীর্থ। সংখ্যার দিক থেকে তীর্থগৌরব নর্মদার মতো আর কোনো নদীর নেই। বর্তমানকালেও নর্মদার তীরে বিভিন্ন স্থলে ঋষি-আশ্রম বর্তমান। অনেক আশ্রম বহু প্রাচীন কালেরও বটে। এই সব আশ্রমে বহু সাধু-মহাত্মার দর্শন লাভ হয়।

দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, কলকাতার মতো বড়ো বড়ো শহর নর্মদার তীরে গড়ে ওঠে নি। তাই গঙ্গা যখন কলের বেড়ি পরেছেন ও নাগরিক সভ্যতার পুরীষবাহিনী হয়েছেন সেই কলিযুগের বিংশ শতাব্দীতেও মোক্ষদায়িনী নর্মদা তাঁর পবিত্র জলধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন উৎস থেকে সংগমে।

নর্মদাপরিক্রমা দু প্রকারের। দক্ষিণ তটের যে কোনো তীর্থস্থান থেকে সংগমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হয়। রেবা-সংগমে পৌঁছে নৌকাযোগে উত্তর তটে পৌঁছে যাত্রা করতে হয় পূর্বদিকে উৎসের অভিমুখে। অমরকণ্টকে পৌঁছে আবার দক্ষিণ তট ধরে পশ্চিমাভিমুখী গিয়ে যে তীর্থ থেকে যাত্রা প্রথম শুরু হয়েছিল সেখানে পৌঁছে পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। উত্তর তটের কোনো স্থান থেকে যদি পরিক্রমা আরম্ভ করা হয়, তাহলে যাত্রা করতে হয় পূর্বদিকে। অমরকণ্টক পৌঁছে সেখান থেকে দক্ষিণ তট ধরে সংগমের অভিমুখে যাত্রা। নৌকায় পার হয়ে আবার উত্তর তীর ধরে পূর্বমুখে যাত্রা করে যাত্রার সূচনাস্থানে পৌঁছে গিয়ে পরিক্রমার সমাপ্তি।

সংগমে নর্মদাকে দক্ষিণ তট থেকে উত্তর তটে অতিক্রম করতে হয়। এই সংগম-পারের স্থান বিমলেশ্বর তীর্থ নামে খ্যাত। অমরকণ্টক থেকে দক্ষিণ তট ধরে

রেবাসংগম যাত্রা, এবং সেখান থেকে উত্তর তট ধরে অমরকণ্টকে প্রত্যাবর্তন, নর্মদা পরিক্রমার এই সাধারণ রীতি। সম্পূর্ণ পরিক্রমা প্রায় আঠারোশো মাইল। পরিক্রমার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরো দুরূহ। এই পরিক্রমায় নর্মদা নদীকে সংগম-ক্ষেত্রেও পার হওয়া বারণ। পরিক্রমা শুরু অমরকণ্টক থেকে। পরিক্রমাকারী প্রথমে নর্মদার দক্ষিণ তট দিয়ে অমরকণ্টক থেকে সংগম পর্যন্ত আসেন ও আবার অমরকণ্টকে ফিরে যান। আবার উত্তর তট ধবে সংগমে আসেন ও সেই পথে পুনরায় অমরকণ্টকে ফিরে গিয়ে পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেন। যাত্রার দৈর্ঘ্য এতে দ্বিগুণ হয়। পুণ্যও দ্বিগুণ, কেননা এই পরিক্রমায় নর্মদাকে আর অতিক্রম করতে হয় না।

মোক্ষদায়িনী নর্মদার এপার ওপার করতে নেই। পরিক্রমাচারীরা তা করেন না—অবশ্য সাধারণ মানুষের কথা আলাদা। পরিক্রমাচারীরা নর্মদাকে অতিক্রম করেন একমাত্র সংগমসমীপবর্তী বিমলেশ্বর ক্ষেত্রে। বিমলেশ্বর মহাতীর্থ। পশ্চিমে আরব সাগর,উত্তরে নর্মদার সুবিশাল মোহনা। সাগর ও নদীজলের এখানে মিলন —জলের স্বাদ লবণাক্ত। এখানে নর্মদার মোহনা প্রায় তেরো মাইল বিস্তৃত। উত্তাল তরঙ্গমালা। বিমলেশ্বর থেকে বড়ো নৌকা বা জাহাজে এই তেবো মাইল মোহনা অতিক্রম করে ওপারে পৌছতে হয়। এই ওপারে রেবাসংগমতীর্থ বা হরিকী ধাম। অমরকণ্টক থেকে বিমলেশ্ববের দূরত্ব আটশো তেবো মাইল।

পুরাণ মতে নর্মদা-পরিক্রমার সূচনা করেছিলেন সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষি। প্রতি কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে সর্ব সৃষ্টি যখন লীন, তখন প্রতিবারেই সেই প্রলয়মধ্যে চিরঞ্জীব মার্কণ্ডেয় পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামা চন্দ্রনিভাননা একার্ণবে ভ্রমত্যেকা রুদ্রজা দেবী নর্মদার সাক্ষাৎ লাভ করেন। ত্রিজগতে নর্মদা-মাহাত্ম্যের প্রথম ঘোষক মার্কণ্ডেয়। বর্তমান কালে নর্মদা-পরিক্রমা করেছেন এমনি কোনো ভাগ্যবানের সাক্ষাৎলাভের আগ্রহ আমার হয়েছিল। পাণ্ডাজীর কাছেও সে অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম। পাণ্ডাজী আমাকে সঁপে দিলেন কান্‌হাইয়ালালের হাতে।

কান্‌হাইয়ালালের বাড়ি বিলাসপুর জেলার জয়জয়পুর গ্রামে। বারাদুয়ার রেল-স্টেশন থেকে নেমে যেতে হয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে সে অমরকণ্টকে এসেছিল। গ্রামের একদল তীর্থযাত্রীকে চরিয়ে নিয়ে। গাঁয়ের ছেলে, দরাজ খেতিবাড়ি। ঘরে বাপ-মা দাদা-বউদি ছোট ভাইবোন আছে। বয়স বাইশ-তেইশ —তার নিজের বিয়েরও সম্বন্ধ হচ্ছে।

অমরকণ্টকে এসে এক পরিক্রমাকারী দলের সঙ্গে ভিড়ে গেল কান্‌হাইয়ালাল।

নানা প্রদেশের পুণ্যকামী মানুষ—পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকও আছে। কান্‌হাইয়া-লালের কী মনে হলো—সেও এই দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পরিক্রমায়। কেন তার এ মতি হলো সে জানে না—তার কোনো দুঃখ, কোনো প্রার্থনা নেই, সংকল্পরহিত সে। খুলে ফেলল পায়ের নাগরা, কাঁধে নিল ঝুলি আর কম্বল।

প্রায় তিন বছর পরে আবার অমরকণ্টকে ফিরে এলো কান্‌হাইয়ালাল। মুখে দাড়ি, মাথায় জটা, অঙ্গে জীর্ণ কৌপীন, কম্বলটি শতচ্ছিন্ন। পরিক্রমা শুরু করতে হয় কড়াই করে, কড়াই করে শেষও করতে হয়। কড়াই মানে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মাদের ভোজন।

নিঃসম্বল কান্‌হাইয়ালাল। বললে—দেশ থেকে বাপ ভাই সংগতি নিয়ে এলে নর্মদামায়ীর পূজারতি ও যথাযোগ্য কড়াই করে ব্রত উদ্‌যাপন করবে।

দিনের পর দিন গেল, কেউ এলো না। কাউকে আসতে লিখেছিল কিনা তাও কেউ জানে না। কান্‌হাইয়ালালের চিন্তা নেই, দুঃখ নেই। সে পড়ে রইল মন্দির-দ্বারে। শেষ পর্যন্ত ধর্মশালার এক ভাঙা ঘরে পাণ্ডাজী তাকে আশ্রয় দিলেন।

কান্‌হাইয়ালাল সাধু কি না জানিনে জানি সে উদাসী। নর্মদা-পরিক্রমা দু-এক দিনের ব্রত নয়, পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে তিন বৎসর কেটে যায়। তাই যাঁরা পরিক্রমা করেন তাঁদের পরিক্রমাবাসী বলা হয়। আমি জানি কান্‌হাইয়ালাল আর ঘরে ফিরে যাবে না। নগ্নপদে নিঃস্ব হয়ে সাধুবেশে তিন বছর সে পথে পথে ঘুরেছে পাহাড়ে কান্তারে গ্রামে জনপদে—অজানা স্থানে অচেনা মানুষের সহ-যাত্রী হয়ে—সংকল্পরহিত হয়ে। বৈরাগ্য আর উদাসীনতা তার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে—সংসারে ফিরে বাজরার খেতিতে সে আর মন দিতে পারবে না কখনো। পরিক্রমা সাঙ্গ হয়েছে, কিন্তু কড়াই না করলেও তার চলবে। জয়জয়পুর গ্রামে কোনো এক প্রতীক্ষমান চাষী পরিবারে খবর না পৌছলেও চলবে যে তাদের ঘরের ছোট ছেলেটা তীর্থ সেরে অমরকণ্টকে ফিরে এসেছে।

ভোর থেকে দিক্‌দিগন্তর ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল। দু-হাত দূরে চোখের দৃষ্টি যায় না। আবছায়া অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নিচ্ছি-লাম। কুয়াশা একটু হাল্কা হতে রেস্ট হাউসের কোটর থেকে সাবধানে বার হয়ে এলাম।

নর্মদামন্দির। মন্দিরদ্বার খুলেছে। প্রথম যেদিন নর্মদা-মন্দিরে এসেছিলাম—সেদিন আমি ছাড়া আর কোনো দর্শনার্থী পূজার্থী ছিল না। আজ বিদায়ের

প্রত্যুষেও তেমনি। প্রণাম করলাম পরমপিতা নর্মদেশ্বরকে। তারপর শেষবারের মতো অপলক চক্ষুভরে দেখলাম শংকরসুতা সর্বপাপহারিণী শ্যামাঙ্গী নর্মদা মাতাকে। কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনাস্তব উচ্চারণ করলাম—

নমোঽস্তুতে সিদ্ধ গণৈর্নিষেবিতে
নমোঽস্তুতে সর্বপবিত্রমঙ্গলে।
নমোঽস্তুতে বিপ্রসহস্রসেবিতে
নমোঽস্তু রুদ্রাঙ্গসমুদ্ভবে বরে॥
নমোঽস্তুতে সর্বপতিতপাবনে
নমোঽস্তুতে দেবি বরপ্রদে শিবে।
নমোঽস্তুতে পুণ্য জলাশ্রয়ে শুভে
সরিদ্বরে পাপহরে বিচিত্রিতে॥

অযোধ্যার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় নিলাম সকলের কাছ থেকে। মাত্র সাত দিনের পরিচিত আমি। অথচ এই সাত দিনেই এরা আমার কতো বন্ধু হয়ে উঠেছে, বিদায়-মুহূর্তে সেটা বুঝলাম। পাণ্ডাজী, গুরুজী, অযোধ্যা, পোস্টমাস্টার, রতন, রতনের মা, দেওকী সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেরই মুখ ভার।

অমিত কেবল নেই। অমিত কোথায় গেল? ভোর থেকে অমিতের দেখা পাই নি একবারও। অযোধ্যা বললে সে ভোরবেলা এক কাপ চা খেয়েই কোথায় বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় অমিতের সঙ্গে দেখা হবে না? কান্‌হাইয়ালাল তার ঝুলি-কম্বল নিয়ে তৈরি। রেস্ট হাউসের চৌকিদার আমার ব্যাগদুটো নিয়ে এলেই যাত্রা শুরু করতে পারি।

হঠাৎ দেখি রেস্ট হাউসের ঢালু রাস্তা বেয়ে একটা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে অমিত নেমে আসছে। সাইকেলের কেরিয়ারে আমার দুটো বিশ ইঞ্চি ব্যাগ। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম—

অমিত, কী ব্যাপার?

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—

একটা সাইকেল যোগাড় করতে বড়ো দেরি হয়ে গেল দাদা। শেষকালে হাসপাতাল থেকে এটা পেলাম। চলুন, আমি রেডি!

বললাম—এর মানে?

বাঃ, শেষ পর্যন্ত নিজের মাল তো নিজের কাঁধেই বইতে হবে! চলুন, অন্তত কপিলধারা পর্যন্ত ব্যাগদুটো সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাই? ফিরবার সময় সাইকেলে নিজে চেপে ফিরে আসব।

সাইকেলের কেরিয়ার থেকে তাড়াতাড়ি ব্যাগত্নটো নামিয়ে নিয়ে অযোধ্যার বেঞ্চিতে রাখলাম। মনে মনে বললাম—

বড়ো শিক্ষা তুমি আমায় দিলে অমিত। তুমি আমার পথের গুরু—তোমাকে নমস্কার!

ত্নটো ব্যাগের সমস্ত মাল ঢেলে ফেললাম বেঞ্চিতে। আলাদা করে রাখলাম একটা নতুন পশমী গেঞ্জি, মাফলার, ছোট একটা মশারি। আর সরিয়ে রাখলাম জোড়া কম্বলের একটা। বাকি জিনিস একটা ব্যাগের মধ্যেই আঁটল।

গুরুজীর দিকে এগিয়ে গেলাম তারপর। বললাম—

গুরুজী, আর কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। পথিকের একটি সামান্য উপহার আপনাকে দিতে পারি?

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে পশমী পোশাকটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। পোস্ট-মাস্টারকে আপত্তির অবকাশ না দিয়ে গরম মাফলারটা ঝুলিয়ে দিলাম তাঁর গলায়। পাণ্ডাজীকে দিলাম মশারি। ব্যাগটা দিলাম অযোধ্যার হাতে। কারো আপত্তি শুনলাম না। হাত জোড় করে বললাম—কৃপা করুন আপনারা, মুসা-ফিরকে চলার পথে হাল্কা হতে দিন, তাকত দিন, আশীর্বাদ করুন।

সর্ব শেষে দেওকীর সামনে এসে শান্ত হাসি হেসে বললাম—

দেওকী, শেরসে জান বাঁচানেওয়ালী বহিন, এই কম্বলটা নিয়ে তুমি আমাকে কৃতার্থ করো।

দেওকীর মুখে আর কৌতুক-হাসি নেই। চোখের কোণে জল।

কান্‌হাইয়ালাল তখন মৃদু হাসছিল। সে বললে—বহুত কিয়া, বহুত আচ্ছা কিয়া দাদা!

অমিত কান্‌হাইয়ালালকে ঠেস দিয়ে বললে—জরুর, ঠিক তো কিয়া, আভী বাউরাকে সাথ্ মিল কর দাদাভী বিলকুল বাউরা হো যায়েগা!

সত্যিই বাউরা লোক কান্‌হাইয়ালাল। বাউরা বলেই তো তাকে সঙ্গী পেয়েছি। বাউরার ঘর নেই। পথই তার ঘর। যৌবনের শ্রেষ্ঠ কটি বছর পথে পথে সে কাটিয়েছে—পথের প্রেমে হয়েছে আত্মহারা। আমি তাকে শুধিয়েছিলাম—

কান্‌হাইয়ালাল, তুমি ঘরে যাবে না?

না দাদা!

কী করবে তাহলে?

শীত কাটলে এখান থেকে বার হব।

যাবে কোথায় ?

যাব গোদাবরী-পরিক্রমায়। গোদাবরীর উৎসমুখে।

বলো কী ? সে যে নাসিক।

হাঁ দাদা, নাসিক শহরেরও পশ্চিম। ব্রহ্মগিরি পর্বতে। জোতির্লিঙ্গ ত্র্যম্বকেশ্বরকে দর্শন করে আসব।

তিনজনে চলেছি পশ্চিমদিকে। পূর্ব-পশ্চিমগামী অমরকণ্টকের প্রধান রাস্তা ধরে। ডাইনে বাঁয়ের পাকা সরকারী বাড়িগুলি ক্রমে ফুরিয়ে এলো। দু-পাশ থেকে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল অরণ্য। প্রধান রাস্তা বেঁকল বাঁদিকে—কবীর চবুতরার দিকে। আমরা অরণ্যঘেরা সরু পথে চললাম কপিলধারার উদ্দেশ্যে।

কুয়াশা কেটে গেছে। কনকনে শীতের হাওয়া। আমি আর কান্‌হাইয়ালাল জোর কদমে হাঁটছি। অমিত এবড়ো খেবড়ো পাথুরে রাস্তায় খুব সাবধানে সাইকেল চালাচ্ছে। আমার ব্যাগটি তার সাইকেলের পিছনে বাঁধা।

অমরকণ্টক মন্দির অঞ্চল থেকে কপিলধারা মাইল সাতেক তো হবেই। গায়ত্রী-সাবিত্রী সংগমের পর গান্ধী-উদ্যান থেকে নর্মদা বহির্গত হয়ে সামনের অরণ্য-প্রান্তরের মধ্যে অন্তর্হিতা হয়েছেন। সে অদৃশ্য নর্মদাকে বাঁদিকে রেখে আমরা উত্তর পশ্চিম দিকে চলেছি।

কপিলধারাতে নর্মদা পুনরাবির্ভূতা। কপিলধারার কিছু পূর্বে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে প্রান্তর মধ্যে আরো দুটি পবিত্র জলধারা নর্মদাস্রোতে বিলীন হয়েছে। একটি ধারার নাম এরণ্ডী। অপর ধারাটির নাম কপিলা বা বিশল্যা। এরণ্ড ও কপিল এই দুই মহামুনির নামে এই ধারাদুটির নাম। কপিলাধারায় স্নান করলে মানব পাপশল্য থেকে বিমুক্ত হয়, তাই তার অপর নাম বিশল্যা।

আকাশে সূর্যালোক প্রখর হলো। আমরা গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করলাম। নির্জন নিঃসীম ঘন অরণ্য। মাঝখান দিয়ে শীর্ণ পথরেখা। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও খাড়াই, কোথাও উতরাই। মাঝে মাঝে অরণ্যপার্শ্ব থেকে বেয়ে আসা জলধারা। দুধারে বিশাল বিশাল গাছ—গাছের কাণ্ডশাখার সঙ্গে রাক্ষুসে পাতা-ওয়ালা লতার জটলা।

পথে দু একটি লোকের দেখা মিলছিল। কেউ লাঠি হাতে, কেউ পুঁটুলি কাঁধে। অরণ্যপ্রান্তের অদৃশ্য গ্রাম থেকে পাশ দিয়ে চলে গেল একদল স্থানীয় স্ত্রীলোক—মাথায় তাদের দুধের হাঁড়ি। বড়ো রাস্তা এড়িয়ে অরণ্যপথ ধরে কিছুটা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে লোকালয়ের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—এখন শুধু বন আর বন। সেই বনের মাঝখান দিয়ে তিনজন যাত্রী আমরা।

কান্‌হাইয়ালাল বললে—

নর্মদা-পরিক্রমাবাসীর পথে তিনটি মহাপরীক্ষা দাদা। প্রথম পরীক্ষা মুণ্ড-মহারণ্য, দ্বিতীয় পরীক্ষা ওংকারেশ্বরের নিকটবর্তী ওংকারঝাড়ি আর তৃতীয় রাজঘাট থেকে শূলপাণি পর্যন্ত শূলপাণি ঝাড়ি। এই তিনটি অঞ্চল নিরাপদে পার হওয়া বড়ো ভাগ্যের কথা। তিন স্থানেই গভীর অরণ্য, কঠিন পার্বত্যভূমি আর দুর্দান্ত শ্বাপদ ও আদিবাসীদের বসতি। প্রথম পরীক্ষার স্থান শুরু। এখান থেকে প্রায় মান্দলা পর্যন্ত গভীর অরণ্য—মুণ্ড মহারণ্য যার নাম।

অরণ্যের রাজ্য মধ্য প্রদেশ। অরণ্য মধ্য প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই রাজ্যের অরণ্য-এলাকা অন্য যে কোনো রাজ্যের চেয়ে বড়ো। রাজ্যের সমগ্র আয়তনের পাঁচ ভাগের দু-ভাগ শুধু অরণ্য। মধ্য প্রদেশের অরণ্যের প্রধান গাছ সেগুন, শাল, শাজা, সালাই, অঞ্জন, পলাশ, তেণ্ডু ও খয়ের। হরিতকী ও আমলকী গাছও প্রচুর। খয়ের ও আবলুস গাছও মধ্য প্রদেশের অরণ্যে যথেষ্ট জন্মায়।

কান্‌হাইয়ালাল বললে—

মুণ্ড মহারণ্য এতো গভীর ছিল দাদা যে তার মধ্যে পাখি পর্যন্ত ডানা মেলবার জায়গা পেত না।

সেই মহারণ্য এখনো আছে। তবে সেই মহারণ্যের মাঝখান দিয়ে পার্বত্যভূমির বন্ধুরতাকে জয় করে চওড়া রাস্তা হয়েছে। সেই রাস্তা শিখর-উৎস থেকে নর্মদা-উপত্যকা পর্যন্ত যাতায়াতের সংযোগ সাধন করেছে। অমরকণ্টক থেকে ডিণ্ডোরি, ডিণ্ডোরি থেকে মান্দলা পর্যন্ত বিশাল সড়ক—যে সড়কে বাস চলছে, লরি চলছে, কাঠের গুঁড়ি নামছে। পদযাত্রী পরিক্রমাবাসীও সেই পথেই অধুনা চলে—মুণ্ড মহারণ্যের ভয়াবহ পরীক্ষার দুঃখ লাঘব হয়েছে।

আমরা অবশ্য সেই রাজবর্ত্মকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি কপিলধারার পথে। চলেছি দুধারের দুই সার গাছের মোটা গুঁড়ির মাঝখানের ফাঁকে সংকীর্ণ পাকদণ্ডী দিয়ে সন্তর্পণে। দুধারের বনের মধ্যে কতো বন্য জন্তুর বাস—শের আছে, চিতা আছে, ভালুক আছে, শম্বর হরিণ আছে। কিন্তু অরণ্যশীর্ষের মাথায় আছে মধ্যাহ্ন-সূর্য, দুপাশে আছে দুই সঙ্গী। ভয় নেই।

কান্‌হাইয়ালাল আমাদের গাছ চিনিয়ে দিতে দিতে আগে এগোচ্ছে। মাঝখানে সাবধানে পা ফেলছি আমি। আমার পিছনে আরো সন্তর্পণে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে আসছে অমিত।

প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। বনের প্রধান গাছ দুই

জাতীয়—সালাই আর শাজা। উভয় গাছের কাণ্ডের পরিধি ও উচ্চতা প্রায় সমান—কিন্তু রং আলাদা। সালাই এর রং ধূসর, শাজার রং কালো। এক জাতীয় দুটি গাছ কদাচিৎ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটি সালাই, একটি শাজা—পরেরটি সালাই, পরবর্তীটি শাজা। ধূসরের পরে কালো, কালোর পরে ধূসর। এই আশ্চর্য নিয়মানুবৃত্তি থেকে বিচ্যুতি নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য ছেদ—সেখানে ধাওয়া, বীজের বা সেমর গাছের ছোট জটলা। কয়েকটি শালের দেখা কোথাও কোথাও—কিন্তু এ অরণ্যে কোনো সেগুন নেই। হরিতকীও অল্প।

এতোক্ষণে কপিলধারার কাছে এসে পৌঁছেছি। দূর থেকে প্রপাতধ্বনি কানে এসে বাজছে। সারা বনপথে একটি লোকের দেখাও মেলে নি। এতোটা হেঁটে ক্লান্ত হয়েছিও কম নয়—গরম কোটটা গা থেকে খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছি।

কান্‌হাইয়ালাল আশ্বাস দিয়ে বললে—

আর দু-কদম দাদা! কপিলধারার কাছে আশ্রম আছে। সেই আশ্রমে গিয়ে এবার জিরিয়ে নেওয়া যাবে।

ঢালু ভাঙতে ভাঙতে অমিত বললে—

না দাদা, কপিলধারা দেখে এসে একেবারে আশ্রমে বসব।

অমিতের পরিশ্রম হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সমানে সে সাইকেল ঠেলেছে, কেরিয়ারে আমার ব্যাগটা বেঁধে। তার উৎসাহে উৎসাহ পেলাম।

কপিলধারা। নর্মদার প্রথম প্রপাত। মহা পুণ্যময় স্থানে, মহামুনি কপিলের তপঃ-ক্ষেত্র। এই স্থানে কপিল শংকর-নর্মদার পূজা করেছিলেন। কপিলের পদচিহ্ন এখানে আছে আর আছে কপিল প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ।

নর্মদা এখানে প্রায় দশ-বারো হাত চওড়া। দুধারের বনরাজির মাঝখান দিয়ে পিচ্ছিল পাথরের পথে পথে নর্মদা প্রবাহিত হয়ে এসে এইখানে প্রপাতের রূপ নিয়েছে। বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ফাঁক দিয়ে বিভিন্ন স্রোতে অগ্রসর হয়ে দুটি বিরাট ধারায় নর্মদা ঝরে পড়ছে প্রায় ষাট ফুট নিচে। খুব সাবধানে ধারার কাছা-কাছি যেতে হয়। পাশের শীর্ণ বনপথ দিয়ে পাহাড়ের নিচে নামা যায়, যেখানে ছায়া ঢাকা গহ্বরসদৃশ খাদের মধ্যে ভীমবেগে ঝরে পড়ছে নর্মদার প্রপাত।

কপিলাশ্রমের কাছে সাইকেল ঝোলা জুতো সব কিছু রেখে প্রপাতশীর্ষের দিকে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোলাম। অতি পিছল পাথরের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চলেছি—পা পিছলোলেই সর্বনাশ। স্রোতোধারার মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নেই। কান্‌হাইয়ালাল সবার আগে—সে সাবধান করতে করতে চলেছে।

প্রপাতশীর্ষের যতোটা সম্ভব কাছাকাছি এসে একটা চওড়া প্রস্তরখণ্ড নির্বাচন করে কান্‌হাইয়ালাল হাঁটু মুড়ে বসল। আমরাও বসলাম তার দুপাশে নিচু হয়ে সাবধানে ধারা থেকে অঞ্জলি ভরে জল তুলে মাথায় দিলাম।

কান্‌হাইয়ালাল বললে—দাদা, কপিলমুনির নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কী জানেন তো?

আমি বললাম—জানি বই কি! গঙ্গাসাগর। গঙ্গামায়ী যেখানে সাগরে গিয়ে বিলীন হয়েছেন। সে তো আমাদেরই বাংলাদেশে!

এতোক্ষণ হাঁটার পর প্রপাতধারার পাশে বসে খুব ভালো লাগছিল। একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। অমিত বললে- গঙ্গাসাগরের কাহিনী একটু বলুন দাদা।

আমি বললাম—

গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন ভগীরথ। কিন্তু ভাগীরথীর মর্তাবতরণের পরোক্ষ কারণ কপিল। তাই সাগরে গঙ্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে কপিল মুনিরও পূজা। তিনি না থাকলে গঙ্গা পৃথ্বীবিহারিণী হতেন না—

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি কর্দমের পুত্র কপিল। কঠিন তপস্যার জন্যে সাগবনিম্নে পাতালে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সূর্যবংশীয় সম্রাট সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র হরণ করেন। ইন্দ্র ভয় পেয়েছিলেন সগরশক্তির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি পেরে উঠবেন না—তাই তিনি সেই অশ্বকে সংগোপনে পাতালে নিয়ে কপিলমুনির আশ্রমের পাশে বেঁধে রাখলেন।

সগরের ষাট হাজার পুত্র যজ্ঞাশ্বের সন্ধানে ত্রিভুবন অন্বেষণ করে পাতালে নেমে কপিলাশ্রমে তার সন্ধান পেল। তারা ভাবল, এই তপস্বীই তাদের ঘোড়াকে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন। ধ্যানমগ্ন কপিলকে তারা আক্রমণ কবল। তপস্যা ভঙ্গ হলো কপিলের। তিনি চক্ষু উন্মীলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃষ্টির বহ্নিতেজে সগরের ষাট হাজার ভাগ্যহত সন্তান পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অমিত বললে—তারপর?

তারপর সগরের একমাত্র পৌত্র অংশুমান গেলেন কপিলসকাশে। কপিল ইন্দ্রের ছলনা বুঝলেন। তিনি শোকার্ত সগর বংশধরকে আশীর্বাদ করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—অমর্তের অমৃতময়ী গঙ্গা যদি মর্তে নামেন তবেই তাঁর সর্বপাপহারিণী সলিলস্পর্শে সগরবংশ পুনরুজ্জীবিত হবে। সেই গঙ্গাকে শেষ পর্যন্ত মর্তে আনয়ন করেন অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ।

অমিত শুধোল—পাতালে যেখানে কপিল তপস্যা করেছিলেন সে জায়গাটা তাহলে ছিল গঙ্গার সমুদ্রসংগমের তলায়!

আমি উত্তর দিলাম—ঠিক, সেই জন্যেই তো গঙ্গাসাগর শ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় তীর্থ।

তাহলে এখানে কপিল এলেন কোথা থেকে ?

আমি বললাম—ভায়া, প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা ভূভারতের কোথায় যে যান নি আর কোথায় বসে যে তপস্যা করেন নি, তা কেউ বলতে পারে ? মহাঋষি অত্রির কথা দ্যাখো। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র—কর্দমকন্যা অনসূয়া এঁর স্ত্রী। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্যে যাবার আগে রাম-সীতা এই অত্রি-অনসূয়ার আশ্রমে কিছুদিন কাল কাটান। আবার একথাও পুরাণে বলে যে, অত্রির আশ্রম ছিল সুদূর দক্ষিণে কন্যাকুমারীর কাছে সুচিন্দ্রমে।

কান্‌হাইয়ালাল ধারাপ্রপাতের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে ছিল এতোক্ষণ। এবার বললে—

দাদা, আমি ভাবছিলাম—কপিলের তপস্যাকালে গঙ্গা ছিলেন স্বর্গে আর নর্মদা ছিলেন মর্তে, তাই তো ? তাহলে গঙ্গার তরণের আগেই নর্মদামায়ী মূর্তিমতী হয়েছিলেন—তাই না ?

মস্ত এক ধাঁধা বাতলিয়েছে কান্‌হাইয়ালাল। কপিলের নাম উপনিষদে আছে, রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে। পরবর্তী পুরাণে তো আছেই। কপিল কতো যুগ ধরে তপস্যা করেছিলেন তা কি আমি জানি ? এই সব সত্যদ্রষ্টা ঋষির যে অনন্ত পরমায়ু !

নর্মদাভক্ত কান্‌হাইয়ালালের এ ধাঁধার উত্তর আমি কেমন করে দেব ?

১১

না, আমি যাব না, এক-পা এগোব না আর। অনেক হেঁটেছি এই ছায়া-ছাযা অন্ধকারে পিচ্ছিল পাকদণ্ডীর ভয়াল বাঁকে বাঁকে। অনেক ঠোক্কর খেয়েছি পায়ে, অনেক আঘাত লেগেছে হাঁটুতে। শিকড় জড়িয়ে ধরে একটা শক্ত পাথর পেয়ে তার উপর উঠে বসে হাঁপাচ্ছি এখন। অনেক হয়েছে—ফিরতে না পারি, ফিরব না—শুধু চুপ করে বসে থাকব এখন।

জানি সামনে ঐ ঢালু বাঁকটির পারেই সর্পিল বীতংসের আকর্ষণ! সেই আকর্ষণে ধরা দেব না। কানে আসছে কল্লোলধ্বনি—সেই ধ্বনিতে গহন গহ্বরের ভয়াল আহ্বান—সেই আহ্বানে সাড়া দেব না। শরীরের কাঁপুনিটা কমুক—নিশ্বাসের হাঁপানিটা একটু সরল হোক—ততোক্ষণ একলা বসে থাকি চুপ করে। ওরা যেতে চায় যাক—আমার আর শক্তি নেই। সাহস নেই।

কপিলধারার প্রপাতশীর্ষকে একপাশে রেখে বনপথে অগ্রসর হয়েছিলাম। সংকীর্ণ ও ঢালু বনপথ বঙ্কিম রেখায় অরণ্য পর্বতের ফাঁক দিয়ে দিয়ে নিচে নেমে চলেছে। পৌঁছেছে কপিলধারা যেখানে ঝরে পড়ছে সেখানে। প্রথমটা এই পথ ভয়াবহ মনে হয় নি। পাকদণ্ডীর সুস্পষ্ট বেখা। দুধারের বন্যগুল্মে হলুদ-নীল ফুলেব ছড়াছড়ি। তাদের মিষ্টকটু গন্ধে আমোদিত বাতাস।

সবার আগে ঢালু বেয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলেছে অমিত—গুনগুন কবে গান করছে সে। তার পিছনে আমি দুধার দেখতে দেখতে এগোচ্ছি—মাঝে মাঝে মাথা তুলে প্রসন্ন দৃষ্টিতে স্বচ্ছ নীল আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। আমার পিছনে কানহাইয়ালাল। সে ঝোপঝাড় দেখে দেখে ওষধি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অমরকণ্টক মালভূমিতে নানা প্রকাব ওষধি গুল্ম ও লতা পাওয়া যায়। এ সব থেকে নানাপ্রকার রোগের প্রতিষেধক জড়িবুটি তৈরি হয়। তিন বছর পথে ঘুরে ঘুরে অনেক রকমের অভিজ্ঞতা কানহাইয়ালালের হয়েছে—বন্য ঔষধির সঙ্গে পরিচয় তার অন্যতম।

বেশ কিছুটা নামবার পর পিছন থেকে কান্‌হাইয়ালাল হাঁক দিল—দাঁড়ান দাদা, সামনের আশ্রম দেখে যান!

অগ্রগামী অমিত আগেই দাঁড়িয়েছে। গাছের গুঁড়িতে কাঠের ফলকে অযত্নলিখিত

নামটি পড়ছে—কৈলাস আশ্রম।

কৈলাস আশ্রমের রমণীয়তার তুলনা নেই। অরণ্যকাণ্ডে ও অন্যান্য প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে ঋষি-তপোবনের সকল বর্ণনা এখানে মূর্ত হয়েছে। অরণ্যপথ এখানে একটু চওড়া হয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে তপোবন—সীমানাহীন কান্তারমরুর মধ্যে শ্যামল আশ্রম-উদ্যান। নিবিড় আরণ্য প্রকৃতির মধ্যে মানব-সংস্কৃতির প্রবেশ এখানে হয়েছে—তা তপোবনের গাছপালা দেখলে বোঝা যায়। মানুষ এখানে বৃক্ষ রোপণ করেছে, তরুলতা সাজিয়েছে, ফুল ও ফলের উদ্যান রচনা করেছে। আম, জাম, বেলগাছ আছে। আরো বিস্ময়কর—কলাগাছ আছে। বেড়ার গায়ে পুষ্পলতা, আশ্রমের উদ্যানে গোলাপ টগর বৈজয়ন্তা চাপা প্রভৃতি নানা ফুলের গাছ।

আশ্চর্য শান্ত পরিবেশ, লতা-ছাওয়া দুটি বন্ধ কুটীর, পরিচ্ছন্ন আঙিনা। অল্প একটু ঠেলা দিতেই কুটীরের দরজা খুলে গেল। কুটীরের মেঝেটি কে যেন একটু আগেই ঝাঁট দিয়ে গেছে—এতো পরিষ্কার। কিন্তু কুটীরের ভিতরে কেউ নেই। এক কোণে সাজানো রয়েছে কয়েকটি মাটির পাত্র আর কিছুটা জ্বালানি কাঠ।

এতো নির্জন, এতো নিস্তব্ধ যে চেঁচিয়ে কথা বললে নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই এসে বাজে।

স্তব্ধ বিস্ময় ভেঙে অমিত বললে—এ কী? কেউ এখানে থাকে না?

থাকে বই কি, বললে কান্‌হাইয়ালাল সাধু—এতো সাধুদেরই আশ্রম।

তবে কেউ নেই কেন?

সাধু হেসে বললে—

পেট ছাড়া মানুষ নেই। সাধুও মানুষ ভাই, সাধুদেরও আত্মসেবা আছে। এই কঠিন শীতে কোনো যাত্রী আসে না, তখন নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে সাধুরা লোকালয়ে যান। ভিক্ষার সন্ধানে। নির্জন আশ্রমে যে সব মহাত্মারা থাকেন, তাঁরা শীতের আগেই খাদ্য সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চিত খাদ্য যখন অপ্রতুল হয়, তখন তাঁদেরও লোকালয়ে যেতে হয়। শীতের শেষ ভাগেই সাধারণত তাঁরা আশ্রম ত্যাগ করেন। এখানকার সাধুও নিশ্চয়ই তাই করেছেন—আবার অবস্থা বুঝে ফিরে আসবেন।

আমি বললাম—কিন্তু কুটীরের দ্বার তো খোলা রয়েছে দেখছি!

খোলাই তো থাকবে! সাধুর শ্রেষ্ঠ দেবতা অতিথি! কবে কখন ঐ দেবতার পদার্পণ হয়—তাই শূন্য আশ্রমের দ্বারও কখনো রুদ্ধ রাখা উচিত নয়।

ঘরের কোণের মাটির পাত্র ও জ্বালানি কাঠের গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে আমি কেবল

বললাম—ঠিকই বলেছ।

কান্‌হাইয়ালাল আবার বললে—আজ সারা দিনরাত যদি এই বনে আমাদের কাটাতে হয়, তাহলে কোথায় আশ্রয় পাব বলুন? এই মুক্তদ্বার আশ্রমটি ছাড়া!

অমিত মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। হঠাৎ যেন সে চমকে উঠল সাধুর এই কথায়। তাড়া দিয়ে বললে—

এবার চলুন চলুন, আর দেরি নয়!

ঠিকই বললে। উপযুক্ত সাবধানবাণী।

প্রায় ষাট ফুট নিচু গভীর গহ্বর। তিন দিকে পাহাড়ের বিশাল প্রাচীর। গহ্বরের মধ্যে বিরাট বিরাট বিচিত্রকায় পাথরের চাঙড়। পূর্ব পর্বতগাত্রের ওপারে সূর্য—গহ্বরের মধ্যেটা সারা দিনমান ছায়া থাকে, যতোক্ষণ না সূর্য একেবারে পশ্চিম আকাশে হেলে।

ষাট ফুট উপর থেকে মহাভীম যুগল ধারায় নর্মদাপ্রপাত গহ্বরের মধ্যে ভেঙে পড়ছে—কী প্রচণ্ড গর্জন, কী ভয়ংকর হুঙ্কার! বুদ্‌বুদ জলকণা আর তরঙ্গ একসঙ্গে মিলে বিদ্যুৎ-শাসিত উজ্জীবন্ত এক মহাঘন মেঘাবরণের সৃষ্টি করেছে দৃষ্টির সম্মুখে! তারপর শিলাস্তূপ বিদীর্ণ করে পাথরের চাঙড়ে চাঙড়ে প্রচণ্ড কল্লোল তুলে পশ্চিম দিকে ধেয়ে চলেছে ভীষণা নর্মদা! সেই তরঙ্গের মুখে ইন্দ্রের ঐরাবত যদি পড়ে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে মুহূর্তে!

এই কপিলধারা। আটশো মাইলব্যাপী নর্মদার প্রথম জলপ্রপাত। স্রোতোময়ী রেবার নবীনা ভয়ংকরী মূর্তি। কৈলাস আশ্রম থেকে সুঁড়িপথে অনেক কষ্টে অনেক সাবধানে এখানে এসে পৌঁছেছি। পাথরের চাঙড়ের মাথায় মাথায় এগিয়ে প্রপাতের যতোটা সম্ভব কাছে গেছি—নির্নিমেষ নেত্রে দেখছি দুটি ধারাকে।

কানহাইয়ালাল বললে—

দাদা, এখন শীতকাল, প্রপাত তো এখন শান্ত। বর্ষার শেষে আকাশপাতাল এর গর্জনে থরথর করে কাঁপতে থাকে। নিচে নামতে লোকে সাহস করে না।

আমারও মনে সাহসের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। সাহস অমিতের। সে যেমনি জওয়ান, তেমনি ভয়ডরহীন। কান্‌হাইয়ালালের পাশে পাশে এক পাথরের মাথা থেকে অন্য পাথরের মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে সে এগোল। প্রপাতধারার প্রায় তলায় গিয়ে দাঁড়াল। তাদের কাণ্ড দেখে আমার মুখ শুকিয়ে উঠল—আমি চিৎকার করে সাবধান করতে লাগলাম দূর থেকে।

সেই সুঁড়িপথে আবার কৈলাস আশ্রমের কাছে উঠে এসে আবার এক নতুন পথ-রেখা ধরে আমরা নেমে চললাম। এবার আরো ঢালু, আরো দুর্গম, পদে পদে আরো বিপজ্জনক। একেবারে সুড়ঙ্গের মধ্যে যেন চলেছি। কখনো উবু হয়ে বসছি, দু-তিন হাত নিচুতে পা নামিয়ে এক পাথরের কিনারে নেমে অন্য পাথরের কিনার আশ্রয় করছি। কোথাও গড়িয়ে গড়িয়ে নামছি শীতল মসৃণ ঢালু চাতাল বেয়ে। একবার হড়কালে দেহের হাড়গোড় ভেঙে উল্টে পাল্টে কোন্ অতলে খসে পড়ব।

কান্হাইয়ালালের দেখছি যথেষ্ট অভ্যাস আছে। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে ভেবে নিতে হয়, ডান পায়ের পর বাঁ-পাটা কোথায় ফেলব, আর বাঁ-পায়ের পরে ডান-পা। ভেবে নিতে হয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে। দেরি করা মানেই আতঙ্ক-গ্রস্ততাকে বাড়িয়ে তোলা। কান্হাইয়ালালের সে ক্ষমতা আছে।

অমিতের অভ্যাস না থাকলেও দেহের শক্তি আর মনের সাহস তাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পা তার বারে বারে হড়কাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে পরবর্তী পদক্ষেপে তার বিলম্ব নেই। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিচ্ছে নিজেকে। ওরা আমার থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। দূর থেকে অমিত গলা বাড়িয়ে হেসে বললে—

এপথে মানুষ নামে না দাদা, জন্তু জানোয়ারও নামে না—এ পথ ভগবান কার জন্যে তৈরি করেছেন জানেন?

আমি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললাম—কার জন্যে?

অমিত বললে—

টিকটিকির জন্যে।

যতো নিচে নামছি ততো স্যাঁতসেতে হয়ে আসছে আবহাওয়া। স্যাঁতসেতে মাটি পিছল পাথর, গুঁড়িগুলো ভিজে, লতাপাতা থেকে যেন জল ঝরছে। বাতাস পর্যন্ত যেন আর্দ্রতায় স্নান করা। পা ফেলে ফেলে হেঁটে নামার সাহস আর নেই। তাই বসে বসে নামছি—পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে। অসহ্য একটা ভয়ে গুরগুর করছে বুক, কিন্তু একেবারে থামতে পারছিনে। অনেক নিচে সহযাত্রীদের মাথাদুটো এখনো আবছা দেখা যাচ্ছে যে!

সব আতঙ্কের অবসান হলো বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে। হঠাৎ কখন একটা পিছল পাথরের কোনায় ডান পা রেখে নামতে গিয়ে হড়কে গেলাম। প্রায় কোমর সমান নিচুতে পদক্ষেপণ করতে গিয়েছিলাম, পারলাম না—সামলাতেও পারলাম না। কতোটা গড়ালাম জানিনে, একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেলাম, প্রাণপণে সেটাকে জড়িয়ে ধরে। নিচে গভীর খাদ, একেবারে তলিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবার

মতো। তলিয়ে অবশ্য যাই নি, গাছের ভিজে গুঁড়ি জড়িয়ে ঝুলছি—আর আমার বিবর্ণ নীরব মুখে হাত বুলোচ্ছে লাজবন্তীর কচি পাতার দল।
কোনো রকমে উঠে বসলাম। যাক ওরা, আর যাব না আমি। এইখানে চুপ করে বসে বসে শান্তিতে হাঁপাব।

ছাড়বার পাত্র নয় কান্‌হাইয়ালাল আর অমিত। তারা আমার পায়ের শব্দ না পেয়ে উঠে এসেছে আমার পাশে। দুধারে দাঁড়িয়ে টেনে তুলেছে আমাকে। পর অতি সাধধানে আমাকে নামিয়ে নিয়ে গেছে নর্মদার দ্বিতীয় প্রপাতধারাব কাছে। প্রপাতের ধারে বাষ্পার্দ্র ঘাসের উপর বসিয়ে দিয়েছে।
জলধারার শুভ্রতার জন্য নর্মদার এই দ্বিতীয় প্রপাতের নাম দুগ্ধধারা। কপিলধারার মতো উচ্চতা দুগ্ধধারার নেই, কিন্তু কপিলধারা থেকে এই ধারার প্রস্থ অনেক বেশী। স্রোতের তীব্রতাও কম, তবে তরঙ্গ-আকুলতার দৃশ্য আরো মনোহর। চারিদিক পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা। প্রপাতের নিচে নদীর বুকে প্রস্তরখণ্ডও কম। নর্মদা এখানে বিস্তৃততর নদীরূপ ধারণ করে পশ্চিমের অরণ্যের মধ্যে বিলীন হয়েছে।
দুগ্ধধারার ঠিক নিচেই বড়ো একটি প্রস্তবের খণ্ড। বাঁদিক থেকে পাহাড় প্রপাতের মধ্যে ঝুঁকে পড়েছে তারই অংশ। তার মধ্যে জলের কাছ ঘেঁষে একটি গুহা। তরঙ্গ অতিক্রম করে সেই গুহামুখে পৌছনো অতি বিপজ্জনক। দূর থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ল সেই গুহার মধ্যে সিঁদুরমাখানো একটি ত্রিশূল, ত্রিশূলের সামনে একটি আসন।
অমিত বললে—কী কাণ্ড, ঐ গুহার মধ্যেও লোক থাকে নাকি?
জলধারার দক্ষিণ তীরে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সাবধানে নিচু হয়ে এক অঞ্জলি জল নিয়ে নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিল কান্‌হাইয়ালাল। তারপর দু হাত জোড় করে দূব থেকে প্রণাম করল ঐ গুহাশ্রয়ী ত্রিশূলকে। বললে—
অমিতভাই, এ স্থান সাধারণ মানুষের নয়। ঐ গুহা মহাপুরুষের তপস্যার স্থান।
দুগ্ধধারা কপিলধারা দেখা শেষ করে আবার যখন কপিল-আশ্রমের কাছে ফিরে এলাম তখন সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। খাড়াই পথটা সহযাত্রী দুজনে আমাকে টেনেই এনেছে বলতে গেলে। আমি শুধু হাঁপিয়েছি আর কায়ক্লেশে এক এক করে স্খলিত পদ সামনে ফেলেছি।
আশ্রমের সামনে আমাদের জিনিসপত্র, জুতো, সাইকেল সব যেমন ফেলে গিয়েছিলাম তেমনি ঠিক আছে। সেগুলো পাহারা দিচ্ছে দুটো বাঘা কুকুর। আমা-

দের দেখেই কুকুরদুটো ঘেউঘেউ শব্দ করে আশ্রমের মধ্যে ঢুকল। আমি ক্লান্তিতে বেদনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

রুমালে মুখের ঘাম মুছে অমিত বললে—ঠিক বলেছিলাম কিনা দাদা, আগে সব দেখে শুনে এসে তবে বিশ্রাম!

শুক্ল পক্ষের সন্ধ্যা। ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি হবে। কপিলধারার ওপারে পাহাড়ের মাথায় চকচকে বাঁকা চাঁদ। কুয়াশাবিহীন পূর্ব আকাশে তারকার মেলা। ঘন হয়ে শীত নামছে। আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে গল্প করছি। পিতলের গামলায় আটা মাখছে কান্‌হাইয়ালাল। গামলা আর আটা দুই-ই পেয়েছি জটাধারী সাধুর কাছ থেকে। সাধুর আসল নাম জানিনে। চাপদাড়ি আর ঘন জটা দেখে অমিত নাম রেখেছে বাবাজটাধারী।

কপিলাশ্রমের সঙ্গে প্রাচীন একটি পাকা দোতলা বাড়ি। সেটি ধর্মশালা। আশ্রমের সামনে মস্ত একটা আটচালা। বেশ উঁচু প্লিনথে মাটির নিকোনো মেঝে। এই-খানে ক-জন বহিরাগত তরুণ সাধু আশ্রয় নিয়েছে। ত্রিশূল কমণ্ডলু কম্বল আর গাঁজার কলকের মালিক প্রত্যেকেই। স্থায়ী সাধু আশ্রমে কয়েকজন থাকেন। শীত-কালে এদিক ওদিক সংগ্রহার্থ ভ্রমণ করেন। আশ্রম রক্ষা করছেন এখন জটাধারী বাবা আর তাঁর এক চেলা। বাঘা কুকুর দুটি তাঁদের আশ্রিত।

প্রহরী কুকুরের ডাকে সাড়া দিয়ে আশ্রমের বাইরে এসেছিলেন জটাধারী বাবা। হাঁকলেন – তুমলোগ কৌন্ হো, কাহাঁসে আতে হো?

উত্তর দিলে কান্‌হাইয়ালাল। বললে আমরা দূরদেশী মেহমান। অমরকণ্টক থেকে তার সঙ্গে বার হয়েছি। কপিলধারা দুগ্ধধারা দেখা শেষ করে একটু বিশ্রাম করছি!

জটাধারী শুধোলেন—একেবারে নিচু পর্যন্ত গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম।

ঘন গোঁফ ও দাড়ির ফাঁকে একটু হাসি চমকিয়ে উঠল। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন—একদম থেকে গিয়েছে বেচারারা! আও, অন্দর আও!

উঁচু অঙ্গনে উঠে এলাম। সামনেই প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু এক বীভৎস পাথ-রের মূর্তি। কারো হাতের বানানো মূর্তি নয়, একটা পাথরের উঁচু চাঙড়ের গায়ে মূর্তির আভাস। এবড়ো খেবড়ো ললাটের দু-পাশে দুটো বড়ো বড়ো চোখের আভাস, তার নিচে দুই নাসাগর্ত। তার তলায় মস্ত একটা হাঁ। সারামূর্তির গায়ে সিঁদুর লেপা। সেই মূর্তির পায়ের কাছে এধারে ওধারে লেংটিপরা ছাইমাখা

কয়েকজন সাধু গঞ্জিকাসেবন করছে।
জটাধারী বললেন—
মহাভৈরব তোমাদের সামনে, প্রণাম করো।
প্রণাম করতে গিয়ে আমি গড়িয়ে পড়লাম। হাত পা টানটান করে লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। অনেকক্ষণ আর উঠব না।
অমিত আশ্চর্য চোখে ঐ ভয়ংকর রক্তমূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। কপিলধারার পার্বত্য কিনার থেকে এই বিরাট শিলাখণ্ডকে একদা কেউ টেনে তুলে এনেছিল, তারপর খাড়া করে বসিয়েছিল এই আশ্রমপ্রাঙ্গণের ভূমি‍তে। মাটির গভীরে কতোটা পোঁতা আছে তা বলা যায় না।
সে বললে—এই ভৈরবকে এখানে কে প্রতিষ্ঠা করেছিল বাবা?
জটাধারী বললেন—মেরা গুরু মহারাজ। উনকা নাম থা ঋষিবাবা!
কপিলধারার সম্মুখস্থিত এই আশ্রমে সংবৎসরই দূরাগত অতিথি ও সাধু কেউ না কেউ জোটে। প্রসন্ন ঋতুতে এ স্থান তো যাত্রী জমায়েতে পূর্ণ থাকেই, প্রচণ্ড শীতকালেও আশ্রম একেবারে অতিথিশূন্য হয় না। অমরকণ্টকের মেলার সময় বহু যাত্রী কপিলধারা দেখতে আসে। তখন ধর্মশালা সরগরম। আর এই কঠিন বিষণ্ন ঋতুতেও আশ্রয়প্রার্থীর জন্যে উন্মুক্ত আশ্রমদ্বার। বাঘা কুকুরদুটির কাজ যাত্রী তাড়ানো নয়, যাত্রীদের পাহারা দেওয়া।
এই কপিলাশ্রমকে জাগ্রত করেছিলেন এক শংকরভক্ত সন্ন্যাসী। তিনি প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে ছিলেন। প্রায় দশ-বারো বছর আগে অতি পরিণত বয়সে তিনি এইখানেই দেহরক্ষা করেন। ভক্তরা আশ্রমের কাছে তাঁর এক স্মারকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। তাঁর নাম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। লোকে তাঁকে ঋষিবাবা বলে সম্বোধন করত।
জটাধারী বাবার আতিথেয়তার প্রথম নিদর্শনেই আমরা মুগ্ধ হলাম। এক এক লোটা ফুটন্ত গরম চা তিনি আমাদের সামনে ধরলেন। বললেন—অনেক পরিশ্রান্ত হয়েছ তোমরা। এই গরম চাটুকু জলদি পী লেও বেটা।
চা-পানের পর ধড়ে প্রাণ এলো। জটাধারী তাঁর চেলাটিকে সঙ্গে দিলেন। তার সঙ্গে চারদিক আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম।
কপিলাশ্রমের ডানদিকে কিছুটা ঢালু অতিক্রম করে ঋষিবাবার সমাধি। সামনে বেশ পরিচ্ছন্ন স্থানে কয়েকটি পুষ্পতরু। আরো কিছুটা গিয়ে ছোট এক শিবমন্দির।
চেলা বললে—
কপিলমুনি এখানে শংকর-উপাসনা করেছিলেন। এই শংকরলিঙ্গ কপিলমুনি

প্রতিষ্ঠিত।

তারপর আস্তে আস্তে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার, ঘনিয়ে এলো শীত। সেই অন্ধকারে পাহাড় আর বনানী একাকার হয়ে গেল। স্তব্ধ হলো ঘরে ফেরা পাখিদের কাকলি, স্পষ্টতর হল প্রপাতধ্বনি।

আকাশে তারা উঠল, বাঁকা চাঁদ জাগল। দিনের নিস্তব্ধতা রাত্রের গভীরে স্তব্ধতর হোলো। আমরা ধীরে ধীরে ফিরে এলাম আশ্রমে।

উঁচু আশ্রম-প্রাঙ্গণটি আটচালার মতো। মাথাটি ছাওয়া। একধারে বাড়ি, তিনধার ফাঁকা। মোটা কাঠের ঘনসন্নিবিষ্ট গুঁড়ির উঁচু রেলিং পার হয়ে বন্য জন্তুর পক্ষে প্রাঙ্গণের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে পড়ার উপায় নেই। তাছাড়া সামনে দুই বাঘা বুনো কুকুরের পাহারা।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা গর্ত। সেই গর্তের মুখে মোটা মোটা জ্বালানি কাঠ। চুলিতে আগুন জ্বলছে—সবাই ঘিরে বসেছে সেই আগুন। রাতের আহার্য সেঁকে নিচ্ছে যে যার। কান্‌হাইয়ালাল আটা মাখছে আমাদের তিনজনের মতো।

ছিন্ন চাটাই-এর উপর গেরুয়া চাদরখানা বিছিয়ে আধখানা কম্বল মুড়ি দিযে কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনে। হঠাৎ ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি, গুরগুর করছে বুকের মধ্যে। হাত পায়ের আঙুলগুলো নিঃসাড়। অমিত আর আমি, একখানা কম্বল দুজনে জড়িয়ে শুয়েছিলাম, কখন পিঠ থেকে কম্বল সরে গেছে, থরথরে পাঁজরের হাড়গুলো আর নেই। বাইরের তুহিন বাতাস বেশ কিছুটা গায়ে এসে লাগছে—সে বাতাসে মৃত্যুর হিমস্পর্শ।

তন্দ্রার সামান্যতম আবেশটুকু এক মুহূর্তে কেটে গেল—স্থির বুঝলাম এমনি ঘাপটি মেরে যদি পড়ে থাকি, তাহলে শেষ পড়ে থাকা থেকে আব নিস্তার নেই। দুধধারার মাঝখানের সেই কালো গহ্বরের মতো শীতল মৃত্যুর অতল গহ্বরে তলিয়ে যাব একেবারে।

হাতের আঙুলগুলো আস্তে আস্তে নাড়তে চেষ্টা করলাম। তারপর দেহমনের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে উঠে বসলাম। মোটা পায়জামা পরনেই আছে অনেক কষ্টে আঙুল নেড়ে নেড়ে গলাবন্ধ কোটের সব বোতামগুলো এঁটে দিলাম। তারপর অমিতের গায়ে কম্বল ফেলে উবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম চাতালের মাঝখানে।

সেখানে আগুনের কুণ্ডটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। উত্তাপের চেয়ে অঙ্গার বেশি।

ক-খণ্ড জ্বালানি কাঠ কুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিলাম। একমুঠো স্ফুলিঙ্গ হাতের তালুতে এসে লাগল। আরামে হাতের তালুদুটো ঘষলাম বার বার। তারপর ঠিক কুণ্ডের গায়ে একটা মোটা গুঁড়ি ঠেলে এনে তার উপর চেপে বসলাম। হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিলাম সন্ত প্রাণবন্ত আঁচের উপর।

আশেপাশে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মনুষ্যদেহ। কান্‌হাইয়ালাল, অমিত, জনতিনেক অতিথি সন্ন্যাসী। সন্ধ্যার অন্ধকারের পর দুজন বনবাসী এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাও। সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আগুনের তাপ বাড়াতে ঘুমন্ত মানুষগুলোর দেহে আরামের প্রলেপ লাগল বলে মনে হলো – কিঞ্চিৎ নড়াচড়া করল কয়েকটা দেহ। দরজার কাছ থেকে একটা কুকুর উঠে এলো, আগুনের ধারে এসে আমার গায়ে ঠেস দিয়ে আবার শুলো।

আগুনের উত্তাপ চামড়ার মধ্য দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে, ঘুমন্ত পেশী-গুলোকে সজাগ করছে, বেগ সঞ্চার করছে তন্দ্রালু রক্তধারায়। মূর্ছিত স্নায়ুমণ্ডলী ধীরে ধীরে সজাগ হচ্ছে। পায়ে চিমটি কেটে অনুভব করছি বেদনা—চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হচ্ছে, কান শ্রবণ করছে ঝিঁঝিপোকার ডাক।

আগুনের ধারে কতোক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই, উঠে দাঁড়ালাম শরীরটা টানটান করে। তারপর আস্তে আস্তে পায়চারি করে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নিস্তব্ধ ধরিত্রী, সমস্ত চরাচর জুড়ে নিঃসীম অন্ধকার। কোথায় পাহাড় আর কোথায় দিগন্ত—অসীম কালিমায় সব একাকার। সারা অন্তরীক্ষ জুড়ে কোটি তারকার লীলা। বিপুল শূন্যে শুধু তারার দীপ্তি আর গ্রহের স্পন্দন। আর এই বিশাল পৃথি-বীতে একটি মাত্র জাগ্রত মানুষ—অদ্বিতীয় আমি, আমার দেহ আর মন!

মনে মনে প্রশ্ন করলাম—

কে আমি? কী আমার নাম, কী আমার পরিচয়? কেউ জানে না, আমিও ভুলে গেছি। ভুলে গেছি বলেই আমি এমনি বেদনাহীন ঔদাসীন্যে নামহীন পরিচয়হীন অতীতহীন নবজাতকের মতো এই অনন্ত অন্ধকারের কোলে নির্ভয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছি।

শেষ বন্ধনটুকু ঘুচবে কাল। কান্‌হাইয়ালালের সঙ্গে কথা হয়ে আছে। ঐ একটা চেনা মানুষ, অমিত। অমিতকে বিদায় দেব কাল। তারপর যাত্রা করব নর্মদার পশ্চিমগামী স্রোতের পিছু পিছু—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করব অস্ত-সূর্যের দিগন্ত অভিমুখে। তখন আমার নাম ধরে কেউ আর ডাকবে না।

মনে মনে প্রশ্ন করলাম –

নাম থেকে মুক্তির এই মহা আকুলতা কেন? জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতি

মুহূর্তে এ নাম আমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী, নিশ্বাসের মতো নিত্যপ্রিয় সহচর। প্রিয়জনের ডাকে ডাকে এ নাম শ্রেষ্ঠ সংগীতের চেয়ে মধুর, সমাজে সংসারে এ নাম আস্থাদরের মহার্ঘ ভূষণ। জীবনের প্রিয়তম সম্পদ। কিসের ব্যর্থতায়, কোন্ বঞ্চনায় আমি ভাগ্যহত উদাসীন ?

সপ্তর্ষির প্রশ্নচিহ্নের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে পেলাম অতি সহজে। বিরহ ছাড়া মিলনের উপলব্ধি পরিপূর্ণ হয় না, তাই বিরহ মহামূল্য। নামকে এতো ভালোবাসি বলেই নামের সঙ্গে বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চলেছি।

শংকর জানেন, আমার জীবনে বঞ্চনার কোনো ক্ষোভ নেই, ব্যর্থতার কোনো বেদনা নেই, বিভ্রান্ত বাসনার কোনো জ্বালা নেই। সুখের চেয়ে সার্থকতা বড়ো, সার্থকতার চেয়ে আনন্দ বড়ো। আনন্দময়ের আশীর্বাদে আনন্দিত আমার জীবন। সেই আনন্দ সমাজ-সংসারের মধুময় রূপ ধরে আমাকে ঘিরে আছে। সেই আনন্দকে নিবিড়তর করে উপলব্ধি করব বলেই প্রেমময় সমাজ-সংসারের সঙ্গে আমি বিরহ করেছি। এই বিরহের আনন্দ বোঝাই কাকে ?

পূর্ব দিগন্তপারে অমরকণ্টক।

নর্মদামন্দিরের চূড়ায় এতোক্ষণে উষার প্রথম অরুণ স্পর্শ লেগেছে।

চক্রবালে নব প্রভাতের রক্তিম আনন্দ-আভা

ওঠো ওঠো কান্‌হাইয়ালাল, আর দেরি নয় !

১২

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো
ন শিলায়াং কদাচন।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাৎ
ভাবং সমাশ্রয়েৎ ॥

ভগবান কাঠেও থাকেন না, শিলাতেও থাকেন না। ভগবান থাকেন ভক্তের মনোভাবে। দারুরূপী জগন্নাথ, প্রস্তররূপী শিব। কিন্তু জগন্নাথ কাষ্ঠখণ্ড নন, শিব নন শিলাখণ্ড। জগন্নাথ আছেন ভক্তের হৃদয়ে, যোগীর ধ্যানমন্দিরে শিবের বসতি। মধ্যযুগের মরমী সাধক কবীরও সেই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

মন না রগাঁয়ে
রগাঁয়ে যোগী কপড়া।
আসন মাড়ি মন্দিরমে বৈঠে
পূজন লাগে পথ্‌রা।

সাধক, তুমি দেখি কাপড়টি রাঙিয়েছ গেরিমাটি দিয়ে, কিন্তু প্রেম ভক্তি বৈরাগ্যের রঙে মনটি তো রাঙাও নি! মন্দিরে এসে আসন করে বসেছ পূজা করতে, পাথরের বিগ্রহের পূজা করেই তোমার দিন গেল, তোমার অন্তরনিবাসী অন্তর্যামীর পূজা করা তো তোমার হলো না!

সন্ত কবীর ছিলেন জাতিতে মুসলমান, পেশায় জোলা। অতি দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর পরিবার—কাপড় বুনে সংসার চলে। কবীরের মন বসে না তাতে, মন বসে না সংসারে। তাঁতের গুনগুনানি কানে শোনেন—প্রাণের মধ্যে গুনগুন করে প্রেম-বৈরাগ্য মধুকর।

রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর। বারাণসীর ভাগীরথীঘাটে একদিন মহা প্রত্যুষে রামানন্দের চরণস্পর্শ লাভ করেন কবীর। লাভ করেন রামমন্ত্র।

সূর্যবংশীয় দশরথপুত্র অযোধ্যাপতি রাম বর্ণহিন্দুর উপাস্য দেবতা। তিনি বিষ্ণুর অবতার, নররূপী নারায়ণ। কেশবধৃতরঘুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে। নীচ বংশীয় মুসলমান সন্তান কবীর রামমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলেন। দরিদ্রা জননী রোদন করতে করতে

বললেন—ওরে কবীর, কী নাম তুই জপ করিস নিশিদিন ? তাঁত যদি না বুনিস তা হলে পয়সা আসবে কোথা থেকে, অন্ন জুটবে কেমন করে ?
কবীর বললেন—

কো বীনৈ প্রেম লাগৌ রী মাঈ, কো বীনৈ।
রাম-রসায়ন মাতে রী মাঈ, কো বীনৈ॥

মাগো, আমি যে প্রেমে পাগল হয়েছি, এখন কাপড় বুনবে কে ? রাম-রসায়ন পান করে সেই অমৃতসুধারসে মাতাল হয়েছে আমার মন, এখন কাপড় বুনবে কে ? রামমন্ত্র জপ শুধু মাত্র একটি নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া নয়—জপ ধ্যানবিন্দু। জপ যেন অমাবস্যার দৃষ্টিহীন নিকষ আঁধারে একটি মাত্র আলোকশিখা। বাসনা-কামনা-স্বপ্নকল্পনা যেখানে চরম অবলুপ্ত, সেখানে জপ যেন পরম উপলব্ধি। তাই কবীর বললেন—

মালা ফেরত জনম গয়া,
গয়া ন মন্‌কা ফের।
করকা মালা ছোড় দেরে
অব মন্‌কা মালা ফের॥

যিনি রাম, তিনিই রহিম। তিনি ভক্তের পরম প্রেমিক, সৃষ্টির পরম ব্রহ্ম। সেই পরম প্রেমিক সৃষ্টিকর্তার চোখে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে উচ্চ, কেই-বা ব্রাত্য !

হিন্দু মুয়ে রাম কহি
মুসলমান খুদাই।
কহৈ কবীর সো জীবতা
দুহ মৈঁ কদে ন জাই।

বাঙলার বাউল সাধকও তাঁর মনের মানুষকে উদ্দেশ করে বলেছেন তাঁর গানে—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে
মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই
চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে॥

মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ মরমী সাধক কবীর। তাঁর সাখী ও শব্দ সর্বধর্মাবলম্বী গণমানুষের মনকে আশায় ও আনন্দে উদ্ভাসিত করেছিল, ভক্তিরসে পরিপ্লুত করেছিল। সমস্ত লৌকিক সংস্কার-নিগড়কে অতিক্রম করে ভক্ত কবীর ব্রহ্মপদে তাঁর প্রেম-

নিবেদিত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে। একথা কবীরও বলেছিলেন তাঁর শেষের গানে—

কবীর জব হম গাওয়তে
তব ব্রহ্মা জানা নহীঁ।
অব ব্রহ্মা দিল্ মে দেখা
গাওন কু কছু নহীঁ॥

কিংবদন্তী এই যে, কবীর এসেছিলেন এই মেকল পর্বতচূড়ায় নিভৃত যোগসাধনার উদ্দেশ্যে। তিনি যেখানে থাকতেন সে স্থানটি কবীর চবুতরা নামে খ্যাত।

কবীর চবুতরা যে মহাত্মার স্মৃতি বহন করছে তার পিছনে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য নিশ্চয়ই কিছু আছে—মধ্যপ্রদেশে কবীর পন্থীর সংখ্যা কম নয়। প্রকৃত পক্ষে সারা ভারতে যতো কবীরপন্থী আছেন, তাদের অধিকাংশের বাস মধ্যপ্রদেশে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবীরতীর্থ রায়পুর জেলার কাওয়ার্ধায়,—নাম ধর্মদাস চৌরা মঠ।

কবীরের মৃত্যু সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর কাহিনী আছে। পরিণত বয়সে গোরক্ষপুর জেলার মঘর গ্রামে কবীর দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর পর কবীরের শেষকৃত্য নিয়ে তাঁর অগণিত হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। হিন্দুরা বললেন, তাঁর দেহ শ্মশানে দাহ করতে হবে। মুসলমানেরা বললেন, কবর দিতে হবে গোরস্থানে। দ্বন্দ্ব যখন তুমুল হয়ে উঠেছে, তখন ভক্তরা এক অলৌকিক দৈব নির্দেশ পেলেন। নির্দেশ পেয়ে তাঁরা ছুটে গিয়ে কবীরের মরদেহ যে শুভ্র বস্ত্র দিয়ে ঢাকা ছিল তা তুলে ফেললেন। দেখলেন সেই বস্ত্রের নিচে কবীরের দেহ নেই—শেষ শয্যা জুড়ে রয়েছে সুরভিধন্য পুষ্পরাশি। হিন্দুরা অর্ধেক ফুল তুলে নিয়ে গেলেন কাশীতে—সেখানে ভাগীরথীতীরে তারা পুষ্পদাহ করলেন। মুসলমান ভক্তরা মঘরে বাকি পুষ্পগুলি কবীরের নামে সমাধিস্থ করলেন।

অমরকণ্টক মালভূমির শুরুতেই এই কবীর চবুতরা। নর্মদামন্দির থেকে তিন সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। পাহাড়ী রাস্তা উঁচুতে উঠতে উঠতে এখানে সমতল ভূমি স্পর্শ করেছে। অতি রমণীয় স্থান। চারদিকে অরণ্য। আশেপাশে অজস্র বনপুষ্পগুল্ম। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। কয়েকটি পথ এখানে এসে মিশেছে। প্রধান সড়ক পাহাড় থেকে নর্মদাধারার দক্ষিণ দিয়ে নিম্নভূমিতে প্রসারিত হয়েছে।

কপিলাশ্রম থেকে প্রত্যুষে যাত্রা করে বেলা নয়টা নাগাদ কবীর চবুতরায় এসে কিছুটা বিশ্রাম করছি আমি আর কান্হাইয়ালাল। কপিলধারার আরণ্য পাকদণ্ডী থেকে পাকা সড়কে পড়ে বিদায় দিয়েছি অমিতকে। সে যাবে অমরকণ্টকে।

সেখান থেকে ফিরে যাবে পেণ্ড্রায়।

অমিত অনেক বাধা দিয়েছে, অনেক অনুযোগ করেছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে ছেড়ে যেতে। কান্‌হাইয়ালালকে গোড়া থেকেই তার ভালো লাগে নি। তার ধারণা, ঐ বাউরা অবধূতটাই আমায় খেপিয়েছে। বললে—সত্যি দাদা, আপনি হাঁটবেন ঐ পাগলটাকে সঙ্গে নিয়ে?

তাই তো মন করেছি অমিত!

এ মন কেন করলেন দাদা? কী মন্ত্র যে ঐ পাগলটা আপনাকে দিল!

ও মন্ত্র দেবে কেন অমিত? ও তো উপলক্ষ মাত্র। এ আমার নিজস্ব প্ল্যান। কান্‌হাইয়ালালকে না পেলে অমনি আর কাউকে আমি ঠিক জুটিয়ে নিতাম।

কিন্তু এ যে পাগলের খেয়াল দাদা?

মৃদু হেসে বললাম—

কিন্তু এ খেয়ালে তুমিই তো শেষ পর্যন্ত ইন্ধন যোগালে?

আমি? আমি তো পইপই করে আপনাকে বারণ করে আসছি। আমি আবার কী করলাম?

অমিতের উত্তেজনায় প্রলেপ দিয়ে শান্ত কৌতুকের সঙ্গে বললাম—

কাল ভোরবেলাকার কথাটা মনে নেই? তোমার জন্যেই তো বন্ধন খসল, গুরু-ভার নামল। এখন এক কাঁধে কম্বলটা ঝুলিয়ে অন্য হাতে হাল্কা ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে কোনো অসুবিধেই নেই!

কিন্তু শীতে যে জমে যাবেন দাদা?

জমে গেলেই হলো? কাল রাত্রে একটা কম্বল দুজনে গায়ে দিয়ে দিব্যি ঘুমলাম না? আজ থেকে পুরো কম্বলটার মালিক হব আমি। তবে?

কান্‌হাইয়ালাল পিছিয়ে পড়েছিল কিছুটা। অভিমানী অমিত গজগজ করে বললে, —ঐ সাধুবেটাই যতো নষ্টের গোড়া।

আমি তাড়া দিলাম, বললাম—আর দেরি নয়, সাইকেলে ওঠো। পেণ্ড্রার ফিরতি বাস ধরতে হবে না?

বিদায় নিল অমিত। সাইকেলের প্যাডেল বনবন করে ঘুরিয়ে। যতোক্ষণ না তার চেহারাটা দূরে মিলিয়ে গেল ততোক্ষণ চেয়ে রইলাম। এই গহন অরণ্য-পর্বতের অজ্ঞাত রাজ্যে দিগন্তের কিনারে হারিয়ে গেল আমার শেষ পরিচিত মানুষটি—ঢোলন্দাজ অমিতভাই।

অমিতের দোষ কী—আমিই কি কাউকে বলে এসেছি আমার এই যাত্রার উদ্দেশ্য?

আমি মধ্যপ্রদেশে বেড়াতে এসেছি। পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে আমার যাত্রা। তাই পহেলা অমরকণ্টক।

সেই অমরকণ্টকে সাতটি অবিস্মরণীয় দিন কাটালাম। এবার চলেছি অভিলষিত যাত্রায়। এ যাত্রার কল্পনা মনের কোণে গোপন রেখেছিলাম অনেকদিন। কাউকে বলি নি, কারুর কাছে ভাঙি নি। এ যাত্রার নীরব মনস্কামনা শুধু নিবেদন করেছিলাম নর্মদামন্দিরে—শুনেছিলেন শুধু নর্মদা-শংকর।

গোয়ালিয়র, ভূপাল, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, মাণ্ডু, ধার, বাঘ, সাঁচী, বিদিশা, খাজুরাহো—কিছুই দেখা হবে না। মধ্যপ্রদেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্যমণ্ডিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পর্যটকপ্রিয় সব কটি দ্রষ্টব্য স্থান বাদ পড়ে যাবে। নিতান্ত অসম্পূর্ণ খণ্ডিত ও অকিঞ্চিৎকর হবে আমার মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ।

এইসব বিখ্যাত স্থানগুলি অধিকাংশই আমার আগে দেখা। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? মাণ্ডু আর উজ্জয়িনী, বাঘ আর খাজুরাহো বারে বারে দেখলেও তো দেখার সাধ মেটে না! শীতকাল—পর্যটকের এই তো প্রিয় ঋতু। প্রত্যেকটি বিখ্যাত স্থানে দেশী বিদেশী অসংখ্য টুরিস্টের জটলা। ট্রেনের উচ্চ শ্রেণীতে আসন নেই। মহার্ঘ হোটেলে, ডাকবাংলোয়, সার্কিট হাউসে আশ্রয়ের অনটন।

আমিও কম ঘুরি নি এ পর্যন্ত। শুধু মধ্যপ্রদেশেই নয়—হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। নানা স্থানে আমি বেড়িয়েছি খাঁটি টুরিস্ট হয়ে। মার্কিন ছাঁটের পোশাক পরে ট্রেনের দামী আসনে শুয়ে। মোটরের নরম গদিতে গড়িয়ে, নামকরা হোটেলে হোটেলে আস্তানা নিয়ে।

এ আমার ভিন্ন যাত্রা। কবীর চবুতরায় ঝাঁকড়া আমলকী গাছের ছায়ায় ধূলিধূসর পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছি সেই যাত্রাপথে। অদূরে বাঁশের খুঁটি পোঁতা চালাঘরে একটা চায়ের দোকান। সেখানে দুভাঁড় চা আনতে গেছে পথসঙ্গী কান্হাইয়ালাল।

১৩

সকালবেলা কবীর চবুতরা থেকে যে পদযাত্রা শুরু করেছিলাম তা শেষ হলো দিনান্তে কুকুরামঠে এসে। মাঝে গেছে কয়েকটি দিন আর রাত। পরিক্রমাবাসীদের পন্থা অনুসরণ করে এই কদিন আমরা হেঁটেছি প্রত্যূষ থেকে প্রদোষ পর্যন্ত, রাত কাটিয়েছি আরণ্য আশ্রয়ে, পার হয়েছি মুণ্ড মহারণ্য। নর্মদার উৎস-শিখর থেকে পায়ে পায়ে নেমে এসেছি নর্মদা উপত্যকায়।

দুগ্ধধারার বাঁ দিক দিয়ে শীর্ণ একটি পাকদণ্ডী অজঙ্গবিজঙ্গ অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সিকি মাইলটাক সে পথে এগিযে নিদারুণ ভয়ে ফিরে এসেছিলাম। কান্‌হাইয়ালাল দেখিয়েছিল বাঘের পায়ের ছাপ। বলেছিল—এই ছিল পরিক্রমা-বাসীদের আদি পথ দাদা, এ পথে এখন আর কাউকে যেতে হয় না। প্রাচীন-কালে নর্মদা-পরিক্রমা কী ভয়াল অ্যাডভেঞ্চার ছিল, নিমেষে বুঝেছিলাম সেই পথরেখায় কয়েক পা এগিয়ে।

সে তুলনায় এই পদযাত্রা কিছু না। চারিদিকে নিবিড় নিঃসীম অরণ্য, কিন্তু তার মাঝখান দিয়ে পাকা সড়ক আছে। সে সড়ক স্থানে স্থানে বাস বা লরির পক্ষে বিপজ্জনক হলেও পদযাত্রীর তাতে কী এসে যায়! পদচারীর কাজ শুধু চালু সড়ক বেয়ে হেঁটে যাওয়া, অস্থির না হয়ে ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করে উঁচুনিচু পথের দৈর্ঘ্যকে আনন্দিত চিত্তে অতিক্রম করা। অসীম অরণ্য-প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে অবগাহন করা।

এই উদ্দেশ্যটি পাণ্ডাজী আর কান্‌হাইয়ালালকে বলেছিলাম।

কান্‌হাইয়ালাল বলে ছিল—দাদা, পরিক্রমা বড়ো কঠোর, আপনি কি নর্মদা-পরিক্রমা করতে চান?

আমি বলেছিলাম—না কান্‌হাইয়ালাল, নর্মদা-পরিক্রমার ব্রত আমার নয়। আমি সংকল্পরহিত নই। যৎসামান্য একটা সংকল্প যে রয়েছে আমার মনে!

কী আপনার সংকল্প?

তিন বছর তো দূরের কথা, তিন মাস সময়ও আমার হাতে নেই। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নর্মদাকে আমি দেখব। নর্মদার তীরে তীরে তীর্থমন্দিরাদি যতোটা

সম্ভব আমি দর্শন করব। আমি জানি রেলে চেপে মধ্যপ্রদেশ ঘুরলে আমার এই সংকল্প চরিতার্থ হবে না। নর্মদার দক্ষিণ তীরের যতোটা কাছ দিয়ে যে পাকা পথ আমি পাব, সেই পথে অনেক জায়গাতেই বাসরুট আছে। বাসে যাব—যেখানে বাস না পাই, অন্য ব্যবস্থার সন্ধান করব। দরকার হলে হাঁটব।

পাণ্ডাজী বললেন—সেই হাঁটারই পহেলা তালিম বুঝি এখন করে নিতে চাও বেটা। কিন্তু আমি বলছি, বড়ো কষ্ট পাবে। হাঁটার কষ্ট, শীতের কষ্ট। এতো কষ্ট কেন সইবে বেটা ?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না—সবিনয়ে মুচকি হাসলাম। গত দু-বছর হাঁটার তালিম আমি কম নিই নি। নিভৃত লোক-সংস্কৃতির সন্ধানে পল্লীবাংলার জেলায় জেলায় দুস্তর দূরান্তের গ্রামে গ্রামে অনেক আমি হেঁটেছি—কতোদিন পায়ে পায়ে কাটিয়েছি প্রত্যূষ থেকে সায়াহ্ন। পথের ধূলিতে গৈরিক হয়েছে বসন, পঙ্কতিলকে চর্চিত হয়েছে উত্তরীয়। হাঁটার দুঃখ আমার অনভ্যস্ত নয়, অনাস্বাদিত নয় চরণিকের আনন্দ-প্রশান্তি।

সেই আনন্দের সন্ধানেই আমার এই পদযাত্রা। শ্রেষ্ঠ পাথেয় সাধু কান্‌হাইয়া-লালের সঙ্গ। কান্‌হাইয়ালালের সঙ্গ যে কত মধুর তা বলে বোঝানো যায় না। সে সত্যিকারের পথের প্রেমিক—সেই প্রেমকে সহযাত্রীর মনে সহজেসে সঞ্চারিত করতে পারে।

ঘন বনের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা চলেছে। দুধারে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দীর্ঘ অরণ্যপথের ধারে ধারে মাঝে মাঝে আদিবাসীদের গ্রাম। সেই গ্রামে মানুষের মুখ, সংসারের আতিথ্য-উত্তাপ। আবার মাইলের পর মাইল নির্জন পথ। কোথাও তীব্র জলধারা—নর্মদার পার্বত্য উপনদী। সেই নদীর উপর সাঁকো। কোথাও পাখির কাকলি, ময়ূরের পক্ষশোভা, ত্রস্ত হরিণের কাজল-আঁখি। কোথাও পথ পাহাড়ের মাথায় উঠেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে উদার দিগন্ত—কোথাও দুই পাহাড়ের মাঝখানে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলেছে। দুধারে সাজা গাছের কালো কালো অসংখ্য নির্বাক প্রহরী—মধ্যাহ্নেও যেন গাঢ় প্রদোষছায়া।

পথপ্রদর্শক হিসাবে কানহাইয়ালালের তুলনা নেই। সে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। দীর্ঘকালের দেখাশোনা আর ঘনিষ্ঠ সাধুসঙ্গের ফলে প্রচুর অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ তার মনের ভাণ্ডার।

পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—নর্মদা-পরিক্রমা কি খুবই শক্ত ব্রত, কান্‌হাইয়ালাল ? এই যে দুজনে দিব্যি হেঁটে চলেছি—খুব কষ্টকর বলে

তো মনে হচ্ছে না ? এমনিতরো হাঁটা—তা তিন দিন হাঁটলেও যা, তিন বছর হাঁটলেও তা—তার বেশি তো কিছু নয় !

কান্‌হাইয়ালাল বললে—দাদা, সব তীর্থযাত্রাতেই পথের কষ্ট আছে। তা আপনি হেঁটেই যান, আর রেলে মোটরে যান। ঘরের সুখ কি আর পথে মেলে ? রেলগাড়ি যখন ছিল না, তখন লোকে পায়ে হেঁটেই তো তীর্থ করত। যে তীর্থে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, সেই সব হাঁটা-পথও তো আজকাল কত ভালো হয়ে গিয়েছে। আগে তুষ্কর পুষ্কর তীর্থে লোকে মরুভূমি পার হয়ে যেত, আজ আজমীঢ় থেকে পাকা সড়কে কোথাও এক মুঠো বালি নেই, একটি কণ্টকও নেই। নর্মদা-পরিক্রমাই একমাত্র তীর্থযাত্রা যা পদব্রজে করতে হয়। গাড়ি থাকলেও গাড়িতে ওঠা যায় না, ঘোড়া থাকলেও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া যায় না, পালকি থাকলেও পালকিতে বসা বারণ।

আমি বললাম—পায়ে হাঁটা কি এতোই কঠিন ?

কান্‌হাইয়ালাল বললে—না দাদা, তবে পদযাত্রাই নর্মদা-পরিক্রমার সত্যিকার কঠিনতা নয়। এর কঠিনতা আলাদা।

কী সে কঠিনতা তাহলে ?

কঠিনতা দেহে নয়, মনে। এই তীর্থের জন্যে মনকে তৈরি করা বড়ো কঠিন।

কী ভাবে মনকে তৈরি করতে হয় ?

কানহাইয়ালাল বললে—এ সম্বন্ধে পাণ্ডাজীর সঙ্গে আপনার কথা হয় নি ?

পাণ্ডাজী বলেছিলেন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পরিহার করে এ পথে যেতে হয়। আর বেশি কিছু বলেন নি।

আসল চুম্বকটি তিনি দিয়েছিলেন দাদা। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পরিহার করে যাওয়া, এই হলো নর্মদা-পরিক্রমার সারাৎসার। বলুন তো, এ কি কম কঠিন ? ক-জন লোক পারে ?

তুমিই বলো, কান্‌হাইয়ালাল !

ধর্ম জানি, তার প্রতি আকর্ষণ নেই, অধর্ম জানি, তার জন্যে আকিঞ্চন নেই—আকাঙ্ক্ষা নেই পুণ্যের, বাসনা নেই পাপের। এমন মানসিক অবস্থা কার হতে পারে দাদা ? এমন উদাসীনতা কার পক্ষে সম্ভব ?

সংসারীর পক্ষে নিশ্চয়ই নয় !

ঠিক বলেছেন। আরো দেখুন, তীর্থ করে মানুষ কিসের আশায় ? সুফলের আশায়। হয় ইহকালে উন্নতি, না হয় পরকালে সদ্‌গতি। প্রতি তীর্থের প্রতিটি তীর্থযাত্রীর এই মনস্কামনা। নর্মদাতীর্থ অন্য। এক পরিক্রমা সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর

কোনো মনস্কামনা নর্মদা পরিক্রমাবাসীর থাকতে নেই। শংকর-চরণে তার সর্ব-আকাঙ্ক্ষাবিহীন প্রণতি।

নর্মদা-পরিক্রমার এই বিশেষত্ব। এমনি নির্লিপ্ততা আর উদাসীনতা নিয়ে কোনো সংসারী চলতে পারে না। তাই এ পথে যারা চলে তারা সংসার থেকে সর্বতো-ভাবে ছুটি নিয়েই চলে। এই পথ সন্ন্যাসীর পথ। ছুটি আর উদাসীনতা অসংযমের নামান্তর নয়। সংযম ছাড়া সন্ন্যাস হয় না। সে কথাই কান্‌হাইয়ালাল আমাকে বুঝিয়ে বললে।

পরিক্রমাবাসের কয়েকটি কঠোর নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়। প্রধান নিয়ম পরিক্রমাবাসীর মধ্যে ধনীদরিদ্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। কোনো যাত্রী নিজের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্যাদি রাখতে পারেন না। দুদিনের বেশি আহার্য বস্তুও নয়। প্রত্যেককেই নিজের নিজের জিনিস বইতে হয়, দলের দরিদ্রতম সহযাত্রীর সঙ্গে একাত্ম হতে হয়। পরিক্রমার আগে কড়াই করতে হয়। কড়াই করা মানে নিজের নিজের অবস্থা অনুসারে পূজা, দান এবং সাধু মহাত্মা ও ব্রাহ্মণদের ভোজন। কড়াই-এর তিনদিনের মধ্যে যাত্রা আরম্ভ করতে হয়। সংসার থেকে অবসর গ্রহণের সব ব্যবস্থা পরিক্রমাবাসী এই তিন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করেন। তারপর আর তাঁর কোনো সাংসারিক পরিচয় নেই, সামাজিক শ্রেণী নেই। সন্ন্যাসই তাঁর আশ্রম ও পরিচয়।

পরিক্রমাবাসী কোনো একস্থানে অধিক দিন থাকবেন না, কোথাও কোনো দ্রব্য সংগ্রহ করবেন না, নর্মদাতীর থেকে দূরে চলে যাবেন না। প্রতিদিন নর্মদা দর্শন ও নর্মদা স্নান তাঁর করণীয়। যদি ঘন অরণ্যপথে কোনো দিন নর্মদা দর্শন অসম্ভব হয় সেজন্যে নর্মদাবারি সঙ্গে রাখবেন ও মাথায় দেবেন। তেমনি যেখানে যেখানে লোকালয়বিহীন অরণ্যপথ পড়বে, সেই পথটুকুর জন্যে আগে কিছু খাদ্য তাঁরা সঙ্গে নিয়ে নেবেন—তা ছাড়া খাদ্যের আর কোনো সঞ্চয় বহন করবেন না।

সদাচারী সত্যভাষী হয়ে পরিক্রমাবাসীরা কাল কাটাবেন। চুলদাড়ি রাখবেন, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। নর্মদার প্রতিটি তীর্থে তাঁরা পূজা করবেন। পথে কুকথা, কদাচার, উত্তেজনা, হিংসা ও অসংযম পরিহার করে সর্বদা ধর্মালোচনা করবেন, সহযাত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন ও রেবানাম জপ করবেন। এক রেবাসংগম ছাড়া আর কোথাও তাঁরা নর্মদার বুকের উপর দিয়ে এপার ওপার করবেন না বা গভীর নদীর মধ্যে গিয়ে স্নান করবেন না।

অন্নবস্ত্রের জন্য পরিক্রমাবাসীর কোনো কষ্ট নেই। তাঁরা কঠোর সংযমী—ন্যূনতম তাঁদের প্রয়োজন। সামান্য সেবাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। পরিক্রমাবাসীদের সেবা

সংসারী গৃহস্থ পুণ্যকর্ম বলে মনে করেন। পথের বিপদে একে অন্যকে তাঁরা সাহায্য করেন। তাঁরা নির্ধন, নির্ভূষণ, অহিংস। সর্ব-সংকটে নর্মদা-শংকর তাঁদের রক্ষা করেন।

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাঁটতে শুরু করি। চারিদিক দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে যাই। দিনান্তে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ে ঢুকি—আগুনের পাশে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আরামে রাত কাটাই। দুবেলার আহার্যের ভার কান্‌হাইয়ালালের ওপর। সে নিজে হাতে যা বানায়, তা পরমানন্দে দুজনে ভাগ করে খাই।
প্রথম দিন আমরা মাইল দশেক হাঁটলাম। দিনান্তে আশ্রয় নিলাম করঞ্জিয়া গ্রামে। পথে মাইল ছয় দূরে করমণ্ডল নামক স্থানে করগঙ্গা নদীকে অতিক্রম করলাম। করগঙ্গার শীর্ণ ধারার তীরে দাঁড়িয়ে কান্‌হাইয়ালাল বললে—এই নদীকে আগে কোথায় দেখেছেন বলুন তো?
স্মরণ করবার জন্যে দু-এক মুহূর্ত সময় দিয়ে আবার সে বললে—ভৃগু-কমণ্ডলু দেখেন নি?
ঠিক, মনে পড়েছে। অমরকণ্টকের ভৃগু-কমণ্ডলু তীর্থে করগঙ্গার উৎস। করগঙ্গা নর্মদার উপনদী, করমণ্ডল থেকে মাইল চার উত্তর-পশ্চিমে নর্মদা স্রোতে পড়েছে।
করঞ্জিয়া অতি মনোরম গ্রাম। গ্রামে পৌঁছবার আগে কিছুটা দূর থেকে রাস্তা খাড়াই হতে শুরু হয়েছে। দুপাশে পাহাড়ী ঢালু। সেই ঢালুতে অরণ্য। আকাশ উন্মুক্ত থেকে উন্মুক্ততর হচ্ছে। করমণ্ডল থেকে মাইল চারেক দূরে করঞ্জিয়া।
পাহাড়ী চাতালের উপর ছবির মতো সাজানো গ্রামটি। রাস্তার দুধারে আদিবাসী-দের কুটীর। পাহাড়ী ঢালুতে চাষের ক্ষেত। ছোট একটি ডাকঘর আছে। পুলিশ-ফাঁড়ি আছে, বনবিভাগের একটি দপ্তরও আছে। দোকানপাটও আছে দু-একটি। পথের পাশে গাছের নিচে কটা ছাগল চরছে—আদিবাসী কয়েকটি শিশু ছুটোছুটি করছে তাদের পিছনে। দিনান্তে এই পোষা প্রাণীগুলিকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার তাড়ায়।
শেষের দিকটা খুব ধীরে ধীরে পায়চারি করে এগিয়ে ছিলাম। কাঁধের কম্বল আর হাতের ব্যাগ দুই-ই মনে হচ্ছিল দারুণ গুরুভার। গ্রাম-প্রান্তে পৌঁছতে পৌঁছতে অবসিত দিনমণি। পিছনে সালাই গাছের উঁচু চূড়াগুলি লালে লাল।
দোকানী আদর করে কাঁধের গামছা দিয়ে মুছে দিল বেঞ্চিটা। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলাম। পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনে পাম্প পড়তে পড়তে চারদিক অন্ধকার।

জপ সেরে এলো কান্‌হাইয়ালাল। সন্ধ্যাবেলা নির্জনে কিছুক্ষণ বসে সে বেবানাম জপ করে নেয়। তারপর দোকানী খাওয়ালো গরম মোটা রুটি আর ভাজি। পোস্টমাস্টার দিলেন রাত্রের আশ্রয়।

পরদিন প্রত্যুষে করঞ্জিয়া থেকে যাত্রা শুরু করলাম। এখান থেকে মুণ্ড মহারণ্যের আরম্ভ। অরণ্য ঘনতর হয়েছে। লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ নেই বললেই হয়। বহু দূরে দূরে বসতির আভাস।

তিন মাইল দূরে বোঁদর গ্রাম। এই গ্রামের পাশ দিগে আর একটি শীর্ণা জলধারা বয়ে চলেছে। এই পার্বত্য তটিনীর নাম কন্বা। নর্মদার উপনদী, বোঁদর গ্রাম থেকে নর্মদা প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। পাকদণ্ডী বেয়ে নর্মদা দর্শন করে এলাম। সে রাতটা বোঁদরেই আমাদের কাটল।

বোঁদর গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে নর্মদার আর একটি ক্ষুদ্র উপনদীর বুক দিয়ে আমাদের পথ এগিয়ে চলল। এই নদীর নাম তুহার। তুহারের ধারে বসে আমবা দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে কিছুটা বিশ্রাম করলাম।

তারপর বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছলাম সীবনী নদীর তীরে সরস্থুয়া গ্রামে। তুহার থেকে সীবনীর দূরত্ব অন্তত মাইল ছয়। সরস্থুয়া গ্রামেই রাতের আশ্রয়।

পবের দিন আবার সূর্যোদয়েব অনেক আগে যাত্রা শুরু। লোটীটোলা ও শোভাপুর গ্রাম পিছনে ফেলে অপরাহ্নে পৌঁছলাম গাডাসরাই গ্রামে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে নর্মদার চিকরাব উপনদী বয়ে চলেছে। চারদিকে গভীর জঙ্গল ও পাহাড। একটি ছোট ডাকঘর আছে। তার দাওয়ায় রাত্রিবাস।

গাড়া-সরাই থেকে আবার যাত্রা। একদিন রাত কেটেছে এক নির্জন আশ্রমে— আর একদিন এক বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দিরে। শেষ পর্যন্ত কুকুরামঠে এসে পৌঁছেছি। পরিক্রমাবাসীব প্রিয় বিশ্রামস্থলে।

•

কুকুরামঠ ঋণমুক্তেশ্বর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এখানে বিরাজ করছেন সিদ্ধিনাথ ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেব। বহু প্রাচীন জার্ণ মন্দির। অনেকে বলেন এটি প্রকৃতপক্ষে একটি জৈন মন্দির। এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেন শংকরাচার্য।

এক প্রচলিত লোক-কাহিনী কুকুরামঠ নামের ভিত্তি। অনেককাল আগেকার কথা। এখানে একদল বাঞ্জারা ডেরা বেঁধেছিল। বাঞ্জারারা বুনো কুকুরকে পোষ মানায়। তারা পশুপালক যাযাবর জাত। পোষা কুকুররা তাদের গরু-মহিষের পালের সঙ্গে হাঁটে, রাত জেগে তাদেব আস্তানা পাহারা দেয়। বাঞ্জারাদের কুকুররা অত্যন্ত প্রভুভক্ত হয়।

দলের এক বাঞ্জারার কিছু টাকার দরকার হয়—স্থানীয় মহাজনের কাছে ধার করতে যায়। মহাজন বলে—তুমি তো আজ এখানে, কাল সেখানে। কিসের ভরসায় তোমাকে টাকা ধার দেব ?

বাঞ্জারা তার সবচেয়ে প্রিয় বাঘা কুকুরটিকে মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে এলো। কুকুরের পিঠে হাত বুলিয়ে তার কানে কানে বললে—এইখানে তুই থাকবি যতদিন না আমি নিজে এসে তোকে নিয়ে যাই।

কুকুর রয়ে গেল।

কিছুদিন পরে এক রাত্রে মহাজনের বাড়ি চুরি হলো। তার যথাসর্বস্ব সোনাদানা নিয়ে গেল। হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে লাগল মহাজন—মড়াকান্না কাঁদতে লাগল তার পরিবার।

ঘরে ঢুকল বাঞ্জারার বন্ধক-রাখা সেই কুকুর। এপাশ ওপাশ ক-বার শুঁকল, তারপর টানাটানি করতে লাগল মহাজনের কাপড় কামড়ে ধরে। টানাটানি আর ডাকাডাকি।

কুকুরের সঙ্গে মহাজন বার হলো। কুকুরকে অনুসরণ করে চলল বনের মধ্যে। সঙ্গে আরো স্থানীয় লোক। কুকুর অনেকদূর গিয়ে একটা মোটা গুঁড়ির নিচে মাটি আঁচড়াতে লাগল। সেই মাটি খুঁড়তে বার হলো মহাজনের সমস্ত হারানো ধন। চোর মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

মহাজনের আনন্দের শেষ নেই! কুকুরের মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে দেনাদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখল। চিঠিটাকে ছোট করে মুড়ে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিল। তারপর কুকুরকে অনেক মেঠাই খাইয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—

যা, তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা!

বন্ধকী কুকুরকে নিজের আস্তানায় দেখে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল সরল আদিবাসী। প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছে তার কুকুর! মহাজনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে! একটা অস্ত্র টেনে নিয়ে নির্ভুল এক আঘাত হানল কুকুরের বুকে। ছটফটিয়ে মরে গেল অবোলা প্রভুভক্ত প্রাণী।

তারপর বাঞ্জারার নজর পড়ল মৃত পশুর গলার চিঠিটার দিকে। চিঠিটা খুলে সে পড়ল, সব জানল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। মৃত কুকুরটার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল—তারপর একলা হাতে মাটি খুঁড়ে সমাধিস্থ করল তাকে।

বাঞ্জারারা একঠাঁই থাকে না বেশিদিন। তাদের দল আস্তানা তুলল, গুছিয়ে নিল

মালপত্র—আবার হাঁটা দিল নূতন ডেরার উদ্দেশ্যে। এ লোকটা কিন্তু নড়ল না। কুকুরের শোকে আর কৃতকর্মের অনুশোচনায় সে চলৎশক্তিহীন। মহাজনের কাছে যে ঋণ সে করেছিল সে ঋণ অবহেলায় সে সহজেই পরিশোধ করতে পারত। কিন্তু দুষ্কৃতির এই ঋণ থেকে মুক্তি ঋণমুক্তেশ্বরের দয়া ছাড়া সম্ভব নয়।
ঋণমুক্তেশ্বরের পূজা করে বাকি জীবন অতিবাহিত করল বাঞ্জারা। তার আশ্রমের নামে এই স্থান পরিচিত হলো কুকুরামঠ নামে।

মুণ্ড মহারণ্য পরিক্রমা জীবনের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা কখনো ভুলব না। সারা জীবন আমি চলব জনতার ভিড়ে—চলব প্রতিযোগিতার বন্ধুরতায়, সামাজিকতার দ্বন্দ্ব-বাধায়, আশা-নিরাশার অস্থিরতায়। লাভক্ষতির ব্যাকুলতায়, মদমোহের দুর্লঙ্ঘ্যতায়। এই চলার কোনো স্বস্তি নেই—এই চলা থেকে মুক্তি নেই। এই চলার তাড়না মুহূর্তে মুহূর্তে দিনে দিনে টেনে নিয়ে চলেছে এক জন্মদিন থেকে আর এক জন্মদিনের দিকে, মধ্যাহ্ন থেকে প্রদোষছায়ার দিকে, নিশ্বাস থেকে নশ্বরতার দিকে।
সংখ্যাহীন সহযাত্রীর উদ্দাম পদক্ষেপণের সঙ্গে পা মেলাতে কখনো কখনো পারব না। পিছিয়ে পড়ব প্রতিযোগিতায়। এগিয়ে যাবে শোভাযাত্রা—পথপাশে ধূলিতলে অমি পাব সাময়িক বিরতি। শ্রান্তিতে অবসন্নতায় সেই বিরতি হবে মধুর। শোকে আনন্দে সেই বিরতি হবে মহার্ঘ্য। সেই বিরল অবসরের একাকীত্বে স্মরণ করব মুণ্ডা মহারণ্যের এই নিঃসীমতাকে।
এ এক অন্য জীবন, অন্য যাত্রা। সমগ্র জীবন থেকে এ কটি দিন আলাদা, জগতের সমস্ত পথ থেকে এ পথটি বিভিন্ন।
যুগ যুগ ধরে এই পথে চলেছে কতো সন্ন্যাসী, কতো বৈরাগী, কতো উদাসান! কতো সুদীর্ঘ সাধনায় কতো নিষ্ঠা কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের নিষ্কাম মনস্কামনায়। কখনো গেছে একলা, কখনো দল বেঁধে। গেছে রিক্তসর্বস্ব হয়ে অহরহ রেবা জপ-মালা রচনা করতে করতে। তাদের পুণ্য পদরজকে স্পর্শ করে, তাদের পথধারাকে অনুসরণ করে আমিও চলেছি।
প্রত্যুষে শুকতারার নীরব আহ্বান শুনে আমার ঘুম ভেঙেছে। প্রণাম করেছি নর্মদা-শংকরকে, প্রণাম করেছি সর্বপাপঘ্ন সূর্যকে। তারপর শুরু করেছি যাত্রা। সামনে পিছনে বাঁ-পাশে ডানপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর অরণ্য আর অরণ্য। মাঝখানে দিয়ে রাস্তা। কখনো খাড়াই কখনো উতরাই—কখনো সোজা, কখনো বাঁকা। সেই রাস্তা চলেছে রেবার দক্ষিণ তীর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে।

পিছনের বৃক্ষরাজি ছাড়িয়ে পর্বতচূড়া ডিঙিয়ে আকাশে সূর্য উঠেছে—তার প্রাণ-দায়ী আলোক আর উত্তাপে দেহের জড়তা কেটেছে, চলার গতি বেড়েছে। ঘুম ভেঙেছে পাখিদের, চলার ছন্দে যোগ দিয়েছে বিহঙ্গ-কাকলি।

দুধারে বিরাট বিরাট গাছ, মধ্যাহ্নেও পথ জুড়ে ছায়ালিম্পন। সেই ছায়া কতো বন্যলতার আকর্ষণে আকুল, কতো বন্যকুসুম-সুরভির গন্ধে মন্থর। সেই সব পথ-গুল্মের মাথায় মাথায় হলুদ লাল ছোট ছোট ফুলের অজস্র প্রস্ফুটন—অসংখ্য মৌমাছির ভিড়।

কোথাও কাঁটালতা জড়ানো আবলুস গুঁড়ির কিনার দিয়ে তৃণহীন মসৃণ প্রস্তর টিলার গা দিয়ে বিশীর্ণা এক ঝরনা নেমে এসেছে, পথ পার হয়ে নেমে গেছে ওপারের অতল খাদের গভীরতায়। কোথাও একটি উপনদী লাজবন্তী কিশোরীর মতো পেলব ধারায় ত্রস্ত নূপুরনিক্কণে চলেছে নর্মদা-অভিসারে। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সে—তারই ধারে গড়ে উঠেছে আদিবাসী জনপদ।

দিনান্তের মেঘ পড়ন্ত সূর্যের আভায় লালে লাল হয়ে ওঠে। সেই রক্তিমাভা লাগে পাহাড়ের শিখরে, গাছের মাথায়। ক্ষণকাল পরেই ধূসরতা নামে, ছায়া গভীর হয়, অন্ধকার আকাশে উঁকি দেয় সন্ধ্যাতারা। বন্য হরিণের দল অদূরে ছুটে যায়, দূর থেকে শোনা যায় হিংস্র শ্বাপদের হুংকার।

ততক্ষণে আমরা রাতের আশ্রয় নিয়েছি। ডাকঘরের বারান্দায়, আদিবাসী কুটীরে, বা দেবাশ্রমে। মাঝখানে গনগনে আগুন জ্বলেছে। যতোটা সম্ভব কাছাকাছি মাটির উপর কম্বলটা বিছিয়েছি—সঙ্গের ব্যাগটা কাঁধের নিচে রেখে টানটান চিত হয়ে শুয়ে দিনের শ্রান্তি অপনোদন করছি। কান্‌হাইয়ালাল হাতমুখ ধুয়ে জপ সেরে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করছে।

রাত্রে আশ্চর্য জ্যোৎস্না ওঠে। সমস্ত অরণ্য-রাজ্য এক বিচিত্র মায়ারাজ্যের রূপ নেয়। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে বাজে নীরবতার জপমন্ত্র—শুধু ভেসে আসে ঝরনার কুলুধ্বনি, ভেসে আসে অজানা পুষ্পমঞ্জরীর কটু-মধুর আঘ্রাণ। মাঝে মাঝে বন্য হরিণের আর্তনাদ, বাঘের গর্জন!

সীবনী নদীর তীরে সরস্বুয়া গ্রামের সেই রাতটি! তুহার থেকে দুপুরবেলা যাত্রা করার পর পথে বিকেল পর্যন্ত একটি লোকের সঙ্গেও দেখা হয় নি। পাখির ডানা আটকে যাবার মতো ঘন অরণ্য। এসব অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী বাইগা ও গোঁড়। বাইগারা এখনো পর্যন্ত কদাচিৎ কৃষিকার্যকে গ্রহণ করেছে। তারা প্রায় বিবস্ত্র অরণ্যচারী। পশুশিকার ও বন্য উদ্ভিদ সংগ্রহ করেই তারা জীবন কাটায়।

গোঁড়রা অনেক উন্নত। তারা কৃষিজীবী। পাহাড়ে রাস্তা এখানে ওখানে মেরামত হচ্ছে। সেই কাজেও মেয়ে-পুরুষ গোঁড়-শ্রমিকরা লেগেছে।

প্রায় বিকেল যখন ঘনিয়ে এলো তখন পথের ধারে দুটি গোঁড় রমণীর দেখা পেলাম। কান্‌হাইয়ালাল তাদের ডেকে কথা বলতে তারা হাসিমুখে আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল তাদের ডেরায়।

সরস্থ্য়া গ্রামে তাদের কুটীর। ছোট একটিমাত্র ঘর। সেই ঘরে একটি মেয়ে আর তার স্বামী থাকে। সামনের মাটি-লেপা দাওয়ায় শোয় অন্য মেয়েটি, সে কুটীরের মালিকের ছোট বোন। সেই দাওয়ায় ঘরের খাটিয়া দুটো টেনে বার করে দিল আমাদের জন্যে। দাওয়ার সামনে বড়ো করে আগুন জ্বালল। কান্‌হাইয়ালালকে কিছুতে খাবার বানাতে দিল না। দুই মেয়ে অত্যন্ত যত্নভরে বাজরার রুটি আর অড়হর ডাল বানিয়ে আমাদের খাওয়াল।

পেটে গরম খাদ্য, সামনে গনগনে আগুন। মাথায় ব্যাগের বালিশ। কান মাথা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে একটু তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় পায়ে নরম কিসের স্পর্শ লাগল। চমকে উঠে দেখি ছোট মেয়েটি খাটিয়ার ধারে এসে বসেছে। বলছে—আরামসে লেট যাও মেহমান্, আমি তোমার পা দুটো একটু টিপে দিই?

সহজ সরল দরিদ্র এই আদিবাসীদের আতিথ্যের তুলনা হয় না। ঘরের সামান্য সঞ্চয়টুকু ভাঙিয়ে ওরা আমাদের খাইয়েছে, কষ্টসঞ্চিত কাঠ দিয়ে আগুন জেলে পরিবেশন করেছে আমাদের প্রাণদায়ী তাপ। নিজেদের শোবার খাটিয়া দুটি আমাদের পেতে দিয়েছে। তারপর শ্রান্ত অতিথির সেবার জন্য কুণ্ঠাবিহীন কারুণ্যে প্রসারিত করেছে নীরব দুটি হাত।

সহজে ঘুম এলো না সে রাত্রে। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে আর সীবনী-ধারার কল্লোলধ্বনিতে কান পেতে বিনিদ্র রজনী কতো যে গভীর হলো মনে নেই।

১৪

অবিস্মরণীয় মুণ্ড মহারণ্য যাত্রা আর অবিস্মরণীয় আমার যাত্রাসঙ্গী কান্হাইয়ালাল। অমরকণ্টকের পাণ্ডা বলেছিলেন সাধু কান্হাইয়ালাল তার নাম। আমি প্রথমে তাকে খাতির করে সাধুজী মহারাজ বলে সম্বোধন করেছিলাম। সেই সম্বোধন সে স্বীকার করে নি। বলেছিল—আমি সাধু নই বাবুজী, আমি নর্মদাজীর কিংকর। বলেছিল—আমি আপনার ছোটা-ভাই, আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সে সন্ন্যাসী নয়। ব্রহ্মচারী সে, কিন্তু অদীক্ষিত। তার গুরু নেই, সংঘ নেই, দল নেই। সে উদাসী।

উদাসীনতা যদি সাধুর প্রধান গুণ হয়, নির্লিপ্তি যদি সাধুর প্রকৃত চরিত্রভূষণ হয়, তাহলে কান্হাইয়ালালের মতো সাধু বিরল।

ষড়রিপুকে জয় করা যদি সাধুর প্রধান শক্তি হয়, তা হলে সেই শক্তিবলে সাধু কান্হাইয়ালাল মহা বলীয়ান। তার ক্রোধ নেই, লোভ নেই, হীনতা নেই। নির্লোভ সারল্যের সে প্রতিমূর্তি। বাসনাবিহীন বিমলানন্দ যদি সাধুচিত্তের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হয়, তা হলে কান্হাইয়ালালের তুলনা নেই। তার মন দুর্লভ আনন্দের আধার। এই আনন্দে নিত্য-উদ্ভাসিত তার মুখ।

উদাসীন বলে কান্হাইয়ালাল নির্মম নয়। স্নেহের ও প্রীতির স্বচ্ছ ফল্গুধারায় তার চিত্ততল সদাই রসসিক্ত। সেই রসের প্রকাশ তার বাক্যে, তার ব্যবহারে। এই ক-দিন আমার প্রতি সজাগ দৃষ্টি সে রেখেছে। পথের কষ্ট কী করে একটু লাঘব হয়, আশ্রয়ের আরাম কী করে একটু বাড়ে, সেই চিন্তা ও চেষ্টায় সে কার্পণ্য করে নি। অথচ আমার এই প্রয়াসে একবারের জন্যেও সে আমাকে নিরুৎসাহ করে নি বা আমার অসুবিধা বা কষ্টের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নিরর্থক সমবেদনা জানিয়ে আহা-উহু করে নি।

আমি যখন তার কাছে এই মুণ্ড মহারণ্য ভ্রমণের প্রস্তাব করি, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে—বহুত উঁচা সংকল্প আপনি করেছেন দাদা, নর্মদাজী আপনাকে আশীর্বাদ করবেন এ জন্যে।

তাকে আমার সহযাত্রী হবার অনুরোধ দুবার করতে হয় নি। বলেছে—এ তো আমার ভাগ্য দাদা।

রাত যেখানেই কাটাই, ভোরবেলাকার চায়ের যোগাড় সে করেছে, দিনে রাতে

প্রয়োজন মতো ভাজি-রুটি সে বানিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে আমার ব্যাগটা সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। রাতের আশ্রয় সেই যোগাড় করেছে, আঁচের ঠিক পাশেই আমার কম্বলটি নিজে হাতে পেতে দিয়েছে।

আহার্যের যা সামান্য খরচ, তা অবশ্য আমি দিয়েছি। একমাত্র ধূমপান ছাড়া তার কোনো নেশা নেই। অমরকণ্টকে ক-বাণ্ডিল বিড়ি কিনে তার ঝুলিতে আমিই ভরে দিয়েছিলাম। এ ছাড়া সে গোড়া থেকেই প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছে যে সহযাত্রীর হাত থেকে একটা কাঁচা পয়সা সে নেবে না।

আমি বলেছিলাম—পাহাড় থেকে উপত্যকায় ন'মবার পর আমি তো তোমাকে বিদায় দেব কান্‌হাইয়ালাল!

দেবেনই তো! আপনি যাবেন আপনার পথে, আমার পথ আমি দেখব।

পাণ্ডাজী হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন।

না, তুমি তারপর কোথাও যাবে না কান্‌হাইয়ালাল—অমরকণ্টকে ফিরে আসবে। শীতকালটা এখানে তুমি থাকবে, এ সময়টা আর কোথাও তুমি নড়বে না।

বুঝলাম ঐ নিরাশ্রয় বাউণ্ডুলেটাকে পাণ্ডাজী ভালবেসে ফেলেছেন।

আমি বলেছিলাম—ঠিক কান্‌হাইয়ালাল, পাণ্ডাজীকে তুমি কথা দাও। তা হলে তোমার সাহায্য আমি নেব। আর স্বীকার করো—ফিরবার সময় বাসে আসবে, তার ভাড়া আমি দেব। নইলে দরকার নেই।

সেইটুকু নিতে রাজী হয়েছিল কান্‌হাইয়ালাল।

সবচেয়ে মূল্যবান কান্‌হাইয়ালালের আলাপ। সে আলাপের সঙ্গে আলাপচারী হওয়া আমার মহাভাগ্য। আমি জেনেছিলাম জয়জয়পুরের চাষী পরিবারের ছেলে কান্‌হাইয়ালাল অশিক্ষিত নয়। সেই শিক্ষার সঙ্গে নর্মদা-পরিক্রমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা মিলে কান্‌হাইয়ালাল এক আশ্চর্য মানুষ। উদার তার সঞ্চয়, প্রখর তার স্মৃতি।

অনাবিল সারল্যের সঙ্গে বুদ্ধির প্রাথর্য কান্‌হাইয়ালালের চরিত্রে। তাই তার আলাপ সরসতায় ভরপুর। আমি নীরব প্রকৃতি পূজারী নই। যে স্থান আমার যতো ভালো লাগে, সেখানে আমার ততো মন কেমন করে অচেনা লোককে কাছে ডাকবার জন্যে। এই চারদিন ধরে এই নির্জন নীরব প্রকৃতির মধ্যে সুদীর্ঘ যাত্রার নিঃসঙ্গতার পাত্রকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছে কান্‌হাইয়ালাল। সময়ের দীর্ঘতা আর পথের দূরত্বকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার আনন্দ ভরা আলাপ।

নর্মদা-তীর্থের কতো কাহিনী কিংবদন্তী কতো স্থান-মাহাত্ম্য আমাকে সে শুনিয়ে

চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই আলাপের প্রসঙ্গে আমি বললাম—

আমি কী ভাবছি জানো কানহাইয়ালাল ? যুগ যুগ ধরে কতো তপস্বী, কতো সন্ন্যাসী, কতো মুমুক্ষু এই পথে যাত্রা করেছেন—পথের ক্লেশবিপদের বাধাকে তাঁরা মানেন নি, রেবামন্ত্র তাঁদের আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে।

কান্‌হাইয়ালাল বললে—ঠিকই তো দাদা, মৃকণ্ডুপুত্র থেকে শুরু করে কোটি কোটি ভক্ত পরিক্রমা করেছে বলেই তো নর্মদাতীরে লক্ষ তীর্থের প্রতিষ্ঠা।

আমার মনে হচ্ছে কান্‌হাইয়ালাল, সেই সব অসংখ্য মহাত্মার পদরজ এই পথের ধূলায় মিশিয়ে রযেছে—বাতাসে রয়েছে সেই সব অগণিত পুণ্যাত্মার পবিত্র নিশ্বাস। মহাব্রতের এই মহাক্ষেত্রে আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি !

অনধিকার কেন দাদা ?

আমি তো পরিক্রমাবাসী নই ! আমার অভীপ্সা কই ? নিষ্ঠাই বা কই ? নর্মদা-পরিক্রমার সংকল্প তো আমার নেই !

কান্‌হাইয়ালালের কথায় তার স্বভাবসিদ্ধ সরস কৌতুক আভাসিত হলো। বললে—

মহাত্মা হতে হলে নর্মদা-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে হবে, এ কথা আপনাকে কে বললে ? মহাত্মা আপনিই বা কম কিসে ? এই যে নর্মদার দর্শনপুণ্য লাভের আশায় এতো কষ্ট করে এত দূব থেকে এসেছেন, এই দেহাত জঙ্গলে দিনের পর দিন পায়ে হাঁটছেন—নর্মদামায়ীর কৃপায় আপনার মাহাত্ম্য কি কম হবে দাদা ?

আমি সেই কৌতুক প্রতিধ্বনিত করে বললাম—ঠিকই বলেছ কান্‌হাইয়ালাল। তা ছাড়া আমার মাহাত্ম্যের যেটুকু ঘাটতির সম্ভাবনা ছিল, তা তোমার মতো মহাত্মার সঙ্গলাভে পূর্ণ হয়ে তো গেলই !

কান্‌হাইয়ালাল হেসে বললে—বেশ বলেছেন দাদা। আপনার আমার মাহাত্ম্য থাক—এ কথা কিন্তু সত্য যে মহাত্মাদের কথা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নিয়ে আলোচনা করাও মহত্ত্ব।

আমি সোৎসাহে বললাম—

সেই মহাত্মাদের কথা তুমি কিছু শোনাও কান্‌হাইয়ালাল।

নর্মদা-তীর্থের সাধু মহাত্মাদের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে চলল কান্‌হাইয়ালাল। তার কথায় কথায় কতো পথ যে কখন অতিক্রম করলাম তা মনেও রইল না।

কান্‌হাইয়ালাল বললে—শাস্ত্রে বলেছে দাদা, রেবাতীরে তপঃ কুর্যান্ মরণং জাহ্নবী-

তটে। গঙ্গাতীরে মৃত্যুলাভের আকিঞ্চন সকলে করে, কিন্তু তপস্যাভূমি নর্মদা-তীরে। উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশ ছাড়া ভাগীরথীর তীরে তপস্যার স্থান আর কোথায় আছে বলুন? জননী জাহ্নবীর পদে পদে তো কলের বেড়ি! তটের বুকে কলের খাঁচা, আকাশ জুড়ে কলের ধোঁয়া! কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ নর্মদার উভয় তট আজো সাধু মহাত্মা তপস্বীদের লীলাক্ষেত্র। বর্তমান যুগেও স্থানে স্থানে তাঁদের সাক্ষাৎ আর আশীর্বাদ লাভ করে বিশ্বাসী ভক্তরা ধন্য হয়। তাঁরা অনেকে নর্মদাতটে সিদ্ধি-লাভ করে অন্যত্র যাত্রা করেন, অনেকে নর্মদাতীরেই সারাজীবন অতিবাহিত করেন। পৌরাণিক কালের কথা বাদ দিন—এ যুগের নর্মদাশ্রয়ী মহাত্মাদের কথা কিছু শুনবেন দাদা?

আগ্রহভরে বললাম—বলো কান্‌হাইয়ালাল!

জগদ্‌গুরু শংকরাচার্যের কথা তো আপনি জানেন দাদা। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক—দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গুরু লাভ করেন এই নর্মদা-তীরের ওংকারনাথ মহাতীর্থে। বর্তমান যুগে নর্মদা-পরিক্রমা যাঁরা জাগ্রত করেছেন তাঁদের কথা বলি। শ্রীকমলভারতীজী আর শ্রীগৌরী-শংকরজী মহারাজজীর জীবনকাহিনী শুনুন।

আজ থেকে শ-দুই বছর আগে কমলভারতীজী ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কবে তিনি নর্মদাজীর আহ্বান লাভ করেন, তা জানা নেই। তবে অন্তত তিনবার তিনি নর্মদার পূর্ণ পরিক্রমা করেছিলেন। পরিক্রমাবাসী বিখ্যাত জমাতের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

জমাত কী কান্‌হাইয়ালাল?

জমাত মানে জমায়েত। কমলভারতীজী যখন নর্মদা-পরিক্রমা করতেন, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক সাধু ও ভক্ত যোগ দিয়েছিলেন। সহযাত্রীর দল বাড়তে বাড়তে এক নিত্য-ভ্রাম্যমাণ সাধু-সংঘে পরিণত হয়েছিল। এই পরিক্রমাবাসী সাধু-সংঘের নাম জমাত।

পরিণত বয়সে পরিক্রমার ভার প্রিয় শিষ্য গৌরীশংকরজীর হাতে ন্যস্ত করে মণ্ডলেশ্বরের কাছে মর্কটী-সংগমের ধারে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন। মণ্ডলেশ্বর নর্মদা নদীর উত্তর তটে, ইন্দোর জেলায়। এখানে গুপ্তেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

কয়েক বৎসর এই আশ্রমে অবস্থান করার পর কমলভারতী গেলেন ওংকারেশ্বরে। সেখানে চব্বিশ-অবতারে তিনি নূতন আশ্রম স্থাপন করেন। এই রেবা-কাবেরী সংগমে তিনি নর্মদা-শংকরের পরম প্রসাদলাভ করেন। কমলভারতীজী মহযোগী

ছিলেন। তাঁর স্পর্শে মৃতপ্রায় রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়ে পুনর্জীবন লাভ করত। কায়-কল্পগুণে তিনি চিরস্বাস্থ্যবান দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে শতাধিক বৎসর আয়ু ভোগ করে তিনি দেহরক্ষা করেন।

কান্‌হাইয়ালাল শোনাল—

কমলভারতীজীর হাত থেকে নর্মদা-পরিক্রমার ধ্বজা গ্রহণ করলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য গৌরীশংকরজী মহারাজ। গৌরীশংকরজী নর্মদামাতার নামে আকাশবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। আকাশবৃত্তি কাকে বলে জানেন দাদা ?

না, তুমি বলো কান্‌হাইয়ালাল।

নর্মদার তীরে তীরে সারাজীবন অতিবাহিত করবেন, এই ছিল তাঁর ব্রত। জীবনে কোনো স্থায়ী আশ্রমে বা গৃহে বাস করবেন না, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। সমস্ত জীবন ধরে তিনি নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে নর্মদা তীরবর্তী কোকসর গ্রামে তিনি লীলাসংবরণ করেন। গৌরীশংকরজী বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ নর্মদাবাসী।

তাঁর এই নিরন্তর নর্মদা-পরিক্রমার দলভুক্ত হতে হতে ক্রমে এক বিশাল সাধু ও ভক্ত জমায়েত সৃষ্ট হয়। গৃহী ও সন্ন্যাসী, ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও ভিখারী এই জমায়েতে যোগ দিয়ে ধন্য হতেন। বিশাল জমায়েত নিয়ে গৌরীশংকরজী পরি-ক্রমা করতেন। শত শত লোক তাঁর সঙ্গে চলত, হাতী, ঘোড়া, উট ও নিশান-ধারীর দল।

পরিক্রমাবাসীদের কোনো আহার্যের সঞ্চয় সঙ্গে রাখতে 'নেই। নিতান্ত গভীর পার্বত্য ও অরণ্যপথে তাঁরা ঝুলির মধ্যে ক-মুষ্টি আটা রাখতে পারেন—সেই সঞ্চয়ও দুদিনের বেশি সময়ের জন্য নয়।

গৌরীশংকরজীর বিশাল জমায়েতের খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য পথে কোনো কষ্ট হতো না। বহু দানশীল ধর্মশীল সজ্জন লোক এই জমায়েতের সেবা করে কৃতার্থ হতেন। বর্ষাকালের মাস চারেক তিনি পথপ্রান্তবর্তী কোনো আশ্রমে বা কাননে আশ্রয় নিতেন। এই চার মাসের অস্থায়ী অবস্থানকে চাতুর্মাস্য বলা হয়। গৌরী-শংকরজী যেখানে চাতুর্মাস্য পালন করতেন সেখানে মহোৎসবের সাড়া পড়ে যেন। দূর দূর থেকে ভক্তদল আসত। অনাথ আতুররা ভিড় করত। অস্থায়ী তাঁবু, দোকান বাজার লাগত। বিশাল সাধু জমায়েতের সেবার কোনো অসুবিধা হতো না। বরং বহু পাপীতাপী আর্ত-পীড়িত গৌরীশংকরজীর প্রত্যক্ষ করুণায় ভাগ্যবন্ত হতো।

বহু বছর ধরে নর্মদা-পরিভ্রমণ করতে করতে গৌরীশংকরজীর একবার উন্মাদ

অবস্থা হয়। কখনো সুস্থ, আবার কখনো মস্তিষ্কবিকৃতির পূর্ণ লক্ষণ।
শিশুর মতো সরল মন ছিল গৌরীশংকরজীর। বড়ো অভিমান বাজল মায়ী নর্মদার উপর। মা, আমার গৃহ নেই, সংসার নেই, আশ্রম নেই— সারাজীবন তোরই কূলে কূলে ঘুরলাম, তোরই কোলে রইলাম! আর তুই কিনা শেষ পর্যন্ত আমাকে পাগল করে দিলি?
মায়ের উপর সন্তান রেগে আগুন! সারা নর্মদাতীরে যতো মাতৃ-মন্দির আছে, যতো দেববিগ্রহ আছে, সব ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে— আত্মভ্রষ্ট উন্মাদের এই পণ! ধরে রাখবে, বেঁধে রাখবে, এমন সাহস কার?
শেষ পর্যন্ত এক অলৌকিক প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি ছুটলেন অমরকণ্টকে, নর্মদার উৎসমুখে। সেখানে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় পড়ে আছেন, এমন সময় রেবা-মায়ী ঔষধ-বিভূতি বেখে গেলেন তাঁব আসনের পাশে। সেই মাতৃ-বিভূতি সর্ব-রোগেব ধন্বন্তরী।
সেই বিভূতি ব্যবহারে অচিরে সুস্থ হলেন গৌবীশংকবজী।

কানহাইয়ালাল বললে—শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের নাম শুনেছেন তো?
আমি বললাম—বালানন্দ ব্রহ্মচারীর তিনি গুরু ছিলেন না?
ঠিক বলেছেন। উজ্জয়িনী শিপ্রানদীর তীব থেকে বালক বালানন্দ মাত্র ন-বছর বয়সে মুমুক্ষু আবেগে ছুটেছিলেন নর্মদা তীরে। সেখানে গঙ্গোনাথ তীর্থে তিনি গুরু লাভ করে ধন্য হন। সেই গুরু ব্রহ্মানন্দ। নর্মদাতীরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী।
আমি বললাম—ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কথা আমাকে শোনাও কানহাইয়ালাল।
বড়ো বিচিত্র ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন। তিনি উত্তর প্রদেশে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী বালগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে পঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিংহেব সৈন্যদলে যোগ দেন। যুদ্ধান্তে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সংসারে না ফিরে সন্ন্যাসী হয়ে যান।
ভারতের চতুর্ধাম আর প্রধান তীর্থাবলী পরিভ্রমণ করার পর তিনি নর্মদা-পরিক্রমায় ব্রতী হন। শেষ পর্যন্ত বরোদার দক্ষিণে নর্মদার উত্তরতটে গঙ্গোনাথ তীর্থে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন ও এখানে জীবনের শেষ ষাট বৎসর অতিবাহিত করেন। একশো পঁচিশ বছর বয়সে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।
কানহাইয়ালাল বললে—অন্নপূর্ণাসিদ্ধি কাকে বলে জানেন দাদা? অন্নপূর্ণামায়ীর পূর্ণ দয়া যিনি লাভ করেন, তাঁকে বলা হয় অন্নপূর্ণাসিদ্ধ। কমলভারতীজী ছিলেন অন্নপূর্ণাসিদ্ধ। নর্মদা-পরিক্রমাকালে এক দুর্গম স্থানে কোনো খাদ্য পাওয়া গেল

না। কমলভারতীজীর সহযাত্রীরা উপবাসে কাতর। কমলভারতী তখন এক শূন্য পাত্রের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সকলের উপযোগী আহার্য পরিবেশন করলেন।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজও ছিলেন অন্নপূর্ণাসিদ্ধ। তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল সেবা। সাধুসন্ত, পরিক্রমাবাসী, আতুর ভিক্ষুক যে তাঁর আশ্রমে আসত, তাকে পেট ভরে খাইয়ে ছিল তাঁর আনন্দ। প্রতিদিন অন্তত দুশো জন করে তাঁর আশ্রমে ভোজন করত। সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে তিনি দিনান্তে নিজ হাতে দুটি রুটি বা একদলা নরম খিচুড়ি বানিয়ে একবেলা খেতেন। একদিন গভীর রাত্রে তিনি আশ্রম থেকে শুনতে পেলেন দূরে হর-হর-নর্মদে ধ্বনি। বুঝলেন এই ধ্বনি নদীর ওপারে কোনো সাধু-সজ্জন পরিক্রমাবাসী দলের।

ছুটে বার হলেন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। গেলেন নর্মদার ঘাটে। পারানি নৌকার মাঝিকে ডেকে অনুরোধ করলেন ওপারের পরিক্রমাবাসীদের জন্যে কিছু আহার্য নিয়ে যেতে। তখন বর্ষাকাল, নর্মদায় খরস্রোত। অত রাত্রে নদী পার হতে অস্বীকার করল মাঝি।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দজীর আকুলতা তাতে নিবৃত্ত হবার নয়। তিনি যে মন করেছেন পর-পারের তীর্থযাত্রীদের আজ রাত্রে খাওয়াবেনই। কোনো বাধা তিনি মানবেন না। দশবারো জনের মতো আহার্য সযত্নে বেঁধে নিয়ে তিনি নর্মদাসলিলে ঝাঁপ দিলেন। সাঁতরে নদী পার হয়ে পরিক্রমাবাসীদের কাছে খাদ্যসম্ভার পৌঁছে দিয়ে এলেন।

ব্রহ্মানন্দের ভাণ্ডার ছিল তাঁর ভিক্ষার ঝুলি। মাধুকরী ছিল তাঁর নিত্য ব্রত। এক-দিন আশ্রমের ভাণ্ডারে সঞ্চিত কিছুই নেই—হঠাৎ দু-তিনশো পরিক্রমাবাসীর এক জমায়েত তাঁর আশ্রমে উপস্থিত। কী করে তাঁদের সেবা করবেন তাই ভেবে আশ্রমবাসী শিষ্যরা আকুল। ব্রহ্মানন্দ নিশ্চিন্ত হাসিমুখে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি উজাড় করে দিলেন। তিনশো জনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী সেই ঝুলি থেকে বার হলো।

দুর্ভিক্ষ বা বন্যার সময় শত শত অনাথ তাঁর আশ্রমদ্বারে ভিড় করত। তিনি মুক্ত হস্তে সকলকে খাদ্যদান করতেন। অন্নের অভাবে কোনো প্রার্থী তাঁর আশ্রম থেকে কখনো ফিরে যায় নি। শোনা যায় একবার তাঁর কাছে প্রার্থী হয়েছিলেন বরোদার রাণী।

ভিক্ষা করে তিনি ফিরছেন। এক গ্রাম্য চাষী তাঁর ভিক্ষার ঝুলি শাকসব্জী দিয়ে ভর্তি করে দিল। সেই ভিক্ষাঝুলি সঙ্গে নিয়ে তিনি গেলেন বরোদার রাজ-প্রাসাদে।

রাণী তাঁকে বললেন—মহারাজ, আপনার ঝুলি তো আজ পূর্ণ। ঐ ঝুলির প্রসাদ আমি কিছু পাব না ?

ব্রহ্মানন্দ বললেন—নিশ্চয় পাবে মা। বলো—কী খেতে তোমার ইচ্ছে ?
রাণী চাইলেন মহারাজকে অপ্রতিভ করতে। কৌতুকচ্ছলে বললেন—পাকা আঙুর খেতে বড়ো ইচ্ছে করছে বাবা ?
গ্রাম্য চাষীর দেওয়া শাকভর্তি ঝুলির মধ্যে হাত পুরে দিলেন ব্রহ্মানন্দ। একগুচ্ছ পরিপুষ্ট পাকা আঙুর বার করে রাণীর হাতে তুলে দিলেন। স্মিতহাস্যে বললেন—এই নাও মা, নর্মদামায়ীর আশীর্বাদে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।
ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিক্ষার ঝুলিতে ছিল জগজ্জননী অন্নপূর্ণার বসতি।
ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে গৌরীশংকরজী মহারাজের গভীর প্রণয় ছিল। কিশোর শিষ্য বালানন্দকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষাদানের পর ব্রহ্মানন্দ তাঁকে গৌরীশংকরজীর হাতে তুলে দেন। বালানন্দ গৌরীশংকরজীর সঙ্গে নর্মদা-পরিক্রমায় রত হন। ব্রহ্মানন্দ ছিলেন বালানন্দের দীক্ষাগুরু। গৌরীশংকরজী বালানন্দের সাধনপথের শিক্ষাগুরু। বালানন্দ গৌরীশংকরজীর সঙ্গে প্রায় সাত বছর নর্মদা-পরিক্রমা করেন।
কেবল বালানন্দ ব্রহ্মচারীই নন, গৌরীশংকরজীর নর্মদা-পরিক্রমার আহ্বানে সারা ভারতের নানা স্থানের কতো সাধু তপস্বী যে জমায়েত হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের অনেকে নর্মদাব্রত সম্পন্ন করে ভিন্নভিন্ন স্থানে ফিরে গেছেন। অনেকে আবার নর্মদামায়ীর স্নেহচ্ছায়াতেই মরজীবন অতিবাহিত করেছেন। নর্মদাশ্রয়ী মহাত্মাদের মধ্যে শ্রীনর্মদানন্দজী, শ্রীকাশীনন্দজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দজী, শ্রীকেশবানন্দজী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মাথায় খাপরার চাল। তিন দিকে বাঁশের বেড়া। মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। কুণ্ডের মুখে দু-পাশে মোটা কড়া লাগানো ইয়া কড়াই। কড়াইতে ফুটছে মহিষের ঘন দুধ। কড়াই-এর গায়ে গায়ে দু-তিনটি বড়ো কেটলি। তাতে ফুটছে চা।
বাঁশের দেয়ালের গা থেকে থাকে থাকে নেমে এসেছে ভূষির বস্তা। এক কোণে মোটা মোটা জ্বালানি কাঠ, আর এক কোণে খড়ের বাণ্ডিল। চাল থেকে লোহার শিকে ঝুলছে এক জোড়া হারিকেন লণ্ঠন।
চার পাঁচজন বলিষ্ঠ কৃষ্ণদেহ অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। দেহাতী গোঁড় ওরা। যুবা বৃদ্ধ উভয়েরই কঠিন চেহারা—থামের মতো পা, থাবার মতো হাত। হাঁটুর উপর কাপড়, গায়ে মোটা ফতুয়া—কারো গায়ে গাঁয়ে-বোনা দোসূতির রুক্ষ চাদর।
আঠারো বিশ বছরের একটা জাঁদরেল ছেলে দলে আছে। খালি গা, কানে মাথায় একটা ফেট্টি জড়ানো। লোহার একটা মস্ত বারকোশের সামনে উবু হয়ে

বসে সজোরে একটা আটার তাল মাখছে। তিনটে ফুটবল এক করলে যতো বড়ো হয়, ততো বড়ো তালটা। মাখছে না, যেন কুস্তি করছে। বুকের পেশী হাতের গুলি ফুলে ফুলে উঠছে। কাঁধের উপর এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম চিকচিক করছে লণ্ঠনের আলোয়।

দলে আছে চালার মালিক, কজন গোয়ালা, কজন কাঠুরে। কুস্তিলড়া জোয়ান ছেলেটা আর তার চাদরমুড়ি দেওয়া খুড়ো জঙ্গল থেকে কাঠের গুঁড়ি কেটে মহিষের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে এসেছে। কাল যাত্রা করবে ডিণ্ডোরীর পথে। আর আছি আমি আর কানহাইয়ালাল।

অন্ধকার ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে শীতও ঘনিয়ে আসছে জবর। খাসা আস্তানাটি পেয়েছি। কান্‌হাইয়ালাল উবু হয়ে বসেছে একটা আবলুস গুঁড়ির উপর, আমি পিঠ এলিয়ে দিয়েছি ভূষির বস্তার গায়ে। মহিষের ঘন দুধের গরম চা একবার হয়েছে। আর একবার হবে, কেটলি তাতছে। বেশ গল্প জমেছে। গল্প ফুরোতে না ফুরোতে গরম হাত-চাপাটি, শাক আর এক হাতা করে ভঁইসা ক্ষীর।

ভিন্‌গ্রামের বুড়ো গোয়ালাটা জমিয়েছে বেশ। তার গাঁয়ের এক দাই-বুড়ির গল্প বলছে যে হঠাৎ একদিন ডাইনী হয়ে গেল।

বলে—কী সাফ হাত ছিল বাবুজী, কী নিখুঁত কাম। সারা গাঁয়ে যার ঘরে বাচ্ছা হতো বুড়িকে ডেকে নিয়ে যেত। আর কী দরদ! দিনে রাতে কখনো না বলত না। পেটমে হাত বুলায়ে বাচ্চা নামিয়ে আনত, মাভী টের পেত না। একদিন সাঁঝবেলায় বুড়ো আমলকী গাছের হাওয়া লাগল, একদম ডাইন বনে গেল!

ডাইন বনে গেল মানে?

মানে আর কী? মাথা নাড়ে, চুল ওড়ায়। বনবন করে আঁখ ঘোরায়, দাঁত কিড়-মিড় করে। বাত বোলে না, খালি হাঁউহাঁউ করে, আর বাচ্চা ছেলিয়া-মেয়ে দেখলে মারতে যায়!

কান্‌হাইয়ালাল মৃদু হেসে বললে—তব ক্যা হুয়া?

আর কেয়া হোগা, বুড়ো বললে—গাঁয়ের লোক ডাইনি বুড়িকে ধরে হাত-পা বেঁধে জঙ্গলে ফেলে এলো, সেখানে জঙ্গলকা শের তাকে খেয়ে নিল।

তারপর?

তারপর শেরভী বাউরা হোয়ে গেল! হর্‌ রাত গাঁয়ের মধ্যে ঘোরে, আর বাচ্চা ধরে ধরে খায়! আদমিকা বাচ্চা বকরিকা বাচ্চা, জো হো। কেউ সে বাঘ মারতে পারল না! জব্বলপুর থেকে এক সাহেব এলো। বড়া শিকারী, শির্‌ মে টোপি, হাত মে বন্দুক! সাত আটটা গোলি মারল, উস্‌কা সব গোলিভী শেরটা খেয়ে

লিল!

আটা-মাখিয়ে ছোকরাটা হোহো করে হেসে উঠল। বললে—ভাগ্ বুড়া, কোঈ মর্দানা বন্দুকসে বাঘ মারে?

বন্দুকসে মারে না? কী করে মারে তাহলে?

টাঙ্গিসে মারে।

টাঙ্গিসে?

জরুর! আরে ভঁইসকা দুধ নিকালনেওয়ালা গোয়ালা তুই বুড়া—টাঙ্গিকী হিম্মত তুই কি বুঝবি? জঙ্গলকে সাথ যে লড়াই করে, সেই বোঝে!

আর এক গোয়ালা বললে—আচ্ছা শুনা তেরি টাঙ্গিকী হিম্মতকী বাত!

টাঙ্গিকী হিম্মত কেয়া রে! রাত ভর জঙ্গলের মধ্যে কাঠভর্তি গাড়ি আমি চালাই! হাতে থাকে টাঙ্গি। টাঙ্গির ফলা জ্বলে আর আমার চোখ জ্বলে। কোন্ শালা বাঘ সামনে আসবে? স্রিফ আওরত কী হিম্মতকী এক কহানী শোন্!

ছোকরা ময়দার তালে দমাদ্দম কটা রদ্দা লাগাল। তারপর শুরু করলে—

আমার গাঁয়ের দুটো মেয়ে বিকেলবেলা জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গেছে। একজনের হাতে টাঙ্গি, একজনের হাতে দড়ি। টাঙ্গি দিয়ে ছোট ছোট ডাল কাটবে, আর দড়ি দিয়ে আঁটি বেঁধে নিয়ে আসবে। সুরয ডুবে গেছে, জোয়ানী মেয়ের ভয়ডর নেই। টাঙ্গিওয়ালী ডালগুলো মাপে মাপে কাটছে, আর হাত বিশ দূরে দড়িওয়ালী একটা আঁটি বাঁধছে। এমনি সময় এক বাঘ লাফিয়ে এলো দড়িওয়ালীর সামনে!

সর্বনাশ, তারপর?

আমার গাঁয়ের লেড়কী মূর্ছা যাবার নয়। এক লাফে সে একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে দাঁড়াল। আর সোজা চোখ রাখল বাঘের চোখের ওপর। এক ধারে লেড়কী, একধারে বাঘ, মাঝখানে সাজা গাছের কালো মোটা গুঁড়ি। বাঘ যতো ঘোরে, সেও ততো ঘোরে। মাঝখানে গুঁড়িটার পাহারা। বাঘ আর তাকে ধরতে পারে না।

বাঃ বাঃ, কেয়া আজব!

মেয়েটা চিৎকারও করছে না। চিৎকার শুনলেই অন্য মেয়েটা দেখতে পেয়ে ছুটে আসবে, আর বাঘ ঘুরে গিয়ে এক লাফে তাকে ধরবে! এদিকে বাঘ বেটার জিভ দিয়ে জল ঝরছে। কতোক্ষণ সে ছুকরির সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে? বিরক্ত হয়ে সে ইয়া একটা লাফ মারল। মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে আড়াল হলো গুঁড়ির পিছনে। বাঘের বুকটা ধাক্কা খেয়েছে গুঁড়িতে। তার সামনের পা-দুটো বেরিয়ে আছে গুঁড়ির দু-পাশ দিয়ে। ঝট্ করে মেয়েটা বাঘের দুটো থাবা দু-হাতে চেপে ধরল।

তারপর প্রাণপণে থাবা দুটোকে টেনে রেখে ফুকার দিতে লাগল!

সাবাস, সাবাস!

দুসবী লেড়কী ছুটে এসে দেখে বাঘ তো বন্দী হয়ে আছে! হাতের টাঙ্গিটা উঁচু করে সে তুলে ধরল। তারপর টাঙ্গি দিয়ে তিন চার ঘা মেরে শালা বাঘের মাথাটা ছাতু করে দিল।

এই আশ্চর্য বীরত্বকাহিনী শুনে শ্রোতারা সবাই সরবে তারিফ করলাম। বক্তা আটার তালে একজোড়া ঘুষি মেরে বললে—হাঁ, এই হলো টাঙ্গিকী হিম্মত, আর লেড়কীকী হিম্মত। আমার গাঁওকী লেড়কী!

কান্‌হাইয়ালাল মাথা নেড়ে বললে—

এইখানেই গল্প তো শেষ হলো না বাপধন! তুমি তো তোমাব গাঁওকা সব্‌সে জোয়ান মর্দানা—ঐ দুই লেড়কীকেই তুমি সাদী করলে?

জংলি কাঠুরে যুবকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বললে—ঐ দড়িওয়ালীর সঙ্গে আমার পেয়ার ছিল। কিন্তু সাদী করব কী করে? বাঘটা পডবার আগে ওকে শেষ ঝটকা দিয়েছিল যে!

অ্যাঁ, মেরে ফেলেছিল মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত?

না মরে নি। মলহম দাওয়াই দিয়ে সেরে উঠেছিল। কিন্তু এক থাবায় ওর দুটো বুকই খসিয়ে দিয়েছিল শালা বাঘ।

কান্‌হাইয়ালাল কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু অপেক্ষা করে বললে—আর টাঙ্গি-ওয়ালী, তাকেও তো বিয়ে করলে পারতে?

এবার উত্তর দিল ছেলেটার খুড়ো। এতোক্ষণ সে কোনো কথা বলে নি, এবার যেন চিডবিড়িয়ে উঠল। বললে—

উ লেডকীটার বাপ ছিল না, ছিল চাচা। শালা চাচার কী গরম! বললে—উর সাথে যার সাদী দেবে তাকে উস্‌কা ক্ষেতিমে সাত বরষ বেগার খাটতে হবে। আমার ভাইপো মাঠে বেগার খাটবে? জঙ্গল ছেড়ে? সাত বরষ? একটা মেয়ে-ছেলিয়ার জন্যে?

এতোক্ষণে কেটলির চা টিনের গ্লাসে গ্লাসে প্রত্যেকের হাতে হাতে এসেছে। কান্‌হাইয়ালাল তার বিডির বাণ্ডিলটাও ঘুরিয়ে এনেছে প্রত্যেকেব সামনে দিয়ে। উনুনের মুখ থেকে দুধের কড়াটা নেমেছে। এবার রুটি সেঁকা হবে।

চমৎকার আরামদায়ক উষ্ণতা।

১৫

আজ সন্ধ্যায় কিন্তু রাজকীয় বিলাস। প্রাসাদোপম অট্টালিকার আলোকোজ্জ্বল উষ্ণ কক্ষ। পায়ের নিচে নরম গালিচা, কাঁচের ঝকঝকে শার্সি লাগানো মেহগনি রঙের পালিশ করা সেগুন-ফ্রেমের দরজা-জানলায় রঙিন পুরু পরদা। স্প্রিং-এর খাটে ডানলোপিলোর গদি, কেম্ব্রিকের দুগ্ধশুভ্র চাদর। রাইটিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, ড্রেসিং টেবিল। কুশন-আঁটা চেয়ার, হেলান দেওয়ার আরাম-কেদারা। পাশেই মস্ত স্নানাগার। সাদা ধবধবে তার মসৃণ মেঝে-দেয়াল। মাথার উপর শাওয়ার, নিচে বাথ-টাব। আয়না, টাওয়েল-র‍্যাক, পরিচ্ছন্ন কমোড। একপাশে মোটা রাবার ম্যাট।

আলনায় ঝুলছে আমার স্ফটিক-শুভ্র করে কাচা টেরিলিনের শার্ট। নিচের শু-র‍্যাকে চকচকে পালিশ করা আমার জুতো।

সূর্য কিছুক্ষণ হলো অস্ত গেছে। এখনো শীত জমে নি। সামনের প্রশস্ত বারান্দায় টিউব লাইটের তলায় আরাম-কেদারায় বসে আছি। সরকারী ভৃত্য আমার শার্ট কেচে জুতো পালিশ করে আমার আসনের সামনে নিচু টেবিল পেতে সসম্ভ্রমে সেলাম করে সবে বিদায় নিয়েছে। ট্রে-তে গরম কফি সাজিয়ে সামনে খাড়া হয়েছে উর্দিপরা খানসামা। টেবিলে কফি দুধ আর চিনির পাত্র সাজাতে তার আঙুল-গুলো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

খানসামার অপরাধ নেই। জীপ-গাড়ি হাঁকিয়ে আসা জবরদস্ত সরকারী অফিসারকে যে ভাবে আমি ঘায়েল করেছি তা দেখে বেচারী সত্যিই দারুণ ঘাবড়ে গেছে। নিজের কৃতকার্যতায় আমিই কি কম ঘাবড়ে গেছি? প্রায় দু-সপ্তাহ অরণ্য-বাসের পর জংলী পরিব্রাজক আমি—যে আরামের আয়োজন ও ভোগের আতিশয্যের গভীরে আশ্রয় পেয়েছি, তাতেও কি কিছুটা হাঁফ ধরছে না?

কবীর-চবুতরার পর থেকে মান্দলা জেলা। কুকরীমঠ ছেড়ে ডিণ্ডোরী। সেখান থেকে পাকা রাস্তায় পৌঁছে পাবলিক বাস। সেই বাসে উঠে জেলা শহর মান্দলায় পৌঁছলাম। বেলা তখন তিনটে সাড়ে-তিনটে।

মেকল পার্বতসানুর গভীর অরণ্য অতিক্রম করে এসেছি। বাস চলেছে নর্মদা-উপত্যকার উপর দিয়ে। শুকনো লাল পাথুরে মাটি। মাঝে মাঝে সবুজ আবাদ।

বাস চলেছে সোজা পশ্চিম দিকে। আমার ডান ধারে দূরে নর্মদার স্রোতোরেখা মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে— রৌদ্রে চিকচিক করছে রূপালী পাড়। তার ওপারে দিগন্ত আড়াল করে বিন্ধ্য পর্বতমালার নীলাভ-ধূসর সুদীর্ঘ প্রাচীর। বাঁদিকে সাতপুরা পর্বতমালা। দুই পর্বতমালার মাঝখানে নর্মদা-উপত্যকার দীর্ঘ পশ্চিম-মুখী গতিকে উপলব্ধি করতে করতে চলেছি। ঢালু রাস্তার সুযোগ নিয়ে বাস ছুটেছে প্রবল গতিতে।

মান্দলা জেলার একটি প্রধান শহর ডিণ্ডোরী। নর্মদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ডিণ্ডোরী থেকে তিনটি পাকা রাস্তা। পূর্ব দিকে অমরকণ্টক পর্যন্ত একষট্টি মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দলা পর্যন্ত চৌষট্টি মাইল। আর নর্মদা অতিক্রম করে শহপুরা হয়ে পশ্চিমে জব্বলপুর পর্যন্ত নব্বই মাইল। ডিণ্ডোরীতে ডাক-বাংলা, পুলিশ-থানা, ডাকঘর, হাসপাতাল আছে।

ডিণ্ডোরী থেকে নর্মদা নানা ছোট ছোট বাঁক নিয়ে সিবনী নামক একটি ছোট গ্রামকে ডান ধারে রেখে দক্ষিণমুখী গতি নিয়েছে। বাস-রাস্তা নর্মদার কাছাকাছি দিয়ে যায় নি, ডিণ্ডোরী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাতপুরা পর্বতমালা ভেদ করে চলে গিয়েছে।

গ্রামের নাম সকল। এখানে নর্মদা-উপত্যকার মনোমুগ্ধকর রূপ। তার পরই সাত-পুরার পাহাড়ী ঘাটের শুরু। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, আর বন আর বন। এক পাহাড়ের গা বেয়ে আর এক পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে কোথাও অরণ্যঢালুকে বাঁদিকে কোথাও ডান দিকে রেখে বিপজ্জনক আঁকাবাঁকা পথে বাস চলেছে। মাঝে কোথাও চুলের কাঁটার মতো রোমহর্ষক বাঁক, কোথাও ছবির মতো জংলী গ্রাম, কোথাও পথের পাশে বা পথের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে কুলুকুলু ঝরনাধারা।

দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ চাবী গ্রামের গায়ে বাস দাঁড়াল। পাহাড়ী ঢালুতে কয়েকটি কুটীর। তাদের মধ্যে দুটি দোকান। সুন্দর একটি পি-ডবলু-ডি বাংলো দোকানে মিলল চা, সিগারেট তেলেভাজা বড়া, শুকনো লাড্ডু আর মিগোনো নামকিন।

ডিণ্ডোরী-মান্দলার পথে এই সাতপুরা ঘাট প্রায় ত্রিশ মাইল। ঘাট শেষ হলো দক্ষিণগামী নর্মদার কাছে এসে মানোট বলে একটি জায়গায়। এখানে পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে প্রশস্ত নর্মদার উপর একটি চমৎকার পাকা পুল। এই পুল অতিক্রম করার পর বাস নর্মদার উত্তর তীর ধরে চলল, পথে পৌড়ীগ্রাম। মানোট থেকে আঠারো মাইল দূরে নর্মদার উত্তর তটে মান্দলা।

মান্দলা গ্রাম নয়, অরণ্য নয়, পাহাড়ী আশ্রম নয়। মস্ত শহর। মান্দলা জেলার হেডকোয়ার্টার। চওড়া চওড়া রাস্তা, বড়ো বড়ো সরকারী দপ্তর আর বাংলো। পুরোনো শহরে ঘিঞ্জি মহল্লা, দোকান-পাট, বাজারে গিজগিজে লোক। পাহাড় বন পার হয়ে এই অচেনা শহরে দিনান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। অচেনা লোককে রাতের আশ্রয় দেবে কে ?

এতোদিন যে অরণ্য-পাহাড়ে ঘুরেছিলাম, আশ্রয়ের অভাব হয়েছিল ? আশ্রয়ের ভাবনা কি ভেবেছি একদিনও ? দিনান্তে ঠিক জুটে গেছে। অতিথিশালায়, সাধুর আশ্রমে, মন্দিরের চাতালে, পল্লীবাসীর কুটীরে। শংকরের ভরসাতে পথ চলেছি, শংকরই রেখেছেন। এখানেও বিশ্বাস আছে তিনিই রাখবেন।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে রিকশা নিয়ে নূতন শহরে প্রবেশ করলাম। পিচ ঢালা মসৃণ চওড়া রাস্তা। দু-ধারে বাগিচাওয়ালা বড়ো বড়ো বাংলো। রাস্তার ধারে ধারে দেবদারু ইউকালিপটাস গাছ। রিকশাওয়ালা চিনিয়ে নিয়ে পৌছল সরকারী পূর্ত বিভাগের প্রধান দপ্তরের সামনে।

দপ্তরে প্রবেশ করলাম। প্রথম দেখা কর্মচারীটির সামনে গিয়ে কট্টর উচ্চারণে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলাম—

মিস্টার শংকর ভট্টাচার্য আছেন ? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

কর্মচারীটি টেবিল গুছোচ্ছিল। দিনের কাজ প্রায় শেষ। একটু পরেই দপ্তর বন্ধ হবে। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে—তিনি তো নেই।

কোথায় তিনি ? বাংলোতে ? তাঁর বাংলোটা দেখিয়ে দিতে পারেন ?

একটু চমকাল লোকটি। বাংলোয় যেতে চাইছে, নিশ্চয়ই সাহেবের খুব চেনা লোক। উঠে দাড়াল। একটু আমতা-আমতা করে বললে—আজ্ঞে না স্যার। তিনি জব্বলপুর গেছেন। ফিরতে দিন দুই দেরি হবে।

তূণ থেকে দ্বিতীয় বাণটি তুলে আমি নিক্ষেপ করলাম।

কী লজ্জা, কী দুঃখের কথা ! তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এতো দূর থেকে আমি আসছি, আর তিনি কিনা নেই !

কম্বল আর ঝুলিটা অবশ্য রিকশাতেই রেখে এসেছি। আমার কালো পাতলুন, গলাবন্ধ ভুসো কোট আর গেরুয়া টুপি দেখে কর্মচারীটি কী ভাবল কে জানে। সমীহ করে প্রশ্ন করল—আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার ?

কোথা থেকে ? বাংলাদেশ থেকে মশাই, কলকাতা শহর থেকে !

ভদ্রলোক আরো বিনীত হলো। বললে—তা হলে আপনি স্যারের দেশের লোক ?

আমি হেসে বললাম—তা বলতে পারেন। কিন্তু এতো দূর এসে দেশের লোকের দেখা পেলাম না, সেইটেই যে দুর্ভাগ্য—

কালকের দিনটা যদি অপেক্ষা করেন তা হলে দেখা পাবেন। উনি বোধহয় কাল রাত্রেই ফিরবেন।

আমি বললাম—অল রাইট। তাই দেখছি করতে হবে। আপনাদের শহরে ভালো হোটেল আছে?

হোটেল কেন, স্যার? আমাদের রেস্ট হাউসে থাকবেন আপনি। এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ঠিক এইটাই চাইছিলাম।

রেস্ট হাউসে একটি ছাড়া সব কটি ঘরই বুক করা। জবরদস্ত সামরিক বেসামরিক অফিসারদের জন্যে। বাকি ঘরটি বুক হলো আমার নামে। সৌজন্যপরায়ণ কর্মচারী ভদ্রলোকটি নিজে এলো রেস্ট হাউসে আমার সঙ্গে। যথাযোগ্য ধন্যবাদ নিয়ে বিদায় নেবার সময় বড়া খানসামাকে ডেকে সাবধান করে বললে—

খবরদার, সাবকো ঠিকসে দেখ না। বড়া সাব্‌কা দোস্ত্‌ হ্যায়!

জুতোজোড়া খুলে সবে ডানলোপিলোর গদিতে একটু গড়িয়েছি—রেস্ট হাউসের গেটের মধ্যে মোটরগাড়ি ঢুকবার শব্দ হলো। অনেক লোক বোধহয় গাড়ি থেকে নামল—পুরুষকণ্ঠ, নারী ও শিশুর কণ্ঠ। সোরগোল, হাঁকডাক—বেয়ারা, চাপরাসী, খানসামা!

কয়েক মিনিট পরে পরদা ঠেলে আমার ঘরে প্রবেশ করল একটি জাঁদরেল চেহরোর প্রৌঢ় লোক। কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল, পরনে খাকি পাতলুন, খয়েরী বুশশার্ট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি একটু বাইরে আসবে?

বারান্দায় গেলাম। লোকটি ঘোষণার মতো করে বললে—আমি অমুক ডিপার্টমেন্টের অমুক অফিসার। তুমি কে জানতে পারি?

আমি ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলাম, বললাম—খুশি হলাম তোমার পরিচয় শুনে। আমি একজন টুরিস্ট।

আমার সঙ্গে আর দ্বিতীয় কথার দরকার নেই। হাতে হাত মেলানো তো প্রশ্নেরও বাইরে। পিছনের ভৃত্যটাকে হাঁক দিয়ে বললে—ই কামরামে সামান সব রাখো। ভদ্রলোকের মোটা গিন্নী আর একজোড়া বাচ্চা সুড়সুড় করে আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বাকি পরিজনরাও এগিয়ে এলো কয়েক পা।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম—ব্যাপার কি?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। তারপর নির্লিপ্ত গম্ভীর গলায় বললে—

আমি এ ঘরটায় থাকব, তোমার মালপত্র তুমি সরিয়ে নিতে পারো।

বড়া খানসামা সোরগোল শুনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা—

খাড়া হোকর ক্যা দেখতা বুদ্ধু—যাও অন্দর, বড়া পট চায় বানাও তুরন্ত্!

আমি লোকটার দুর্বিনীত উদ্ধত ব্যবহারে অবাকই হয়েছিলাম।

বললাম—তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনে, এ ঘরে আমি আছি,তোমাকে ছেড়ে দেব কেন?

ছেড়ে দেবে কেন? ছেড়ে দেবে এই জন্যে যে, আমি সরকারী অফিসার, আমি এখানে থাকব বলে! বুঝেছ?

অন্য ঘরে যাও না!

অন্য ঘর সব রিজার্ভ করা আছে।

চাকরটা মাল নিয়ে ঘরে ঢোকবার আয়োজন করছিল। আমি এক ধমকে তাকে দূরে হটালাম। অসভ্য আগন্তুককে হেঁকে বললাম—

এ ঘর তোমার রিজার্ভ করা ছিল না। রিজার্ভ হয়েছে আমার নামে। সেই রিজার্ভেশন ক্যানসেল করিয়ে নিজের নামে করিয়ে নিয়ে এস—তারপর ঢুকবার চেষ্টা করো।

লোকটা খুব বিরক্ত হলো। তাচ্ছিল্যভরা ক্লান্ত গলায় বললে—

ছ্যাখো মিস্টার, আমার আরদালী দিয়ে তোমার সব মাল আমি বাইরে ফেলে দিতে পারি। তবে তুমি যখন ইংলিশ বলছ, তোমাকে শিক্ষিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। আমি টুর করতে করতে এখানে এসেছি। আজ রাত থেকে কাল জব্বলপুর যাব। আমি সরকারী অফিসার, রেস্ট হাউসে সরকারী অফিসারদের পয়লা অধিকার।

আমিও তেমনি কঠোর অথচ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললাম—

ছ্যাখো মিস্টার, সরকারী জীপে সরকারী তেল পুড়িয়ে তুমি এসেছ বটে। জীপে তোমার ডিপার্টমেন্টের নামও লেখা আছে। তবে সরকারী কাজে তুমি আসো নি। সরকারী টুরে কেউ বউ-বাচ্চা শালা-সম্বন্ধী নিয়ে ঘোরে না। কাল আমিও জব্বলপুর যাব এবং তোমার টুর প্রোগ্রাম চেক করে আমি দেখব। পরের ব্যবস্থা কী করতে হয়, আমার জানা আছে। ইতিমধ্যে বেশী গণ্ডগোল যদি করতে চাও, নিজের দায়িত্বে করবে।

আমার কথা শুনে লোকটা একটু নিস্তেজ হলো বলে মনে হলো। তবু ঘাড় ঘুরিয়ে

আবার ফোঁস করে উঠল। বললে—

বহুত বড়ো বড়ো কথা বলছ যে—কে তুমি ?

আমি চড়া গলায় বললাম– আমি পাবলিক, আর তুমি পাবলিক সার্ভেন্ট !

শুধু আরদালিই নয়, রেস্ট হাউসের খানসামাই নয়, গিন্নী আর বালবাচ্চার সামনে এতো বড়ো অপমান !

আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠল পাবলিক সার্ভেন্ট—

শেষবার বলছি, তুমি ঘর ছেড়ে দেবে কিনা ?

নিশ্চয়ই দেব, যদি তুমি আমার রিজার্ভেশন ক্যানসেল করিয়ে আনতে পারো। তবে এটা জেনে রেখো সার্ভেন্টকে শায়েস্তা করবার হিম্মত আমার আছে।

অল রাইট ! গটমট করে বারান্দা থেকে নেমে গেল লোকটা। সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে জীপ নিয়ে বার হয়ে গেল।

আমি বারান্দার চেয়ারে বসে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালাম।

দশ মিনিট পরেই জীপ ফিরে এলো। বুঝলাম, পূর্ত বিভাগের দপ্তরেই সে গিয়েছিল। এক লাফে জীপ থেকে নেমে সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

একগাল হেসে বললে—আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি—আপনি ভটাচার্যি সাহেবের গেস্ট, তা আমি জানতাম না। আমার ব্যবহারের জন্যে আমি খুবই লজ্জিত।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আবার বিগলিত কণ্ঠে বললে—

আমি এখনই চলে যাচ্ছি, অন্য ব্যবস্থা করে নেব। কোনো অসুবিধে নেই। জব্বলপুর যাবেন বলছিলেন, না ? আমার সঙ্গে যদি দেখা করেন, তাহলে খুবই খুশী হব। আমার অফিস খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না।

আমি উত্তরে বললাম—শুনুন মিস্টার, আমি মিস্টার ভট্টাচার্যের বন্ধু হই বা না হই, আমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক। জব্বলপুরে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার অভিরুচি আমার নেই। আপনার দপ্তরে যদি আমি অ্যাট-অল যাই সেটা আপনার পক্ষে খুব সুখকর হবে না।

আসন্ন সন্ধ্যায় রেস্ট হাউসে শান্তি নেমে এলো। বড়া খানসামা সেলাম করে বললে—

গোসলখানামে গরম পানি রেডি, সাব !

ডাকবাংলো, ইন্সপেকশন বাংলো, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস প্রভৃতি সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে সরকারী বেতনভোগী ও বেসরকারী করদাতার এক্তিয়ার সংক্রান্ত আইনকানুন আমার খুব বেশি জানা নেই। নিতান্ত দায়ে না পড়লে

এগুলির শরণাপন্ন হতে আমার মন সরে না। এগুলিতে আশ্রয় নেবার পূর্ব-অভিজ্ঞতাও অনেক ক্ষেত্রেই আমার খুব প্রীতিকর নয়। অনেক সময়েই মনে হয়েছে, আমি অবাঞ্ছিত অনধিকারী আগন্তুক। এ যেন লেডিস সীটে এক কোণ ঘেঁষে বসা। পার্থক্য এইটুকু যে লেডিরা মহিলা, আর সরকারী অফিসাররা সরকারী অফিসার!

বিষণ্ণ অন্ধকারে একলা রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে কাটল। একেবারে একলা—অন্য কামরাগুলি যাঁদের নামে রিজার্ভ করা তাঁরা কেউ আজ রাত্রে আসবেন বলে মনে হচ্ছে না। এটা স্বস্তি।

কিন্তু মনটা বড়ো খারাপ লাগছে। সমাজ-সংসারের পারে দুর্গম কান্তারে প্রতিদিন যেন অমৃতধারায় স্নান করেছিলাম। সভ্যতায় ফিরে এসে আবার সেই তিক্ততার স্পর্শ পেলাম। মদগর্বের তিক্ততা, অকিঞ্চিৎকর আত্মম্ভরিতার তিক্ততা। প্রভুরূপী জনভৃত্যের অভদ্র অন্যায় ব্যবহারের তিক্ততা।

নিজের অধিকার বজায় রাখতে পেরেছি—কিন্তু এই নিয়ে কোনো গর্ব অনুভব করতে পারছিনে। এই অধিকার বঞ্চনার দ্বারা লব্ধ, যে বঞ্চনায় আমি জড়িত। এর পিছনে একটা মিথ্যা আছে, যে মিথ্যার পরোক্ষ বেসাতি আমিও করেছি। পূর্ত বিভাগের কর্মীর একটা ধারণা হয়েছে আমি তাঁর কর্তার বন্ধু। সেই ধারণা আমি ভাঙি নি। বলি নি যে শ্রীযুত শঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমি চিনিনে, তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা কখনো হয় নি—শুধু তাঁর নামটুকু আমার ডায়েরীতে টোকা ছিল। সেই নামটুকু জেনেই আমি তাঁর খোঁজ করতে এসেছিলাম।

সরকারী সেবকটির সঙ্গে যে ভাবে কথা বলেছি তার মধ্যেও মিথ্যা আছে। আমি একটা কেওকেটা লোক, ইচ্ছা করলে তাঁর মতো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সহজে জব্দ করতে পারি—এমনি একটা ধারণা তাঁর মনে সঞ্চারিত করতে আমি প্রয়াস করেছি। সেই প্রয়াসে কাজও নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে হীন ধূর্ততা আছে।

নর্মদা-শংকর তীর্থ-পরিক্রমায় নাগরিক জগতে পা দেবার সঙ্গে মিথ্যা, রূঢ়তা, কপটতা ও আত্ম-অহমিকার সাহায্যে কাজ হাসিল করেছি। ভালোই হয়েছে যে বন্ধু কান্হাইয়ালাল বিদায় নিয়েছে। আমার এই স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে।

মান্দলায় বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। মনে হলো মান্দলা বড়ো কঠিন ঠাঁই, আমার আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মান্দলাতে না নেমে রামনগরঘাটে যদি কোনো গ্রাম্য আস্তানায় আশ্রয় নিতাম, তা হলে

এই আত্মগ্লানির যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না।

বালানন্দ তখন গৌরীশংকরজী মহারাজের জমায়েত পরিত্যাগ করে নর্মদাতীরে একাকী পরিভ্রমণ করছেন। নর্মদার উত্তর তীর দিয়ে তিনি অমরকণ্টক অভিমুখে যেতে যেতে পৌঁছেছেন মান্দলায়। এর পর মুণ্ডমহারণ্যমধ্যে প্রবেশ করবেন। নদীতীরে মান্দলার কমিশনারের বাংলো। ইংরেজ সাহেব, দেশী সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরাগ। তাঁর বাংলোর সামনে দিয়ে বালানন্দ ও হরনামদাস নামে আর এক সঙ্গী সন্ন্যাসী চলেছেন। সাহেব দেখতে পেয়ে চাপরাসী পাঠিয়ে ধরে আনলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন—

তোমরা কে ?

বালানন্দ বললেন—আমরা দূরযাত্রী সাধু।

সাধু ? তোমরা ভণ্ড, তোমরা চোর ! দিনের বেলা সাধু সেজে বেড়াও আর রাত্রে লোকের বাড়ি সিঁধ কাটো ! উতারো তোমাদের ঝোলা, দেখি কী চুরির মাল ঝুলির মধ্যে আছে।

ঝুলি থেকে বার হলো কিছু খাদ্য, তামাক, বনৌষধি আর কিছুটা শংখিয়া বিষ। শংখিয়া দেখে সাহেব তো গরম। ঠিক—এ বেটা শুধু চোর নয়, খুনে ডাকাত ! প্রসাদের নাম করে নিরীহ লোককে বিষ খাইয়ে হত্যা করে, তারপর তার যথা-সর্বস্ব লুঠ করে ! বেআইনী বিষ যখন পাওয়া গেছে তখন বেটাকে সোজা জেলে পাঠাব !

চোখ লাল করে জেরা করলেন—এ বিষ তোমার কাছে এলো কী করে ?

বালানন্দ বললেন—সাহেব, আমরা শীতবস্ত্রহীন পরিব্রাজক, নর্মদার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াই, শীতের রাত্রে একটু করে শংখিয়া ভস্ম খাই—তাতে শরীর গরম হয়, শীত লাগে না।

অ্যাঁ, নিজের হাতে বিষ খাও ? প্রাণে মরো না ? চালাকি পেয়েছ ? এখুনি তোমাকে ফাটকে পুরব।

বালানন্দ আবার সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন।

সাহেব বললেন—ঠিক, ঝুটা বাত বলছ কিনা আমি পরীক্ষা করছি। আমার সামনে তুমি শংখিয়া খাও। দেখি কতোটা খেতে পারো, সাধুর কতো হিম্মত !

বালানন্দ ভাবলেন, নর্মদা পরিক্রমা খণ্ডিত করে জেলে যাওয়ার চাইতে নর্মদাতটে মৃত্যুও শ্রেয়। ধর্মের জন্য আত্মবলিদান, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে ? সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে আধ তোলার বেশী শংখিয়া তিনি সেবন করলেন।

সাহেব চাপরাসীকে বললেন—বেটা সাধুকে বাংলোর সামনে গাছতলায় বসিয়ে রাখ্। দ্যাখ্ ভণ্ড ডাকাতটা বাঁচে কি মরে।

নর্মদাতীরে বৃক্ষতলে বালানন্দ সমাধিমগ্ন হলেন। সহযাত্রীকে বললেন—

সমাধি অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে নর্মদা-স্রোতে এ দেহ ভাসিয়ে দিয়ো!

কমিশনার সাহেবের পুত্র শিকারে গিয়েছিল। একটু পরেই সে বাংলোয় ফিরে এলো। এসে কিছু জলযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ানক ভেদবমি শুরু হলো। কমিশনারের ডাকে স্থানীয় ডাক্তার ছুটে এলেন। কিন্তু কিছুই তিনি করতে পারলেন না—কয়েকবার ভেদবমি করেই ছেলেটি মারা গেল।

চকিত পুত্রশোকের এই অকল্পনীয় আঘাতে কমিশনার সাহেব যেন পাগল হয়ে গেলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন—

ডাক্তার, একটু আগে এক হিন্দু সাধুকে জোর করে বিষ খাইয়েছি—সে পাপের ফলেই আমার এই সর্বনাশ হলো!

ডাক্তার ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। কমিশনারের কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। বললেন—কে সে সাধু? কোথায় সে?

ঐ আমার বাংলোর সামনে গাছতলায় পড়ে আছে। এতোক্ষণে সেও বোধহয় বেঁচে নেই! চলো ডাক্তার, তাকে একবার দেখবে চলো!

বৃক্ষতলে নিশ্চল সমাধিতে মগ্ন রয়েছেন বালানন্দ। তাঁর মরণাহত মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে রেবামন্ত্র জপ করছে উদাসী সঙ্গী হরনামদাস। বালানন্দকে দেখেই ডাক্তার বুঝলেন যে বিষের ক্রিয়া সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। প্রাণরক্ষার কোনো উপায় চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই।

হরনামদাসকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে?

হরনাম বললেন—নর্মদাভক্ত পরিক্রমাবাসী ব্রহ্মচারী—নাম বালানন্দ।

ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন। মৃত্যুর সমস্ত আশু লক্ষণ উপস্থিত। বললেন—একমাত্র নর্মদামায়ী ছাড়া এঁকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তোমরা এঁর মাথায় নর্মদার জল ঢালো।

ব্রহ্মতালু নর্মদার আশীর্বাদী সলিলে শীতল হলো। নিঃশঙ্ক ভক্তকে নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনলেন দেবী নর্মদা। নিশ্বাস শুরু হলো। বালানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃত্যুপম সমাধি ভঙ্গ করে চক্ষু উন্মীলন করলেন।

উজ্জয়িনীর এক পুণ্যশীল শংকরভক্ত ব্রাহ্মণ বংশে বালানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা

বংশীলাল ছিলেন মহাকালের পূজারী, মাতা নর্মদা পরম বিদুষী ও নানা সদ্‌গুণ-বতী। বাল্যে তাঁর নাম ছিল পীতাম্বর।

ন-বৎসর বয়সে পীতাম্বরের উপনয়ন হলো। তার কদিন পরে মাতা নর্মদার স্নেহমায়ার বন্ধন ছিন্ন করে জগন্মাতা নর্মদার আকর্ষণে পীতাম্বর গৃহত্যাগ করেন। উজ্জয়িনী থেকে একাকী প্রায় চল্লিশ ক্রোশ হেঁটে তিনি নর্মদার উত্তর তীরে বাড়বার ফেরীঘাটে পৌছান। এখান থেকে হাণ্ডিয়া-সিদ্ধনাথে পৌছে নর্মদা অতিক্রম করে ঋদ্ধিনাথ তীর্থে আসেন। নর্মদার দক্ষিণ তীরের এই ঋদ্ধিনাথ তীর্থ থেকে তিনি অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে নর্মদা-পরিক্রমায় পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। নর্মদাসংগমে বিমলেশ্বরে নর্মদা অতিক্রম করে তিনি নর্মদাতট ধরে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন। গুরুলাভ করেন গঙ্গোনাথ তীর্থে। তারপর পরিক্রমার পথে অগ্রসর হন গৌরীশংকরজীর সঙ্গে। ভ্রমণসঙ্গীরা বালক পরিক্রমাবাসীকে বাল-ব্রহ্মচারী বলে ডাকতেন। গুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দীক্ষাকালে তাঁকে বালানন্দ ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত করেন।

গুরু ব্রহ্মানন্দ বালানন্দের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—তপস্বীর ভিক্ষার ঝুলি রাজকোষের চেয়েও মূল্যবান। রাজকোষে শুধু ঋদ্ধি থাকে, সন্ন্যাসীর ঝুলিতে থাকে ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি উভয়ই। ঋদ্ধি ইহজগতের ধন, মানুষের দান। সিদ্ধি মানুষের নয়, ভগবানের দান। ইহলোকের পাথেয় ও পরলোকের বৈকুণ্ঠ।

দীক্ষালাভের পর নিঃস্ব বালক বালানন্দ গুরুকে বলেছিলেন—

প্রভু, গুরুদক্ষিণা আমি কী দেব? যা চান তা আমি ভিক্ষা করে এই ঝুলিতে ভরে আপনাকে এনে দেব।

ব্রহ্মানন্দ প্রিয় শিষ্যকে বলেছিলেন—

বৎস, ভিক্ষালব্ধ ঋদ্ধিতে গুরুদক্ষিণা নেই, সাধনলব্ধ ঋদ্ধিতে আছে। সেই ঋদ্ধিই সিদ্ধি। জীবনে সৎকর্ম, বীজমন্ত্র সাধন ও তপশ্চর্যায় যে সিদ্ধি তুমি লাভ করবে, প্রতিদিনের সেই সিদ্ধির সঞ্চয় তুমি আমাকে দান করবে—সেই হবে গুরুপদে শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা।

নর্মদা-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে বালানন্দ ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। গুরুকৃপায় সিদ্ধির পরম প্রসাদ লাভ করে তিনি মহাযোগী রূপে ভারতবিখ্যাত হন। ১৯৩৭ সালে দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামে তিনি পরমাত্মায় লীন হন।

দুর্ভাগ্য যে, শ্রীযুত শংকর ভট্টচার্য মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ আমি পাই নি। জব্বলপুর থেকে তিনি ফেরার আগেই আমি মান্দলা পরিত্যাগ করেছিলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুমুখে তাঁর সহৃদয়তা ও সৌজন্যের কথা আমি শুনেছিলাম। তাঁর চরিত্রগুণের প্রত্যক্ষ আস্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত।

দারুণ কুয়াশা-ভরা কঠিন শীতের এক রাত্রে তাঁরই নামগুণে অচেনা মান্দলা শহরে আমি অতি সুখকর আশ্রয় পেয়েছিলাম। দূর থেকে তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ নমস্কার।

১৬

নর্মদার বর্ণনা আছে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে। বিন্ধ্যগিরির সুউচ্চ পার্শ্ব থেকে ঝরে পড়ছে এক রমণীয় প্রপাত। শীতল তার জলরাশি, স্ফটিক-স্বচ্ছ সে জলধারার বর্ণরূপ। প্রপাতের নিনাদ যেন পর্বতের অট্টহাস্য। তার তেজোদীপ্ত অগণিত জল-স্রোতে গিরি যেন লোলজিহ্ব অনন্তনাগের শোভা ধারণ করেছে।

এই পুণ্যতোয়া নর্মদার তীরে রাবণ তাঁর অনুচরবৃন্দ সহ এসেছেন শিবপূজা করতে। অদূরে বরনারীদের সঙ্গে নর্মদাসলিলে জলক্রীড়া করতে এসেছেন হৈহয়পতি মাহিষ্মতীরাজ কার্তবীর্যার্জুন। অনার্য রাবণের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা। দত্তাত্রেয় মুনির বরে তিনি সহস্রবাহু। তাঁর শক্তির তুলনায় দশানন রাবণকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না। নর্মদার উত্তর তীর জুড়ে তাঁর বিরাট রাজ্য। মনস্থ করলেন রাবণের পূজায় তিনি ব্যাঘাত ঘটাবেন।

নর্মদার প্রপাতমুখে তিনি তাঁর সহস্র বাহু বিস্তার করলেন। নর্মদার ক্ষিপ্র গতি রুদ্ধ হলো। প্রপাতস্রোত সহস্র বাহু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সহস্রটি বিভিন্ন ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল। রুদ্ধপথ নদী বিরুদ্ধ দিকে প্রবাহিত হতে লাগল, জল বাড়তে লাগল সাগরোচ্ছ্বাসের মতো। প্লাবিত হলো কূল, বিঘ্ন হলো রাবণের পূজায়।

রাবণ যুদ্ধ করলেন কার্তবীর্যার্জুনের সঙ্গে। দশমুণ্ড রাবণরাজের কুড়িটি হাত। কার্তবীর্যার্জুনের একটি মাথা, কিন্তু এক হাজারটি বাহু। রাবণের কুড়িটি হাতকে অশক্ত করতে কার্তবীর্যার্জুনের খুব একটা অসুবিধা হলো না। তারপর সহস্র হাতে রাবণকে জড়িয়ে ধরে বন্দী করে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। পরে অবশ্য মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে রাবণকে তিনি ছেড়ে দিলেন। তবে ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণের এই হলো প্রথম পরাজয়।

মান্দলা থেকে মাইল তিনেক দূরে নর্মদার একটি অপূর্ব সুন্দর প্রপাত আছে। নদীর বিস্তৃত বুকের মাঝখানে পর্বতমালার আড়াল। পর্বতমালার একদিকে আছড়ে পড়ছে জলস্রোত, তারপর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে গা বেয়ে ছোট-বড়ো ক্ষীণ নানা ধারায় ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ছে—আবার সব কটি ধারা এক হয়ে চলেছে পশ্চিমাভিমুখী। এই ধারার নাম সহস্রধারা।

রামায়ণ বর্ণিত বহুধারাময়ী নর্মদা-প্রপাত কি এই সহস্রধারা? কার্তবীর্যার্জুন যে সহস্র হাতে নর্মদার গতিরোধ করেছিলেন তা কি এইখানে?
অনেকের ধারণা যে পৌরাণিক কালের মাহিষ্মতী নগরী ছিল এই মান্দলাতেই। ঐ সহস্রধারার কাছেই কার্তবীর্যার্জুন রাবণকে পরাজিত করেছিলেন। অনেক পণ্ডিত আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, ইন্দোর রাজ্যের নর্মদাতীরবর্তী মহেশ্বর শহর মাহিষ্মতী। আবার অনেকে বলেন নিমাড় জেলায় নর্মদা-কাবেরী সংগমের মাঝখানে ওংকার-মান্ধাতা দ্বীপই মাহিষ্মতী নগরীর ভিত্তি।
সহস্রধারা দেখে এসেছি। এমন মনোমুগ্ধকর প্রপাতদৃশ্য সহজে ভোলবার নয়। মনে হয় নদীবক্ষে প্রপাতের এমনি আশ্চর্য সৃষ্টি আর কোথাও বোধ করি হয় নি। কিন্তু মাহিষ্মতী দেখি নি। সেই ত্রেতাযুগের কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সেই মাহিষ্মতীও কোথাও নেই—না মান্দলায়, না মহেশ্বরে, না ওংকারেশ্বরে।
পুরাণের কোনো স্মৃতিপ্রতীক না থাক, ইতিহাসের এক আশ্চর্য নিদর্শন আছে মান্দলায়। ভারতের এক মহাপ্রাচীন আদিবাসী জাতির আশ্চর্য ইতিহাস। সেই জাতির নাম গোঁড়। মান্দলার ঐতিহাসিক নিদর্শন গোঁড় শাসকদের বিশাল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

কাঁচের শার্সিতে খুটখুট শব্দ। ঘুম ভাঙাবার অতি ভদ্র আবেদন। চমকে জেগে উঠলাম। কোথায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম? কার আশ্রমে? কোন্ আস্তানায়? পাশের বাথরুমের সুইচটা নিবোতে ভুলে গিয়েছিলাম, আলোটা সারা রাত জ্বলেছে। সেই আলোর রেখা এ ঘরেও এসেছে। ভালো করে চোখ মেলবার পর আর ভ্রম নেই। শুয়ে আছি রেস্ট হাউসের খাটে, ডানলোপিলোর রাজশয্যায়।
মনে পড়ল, মাঝরাত্রে শীতের অত্যাচারে প্রায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কবার। কম্বল মুড়ি দিয়েও বাগ মানে নি। তন্দ্রার মধ্যেও ঠকঠক করে কেঁপেছি।
খাটের লোহার রডটায় হাত পড়ল। কন্‌কন্ করে উঠল আঙুল—যেন গুঁড়ো বরফের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকেছে। খালি মাটিতে এক টুকরো চাদর বিছিয়ে বা ভূষির বস্তায় হেলান দিয়ে আগের ক-রাত কাটিয়েছি। কিন্তু এতো শীত তো এর আগে লাগে নি?
হাতড়ে হাতড়ে ঘরের সুইচটা টিপলাম। কারণটা বুঝতে দেরি হলো না। ওখানে আগুন ছিল, এখানে আছে ইলেকট্রিক। অগ্নিকুণ্ড উত্তাপ দিত, সেই উত্তাপ গায়ে

মাখিয়ে নিয়ে অতো শীতেও আরামে ঘুমতাম। এখানে শুধু আলো, কাঁচের কোটরের মধ্যে পোরা উজ্জ্বল আলো। এ আলোর দীপ্তি আছে, তাপ নেই। প্রখরতা আছে, আদর নেই।

দরজার কাঁচের শার্সিতে আবার খুটখুট।

আমি বললাম—কৌন ?

শার্সি ভেদ করে চাপা উত্তর এলো—রিকশা আ গিয়া সাব !

ঘড়িতে দেখি সাড়ে সাতটা বাজে। এতো বেলা হয়েছে বুঝতেই পারি নি। হেঁকে বললাম—থোড়া সবুর !

সারা দিনের মতো প্রস্তুত হতে মিনিট দশেক। তারপর কাঁচের দরজা খুললাম, পর্দা সরালাম। আশা করেছিলাম, প্রভাত-সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মুখোমুখি হব। কোথায় সূর্য ? কোথায় আলো ?

দিগদিগন্ত ঘন কুয়াশায় আবৃত হয়ে আছে ! এতো কুয়াশা যে দশ হাত দূরে দৃষ্টি পৌঁছয় না। রেস্ট হাউসের সামনের বাগিচায় ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের গুঁড়ি-গুলো মাত্র অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—তারপরে পাঁচিল আর গেট যে কোথায় তার কোনো নিশানা নেই।

ঠাহর করতে পারছি, নিতান্ত সামনা-সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা লোক। রেস্ট হাউসের খানসামা। ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির।

ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে টেবিলে প্রাতরাশ সাজিয়ে দিল। বললে—

আপনি কাল যে রিকশাওয়ালাকে হুকুম দিয়েছিলেন, সে আজ আঁধিয়ার থাকতে হাজির।

আঁধিয়ার ? আমার উঠতে বড়ো দেরি হয়ে গেছে ! কটা থেকে এসে বসে আছে?

যটার সময়েই আসুক সাব, এখনো তো আঁধিয়ারই চলেছে। বেলা দশটার আগে কুয়াশা কাটবে বলে মনে হয় না। ওকে ঘুরে আসতে বলব সাব ?

মান্দলা আমার প্রতি সত্যিই অপ্রসন্ন। সেই অপ্রসন্নতার পরিচয় পেয়েছি কাল সন্ধ্যেবেলা। আজ সকালের দিগন্ত-জোড়া নিবিড় ধূসরতার সেই অপ্রসন্নতারই প্রকাশ। মান্দলা বোধহয় আমাকে চায় না, তাই ছায়ার গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বসে আছে।

আমি বললাম—না, না, খাড়া থাক রিকশা, আমি এখুনি বেরোব।

বেলা আটটার অন্ধকারের মধ্যে রিকশা ঝাঁপ দিল। রিকশাওয়ালা ভেবেছিল কোনো বড়ো সাহেবের বাংলোতে আমি ভেট করতে যাব। যখন বললাম, চলো রাজঘাট—তখন সে কিছুটা যেন আশ্চর্যই হলো। পুরোনো শহরের দিকে সে চলল।

মান্দলা শহরের তিন দিকে নর্মদা। দেবগাঁও থেকে মান্দলা পর্যন্ত নর্মদা দক্ষিণ-গামিনী। মান্দলা ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই নর্মদার মুখ ঘুরেছে, ক্রমে নদী উত্তরমুখী হয়েছে জব্বলপুরের উদ্দেশে। মান্দলার নদীতীরে যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে নর্মদার এই অর্ধবৃত্তাকার গতি চোখে পড়ে।

কুয়াশার আড়ালে মান্দলা ঘুমচ্ছে। পুরোনো শহরের সরু সরু রাস্তা, দুধারে কাঁচা-পাকা একতলা বাড়ি, দোকান-বাজারের সার। একটি দোকানও খোলে নি, পথে লোক নেই বললেই চলে। ক্বচিৎ পিতলের কলসি মাথায় স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্তি চকিতে চোখে পড়েই ছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। মান্দলায় রাজঘাটের নামটিই শুধু জানি—সেই গন্তব্যের কথাই রিকশাওয়ালাকে বলেছি। কিন্তু কোন্ পথে সে নিয়ে চলেছে তার কোনো দিশা পাচ্ছিনে। কুয়াশায় একটি সাইনবোর্ড পড়বারও উপায় নেই।

মনে হলো একটা গভীর পরিখা বুঝি কোথায় পার হলাম। তারপরেই রিকশা-ওয়ালা থামল। বিশাল এক প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। অন্তত পনেরো-কুড়ি হাত চওড়া—উচ্চতা কতো ছিল, দুধারে বিস্তৃত কতো দূর ছিল তা এখন বোঝাব উপায় নেই। বিরাট বিরাট লালপাথরের চাঙড় দিয়ে তৈরি। এখন ভেঙে পড়েছে—কোথাও মাটির ঢিবিব সঙ্গে মিশে গেছে একেবারে। মাটিতে মিশিয়ে যাওয়া একাংশের উপর দিয়েই রাস্তা—এই রাস্তা চলেছে নর্মদাতীর পর্যন্ত।

গড়হা-মান্দলার গোঁড় রাজবংশের প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছি। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে গাড়িটাকে নদীর ধার পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলেছে রিকশাওয়ালা। ডান পাশে রাজরাজেশ্বরীর মন্দির, সামনে রাজঘাট, বাঁ দিকে বিধ্বস্ত প্রাচীরের পাশে বিশাল উঁচু এক গম্বুজ।

কালের হাতে দুর্গ বিধ্বস্ত হয়েছে। তার পাথর ভেঙে নিয়ে পরবর্তী কালের মান্দলাবাসীরা ঘরবাড়ি তৈরি করেছে, কণ্ট্রাক্টররা মাটি ভরাট করে নতুন শহরের রাস্তা বানিয়েছে। কুয়াশার আবরণে শীত-শীর্ণা নদীর তীরে শেষ চিহ্ন এই একলা গম্বুজ শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

যে যুগে এ গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল, এর মাথায় রাজডঙ্কা বেজেছিল তার ঐশ্বর্যের চিহ্নমাত্র নেই। গম্বুজের পাদদেশে শুধু নীল এনামেলের একটি প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে এ যুগ তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পূরণ করেছে। লর্ড কার্জনের আইন অনুযায়ী পুরাকীর্তি সংরক্ষণের একটি নোটিস। অক্ষরগুলি তার মুছে এসেছে—আর কোনো ঐতিহাসিক পরিচয়পত্র নেই।

নদীর ওপারে গ্রাম, তার পারে অরণ্য। কিছুই দেখা যায় না, সাদা কুয়াশায় সব ঢাকা। শুধু দূর দিগন্তে অরণ্যের ঝাপসা রেখা। ওপারের সেই রেখা বাঁ দিকে একটু ফাঁক হয়েছে। আভাসে ধারণা হচ্ছে—ঐখানেই বুঝি বাঞ্জার নদীর সংগম। ওপারে আরো পূর্বে মাইল দশেক দূরে রামনগর—গড়হামান্দলা রাজবংশের আর এক রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ।

এই সমস্ত বিশাল রাজধানী, কঠিন দুর্গ, প্রচণ্ড প্রাচীর আর আকাশচুম্বী গম্বুজ যারা বানিয়েছিল তারা গোঁড়।

গোঁড ? ঐ যারা বস্তারের অরণ্যে অসভ্য অর্ধোলঙ্গ জান্তব জীবন যাপন করে, মুণ্ডারণ্যে যারা বাঘের সঙ্গে লড়াই করে কাঠ কাটে, বিদেশী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ শেষ হবার আগে পর্যন্ত যাদের মেয়েরা একফালি বুকের বসন সংগ্রহ করতে পারে নি—তারা ?

হ্যাঁ, তাদেরই পূর্বপুরুষ। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ দেশ যে ভারতবর্ষ! এমনি সংস্কৃতির বিকাশ ভারতবর্ষেই সম্ভবপর। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বিচিত্রতম উদারতম ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মঙ্গলঘটের পুণ্যসলিলে স্নান করে কতো অসভ্য যে সভ্য হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গোঁড় রাজা হতে পারে না ?

যে আদিম জাতির এক শাখা আজও বস্তারের অরণ্যে মারিয়া-মুরিয়া হয়ে পড়ে আছে, তারই আর এক শাখা মধ্যপ্রদেশে চার-চারটি দীর্ঘস্থায়ী রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে না কি ?

মধ্যপ্রদেশের অনার্য অধিবাসীদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা চলে—মুণ্ডা ও দ্রাবিড়। মধ্য প্রদেশে দ্রাবিড় জাতির প্রধান শাখা গোঁড়। গোঁড়রা নিজেদের গোঁড বলে না। এ নামটি পরবর্তী কালের হিন্দুদের দেওয়া। গোঁডদের নিজেদের আদি নাম কৈতুর বা কোই। গোঁড়ের মূল খোণ্ড বা খোঁড—সেটি একটি তেলেগু শব্দ, যার অর্থ পাহাড়। গোঁড় যে অরণ্যচারী আদিম পাহাড়ী জাতি তাতে সন্দেহ নেই। তাদের আদি বাসভূমি ছিল বস্তারের দক্ষিণে তেলেগু অঞ্চলে—অন্ধ্র রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে। পূর্বঘাট পাহাড়ের তারা এক আদিম পাহাড়ী জাতি। মধ্যপ্রদেশের আদিম অধিবাসী তারা নয়।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে গোঁড়রা দলে দলে বস্তার ও চান্দার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করে। ছত্রিশগড় অঞ্চলে তারা প্রাচীনতম মুণ্ডা আদিম অধিবাসীদের পর্যুদস্ত করে। তারপর তারা আঘাত হানে স্থানীয় হিন্দু রাজ্যগুলির উপর। উত্তর ভারতে মুসলমান রাজত্ব পাকা হয়েছে, হিন্দু রাজপুত শক্তির খুব

দুর্বল অবস্থা। এই সময় চান্দা, খেরলা, দেবগড় ও মান্দলায় যে সব গোঁড রাজ্য জন্ম নেয় তারা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ্যগুলিকে বিনষ্ট করেই সৃষ্ট হয়। মধ্যপ্রদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে এই আদিম গোঁড়রা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃতিতে ও শক্তিসম্পদে মহাবলীয়ান হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্মের আচার পদ্ধতি ও উন্নততর জীবনযাত্রায় সহজেই তারা রপ্ত হয়েছিল। এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ে বলীয়ান হয়েই তারা রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য পরিচালনা করেছিল, রাজ-শক্তির নিদর্শনস্বরূপ এক বীর্যবান স্থাপত্যের সৃষ্টি করেছিল।

মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গোঁড় রাজবংশ গড়হা-মান্দলা বংশ। জব্বলপুর, মান্দলা ও রামনগরে তাঁদের রাজধানী ছিল। রাজা মদনসিংহ ঐতি-হাসিক পুরুষ। জব্বলপুরের মদনমহল তাঁরই নামে। তাঁর চতুর্দশ পুরুষ পরে সংগ্রাম-সিংহ এই বংশের প্রধান খ্যাতিমান রাজা।

কলচুরি রাজত্বের শ্মশানের উপর গড়হা-মান্দলা গোঁড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগ্রামসিংহ ১৪৮০ থেকে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মদনমহলের সংস্কার করেন ও মান্দলা দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। মান্দলা দুর্গ সমেত তিনি তাঁর রাজ্যে সবসুদ্ধ বাহান্নটি গড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু মঠ মন্দির অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বহু গ্রাম ও জনপদ সৃষ্টি করেন ও গোঁড় প্রজাদের এইসব গ্রামে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। সংগ্রামসিংহ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। শিব ছিলেন তাঁর উপাস্য দেবতা।

সংগ্রামসিংহের পুত্রবধূ ভারত-ইতিহাসের বীরাঙ্গনা রানী দুর্গাবতী। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন এবং বালকপুত্র বীরনারায়ণের অভিভাবকরূপে অমিত কৌশলে গণ্ডোয়ানা রাজ্য পরিচালনা করেন। মুঘল সম্রাট আকবর রানী দুর্গাবতীর কাছে বশ্যতামূলক সন্ধি শর্ত পাঠান। দুর্গাবতী ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আকবরের নির্দেশে আসফ খাঁর অধীনে মুঘল সৈন্য গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করে। রানী দুর্গাবতী ও পুত্র বীরনারায়ণ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন।

সেই বিখ্যাত গোঁড় রাজবংশের শেষ ঐতিহাসিক নিদর্শন এই পরিত্যক্ত অর্ধভগ্ন গম্বুজ মান্দলায় নর্মদাতীরে।

কুয়াশায় ঢাকা গম্বুজ। কুয়াশায় ঢাকা ইতিহাস।

১৭

দিল্লীশ্বরকে শুধু দিল্লীশ্বর থাকলেই চলবে না, জগদীশ্বর হতে হবে—এই সংকল্প ছিল মুঘল সম্রাট আকবরের। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি দিল্লীর তক্তে আরোহণ করেন এবং পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান শক্তিকে নির্মূল করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে কখনও তিনি অবসর নেন নি। গোদাবরী নদী পর্যন্ত সমস্ত উত্তর পশ্চিম পূর্ব ও মধ্য ভারতের অধীশ্বর তিনি হয়েছিলেন।

শাসনকর্তৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে নিজের হাতে গ্রহণ করতে সিংহাসন লাভের পরে আকবরের আরো ছ-বছর লেগেছিল। কুড়ি বছর বয়সে তাঁর দিগ্বিজয়ের আরম্ভ। প্রথম আঘাতে রাজবাহাদুরের পরাজয় ও মাণ্ডুর পতন।

মালবের মুঘল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি।

মালব জয়ের কিছু পরেই আকবরের দৃষ্টি পড়ল গণ্ডোয়ানার উপর। বাহান্ন গড়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ গোঁড় নৃপতি বীরকেশরী সংগ্রাম শাহ তখন আর নেই। পুত্র দলপতি শাহও নেই। সিঙ্গোরগড রাজধানীতে বসে যোগ্যতার সঙ্গে গড়া-মান্দলার রাজ্যভার বহন করছেন দলপতি শাহের বিধবা রানী দুর্গাবতী। দুর্গাবতী মাত্র চার বৎসর স্বামী সৌভাগ্যসুখ ভোগ করেছিলেন। অকাল-বিধবার সন্তান ভাবী রাজা বীরনারায়ণ নাবালক মাত্র।

গণ্ডোয়ানা তখন পূর্ব-নর্মদা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ অমুসলমান রাজ্য। রাজ্যের সমৃদ্ধির, রাজবংশের ঐশ্বর্যের তুলনা নেই। সংগ্রাম শাহ তাঁর পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ রাজত্বে অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। তিনি শুধু বাহান্নটি গড়ই প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রতি গড়কে কেন্দ্র করে গভীর অরণ্য অঞ্চলে সুমহান সভ্যতার সৃষ্টি করে গেছেন। প্রতিটি গড়ের ধারে ধারে তিনি অসংখ্য গ্রাম বসিয়েছেন। প্রতিটি গ্রামে হিন্দুর পাশাপাশি গোঁড়ের শান্তিপূর্ণ বসতি। প্রজারা অরণ্যকে পরাজিত করে প্রসন্ন কৃষি-ক্ষেত্র ও সম্পন্ন শিল্পের সৃষ্টি করেছে। রাজার দৃষ্টিতে উন্নততর হিন্দু ও অনুন্নত অধি-বাসী গোঁড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতির সুস্থ আদান-প্রদান। সংগ্রাম শাহ নিজের নামে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন করেছেন, যাতে হিন্দী ও তিলঙ্গী উভয় ভাষাতেই তাঁর নাম খোদিত। গত তিনশো বছর ধরে নর্মদাতীরের অধিবাসীর সঙ্গে গোদাবরী অঞ্চলের আদিবাসীর যে সংস্কৃতি-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে

তা সমন্বয়ের পূর্ণতা লাভ করেছে। এই পূর্ণতার প্রতীক শংকর—আর্যদ্রাবিড় মহাভারতবাসীর যিনি মহামহেশ্বর।

এ হেন সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অধিকর্ত্রী এক নারীমাত্র—নাবালক পুত্রের অছি-মাত্র। লোলুপ হলো সাম্রাজ্যপিপাসু মুঘল দিল্লীশ্বরের মন। কূটকৌশলের পথে সেই লোলুপতাকে তিনি পরিচালিত করলেন।

গণ্ডোয়ানায় এলো দিল্লীশ্বরের দূত। রানী দুর্গাবতীর সকাশে কুটিল বিনয়ে দূত নিবেদন করল—

রানী, আমার প্রভু দিল্লীসম্রাট আকবরের কাছে সংবাদ পৌছেছে যে আপনার একটি অতি আশ্চর্য শ্বেত হস্তী আছে, যেমন হস্তী সারা ভূ-ভারতে বিরল। আমার প্রভু শাহেনশাহ সেই হস্তীটি আপনার কাছে যাচ্ঞা করেছেন।

দুর্গাবতী বুঝলেন আকবরের এই শ্বেত হস্তী প্রার্থনা বশ্যতা দাবির নামান্তর। মুঘল দূতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে আকবরের দূত আবার রানী দুর্গাবতীর দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলো। এবার শুধু প্রার্থী হয়ে নয়, এলো রানীর জন্য এক বহুমূল্য উপহার সঙ্গে নিয়ে। স্বর্ণনির্মিত এক চরকা সে রানীর সামনে রাখল। বললে

আমার প্রভু শাহেনশাহ আকবর আপনার জন্য এই উপহার পাঠিয়েছেন, গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করুন।

এই বিচিত্র উপহারের নিগূঢ়ার্থ উপলব্ধি করতে রানীর দেরি হলো না। এই উপহারের সুনিপুণ ইঙ্গিতে আকবর তাঁকে কঠোর অপমান করেছেন, বলেছেন—তুমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের কাজ রাজত্ব পরিচালনা নয়, অন্দরমহলে বসে চরকা চালনা।

এই অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে জানেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রানী দুর্গাবতী। মুখে হাসি ফুটিয়ে দূতের হাত থেকে আকবরের উপহার গ্রহণ করলেন। বললেন—

তোমার প্রভুকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো। তাঁকে একটি উপহার আমিও দিতে চাই, সেটি তুমি নিয়ে যাবে।

আকবরের কাছে রানী দুর্গাবতী উপহার পাঠালেন কাঠের একটা তকলি যা উরুতে ঘষে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরুষরা মোটা সুতো কাটে। সেই উপহারের মাধ্যমে উত্তর দিলেন—আমি যদি নারী হয়ে সোনার চরকা কাটি, তোমার ক্ষমতা পুরুষ হয়েও মাত্র কেটো তকলি কাটার!

দুর্গাবতীর উপহারের মানে বুঝতে আকবরেরও অসুবিধা হলো না। তিনি

যথাবিহিত নির্দেশ দিলেন তাঁর অধীনস্থ কড়ামানিকপুরের শাসনকর্তা আসফ খাঁকে। আসফ খাঁর নেতৃত্বে মুঘল সৈন্য গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করল। সাল ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ।

ছ-হাজার অশ্বারোহী ও বারো হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে আসফ খাঁ সিঙ্গোর-গড় অবরোধ করতে এলেন।

রানী দুর্গাবতী এই প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তা ছাড়া তাঁর সৈন্যরা অভিযাত্রী রণকৌশলে শিক্ষিত নয়। সে দলে অশ্বারোহী নেই—তীর ধনুক তরোয়াল বল্লম তাদের অস্ত্র। মুঘলবাহিনীর সঙ্গে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দল, তা ছাড়া প্রধান শক্তি তার আগ্নেয়াস্ত্র—তোপখানা আর কামান।

রানী দুর্গাবতী বুঝলেন সুবিপুল মুঘল সৈন্য যদি একবার গড় অবরোধ করতে পারে, তাহলে সেই অবরোধকে কিছুতে ভাঙা যাবে না। গড়ের আশু পতন অনিবার্য। খাঁচায় পোরা সিংহের অশক্ত মৃত্যুর মতো। রানী সিঙ্গোরগড় পরিত্যাগ করে পার্বত্য ও আরণ্য পথে গড়হার দিকে যাত্রা করলেন। শত্রুসৈন্য তাঁকে অনু-সরণ করে ছুটল।

গড়হা ও মান্দলার মাঝামাঝি এক পার্বত্য খাদের ধারে এক উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়ে সেখানে সৈন্যসংস্থাপন করলেন রানী। এবং সেখান থেকে অনুসরণকারী মুঘল সৈন্যদলের উপর অতর্কিত আঘাত হানলেন। মুঘল বাহিনীর পিছুপিছু তাদের কামান ও তোপখানা তখনো সেখানে এসে পৌছুতে পারে নি। অস্ত্র-বলে দুই দলই সমান। সমস্ত দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুঘল সৈন্য পিছু হটল। দিনান্তে গণ্ডোয়ানার ক্লান্ত সৈন্যদল আনন্দ-আশ্বাসে যুদ্ধ ক্ষান্ত করে বিশ্রাম নিল।

পরদিন আবার শত্রুপক্ষ তেড়ে এলো। তাদের কামান এসে পৌছেছে। এ এক সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, যার কাছে ঢাল-তরোয়াল তীর-বল্লমের ক্ষমতা কিছুই না। মুঘলের কামান থেকে মুহুর্মুহু গোলা ছুটতে লাগল—সেই গোলার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল রানীর সৈন্যদল।

দূর থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর মুঘল সৈন্য মার্-মার্ করে এগিয়ে এলো। পিছু হটবারও উপায় নেই। পিছনে এক শীর্ণ পার্বত্য নদী ছিল। ভাগ্যের এমনি অভিশাপ, গত রাত্রে হঠাৎ বন্যায় সেই নদী ভীমা ভয়ংকরী রূপ ধারণ করেছে। তাকে অতিক্রম করে পশ্চাদপসরণ করা অসাধ্য।

রানী দুর্গাবতী বুঝলেন আজকের এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। হয় জয়, না হয় চরম সর্বনাশ। মুঘল গোলার আঘাতে আঘাতে জয়লাভের আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে।

অকুতোভয়ে এবার সেই চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

তাই দাঁড়ালেন বীরাঙ্গনা রানী দুর্গাবতী। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে নিজে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদল রানীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে মুঘল সেনাদলের প্রতিরোধ করতে লাগল। যুবরাজ বীরনারায়ণ নিহত হয়েছেন এই সংবাদ কানে এলো দুর্গাবতীর। সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পার্বত্য সুঁড়ি-পথে পালাতে লাগল। কামান খরিয়ে মুঘল গোলন্দাজরা তোপ দাগতে লাগল সেই পলায়মান সৈন্যদের উপর।

দুর্গাবতী দেখলেন আর আশা নেই। পুত্র বীরনারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সদ্‌গতি লাভ করেছেন—কিন্তু তাঁর সদ্‌গতি কোথায়? তাঁর অঙ্গে মৃত্যুর আঘাত তো এখনো লাগে নি! মুঘল সৈন্যরা কি তাঁকে বন্দী করে ধরে নিয়ে যাবে বিজেতা বিধর্মী আকবরের সকাশে? শত্রু-কারাগারে শৃঙ্খলিতা বন্দিনীর জীবনই কি তাঁর চরম ভাগ্য? মাহুতের হাত থেকে ক্ষিপ্রবেগে হাতীর অংকুশটি ছিনিয়ে নিলেন। তারপব সেই অংকুশ দিয়ে সবলে আপন গলদেশ বিদ্ধ করলেন রানী দুর্গাবতী।

আকবর গণ্ডোয়ানা রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। গড়হা-মান্দলার প্রধান দশটি গড় অধিকাব করে বাকি গড়গুলির মালিকানা তিনি ছেড়ে দিলেন দলপতি শাহের ভাই চন্দ্র শাহের হাতে।

গড়হা মান্দলার গোঁড়রাজবংশের আয়ুষ্কাল শেষ হতে আরো দুশো বছর বাকি ছিল। এই দুশো বছর ধরে ধীরে ধীরে প্রদীপের তেল ফুরোবার ইতিহাস। ভাই-এ ভাই-এ পিতাপুত্রে আত্মীয়ে আত্মীয়ে স্বার্থ বিরোধ ও আত্মঘাতী অন্তর্বিদ্রোহের কাহিনীতে এই দুই শতাব্দীর ইতিহাস কলঙ্কিত। ঘরোয়া লড়াই-এ বিভীষণ বহিঃশক্তির সাহায্য নিয়েছে, গড়ের পর গড় উপঢৌকন দিয়ে নিজের শক্তিকে নির্লজ্জ-ভাবে হ্রাস করেছে। তারপর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী যখন আঘাত হেনেছে—তখন আর সামলাবার ক্ষমতা নেই। প্রদীপের স্তিমিত শিখা শেষ পর্যন্ত নিবেছে মারাঠার ফুৎকারে।

শিলালিপি অনুসারে গড়হা-মান্দলার রাজবংশ ক্ষত্রিয়। জনগণের স্মৃতিতে কিন্তু অন্য কিংবদন্তী, ভিন্ন কাহিনী। কিংবদন্তীমতে এক কুমারী গোঁড় কন্যাকে দেখে অরণ্যের নাগদেব বিমোহিত হন। নরদেহ ধারণ করে সেই কন্যাকে তিনি গ্রহণ করেন। নাগের ঔরসে গোঁড় কন্যার যে পুত্রসন্তান হয় পিতৃ-আশীর্বাদে সে রাজ্য স্থাপন করে।

গড়হা-মান্দলা রাজবংশের ধমনীতে যে গোঁড়রক্ত প্রবাহিত তা পরবর্তী কালের

রাজারা ভুলতে চেয়েছিলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আদিবাসী রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধারার সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এই স্বাভাবিক ফল। হিন্দুদের ধর্ম, পূজা, আচার অনুষ্ঠান, চিন্তা ও জীবনযাত্রা রাজগোঁড়রা সহজেই গ্রহণ করেছিলেন। রানী দুর্গাবতী ছিলেন খাজুরাহোর চন্দেল্ল রাজবংশের রাজকন্যা। গোঁড়রাজা সংগ্রামসিংহের পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চন্দেল্লরাজের ক্ষাত্রগর্বে আঘাত লাগে নি। এই চন্দেল্লরাজও নাকি আদিতে আদিবাসী ছিলেন। সেই একই রকম কিংবদন্তী। আদিবাসী কুমারীর সঙ্গে দেবতার প্রণয়। সেই প্রণয়সঞ্জাত সন্তান থেকে দেবানুগ্রহে রাজশক্তির উন্মেষ। গোঁড়দের বেলায় নাগদেব, চন্দেল্লদের ক্ষেত্রে আকাশের চন্দ্র।

এমনি উদাহরণ তো হাতের কাছেই। মল্লভূমের প্রথম রাজা আদিমল্ল। তিনি ছিলেন প্রাক্-আর্য মাল বা বাগ্‌দী জাতির সন্তান। বীর হাম্বীর পর্যন্ত বাগদী রাজা। তিনিই শেষ মল্ল। তারপর থেকে বিষ্ণুপুরেব রাজাদের মল্ল উপাধি ঘুচল—তাঁরা উপাধি নিলেন সিংহ। এক সুনিপুণ কিংবদন্তীর মাধ্যমে প্রচারিত হলো তাঁদের ক্ষত্রিয় বংশগৌরব।

দেবাদিদেব শিবই যখন আর্য ত্রিমূর্তির মহেশ্বর হয়েছেন তখন আদিবাসী রাজশক্তি ক্ষত্রিয় মহিমায় ভূষিত হবে, এতে এমন আশ্চর্য হবার কী? ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এই তো স্বাভাবিক রূপ। এই সমন্বয় শুধু রাজায় রাজায় ঘটে নি সাধারণ লোকসমাজেও যুগে যুগে ঘটেছে।

গোঁড়রাজারা হিন্দু ও গোঁড় প্রজাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখতেন না। উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। হিন্দু প্রজাদের তাঁরা উৎখাত করেন নি। গোঁড় প্রজাদের দিয়ে আরণ্যভূমিকে উদ্ধার করে শত শত নতুন নতুন গ্রাম ও জনপদ সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি হিন্দু ও গোঁড় প্রজাদের পত্তন করেছেন।

উদ্যোগী পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয় প্রজারা গোঁড় রাজত্বকে তাদের সুবর্ণযুগ বলে গ্রহণ করেছিল। গোদাবরী অঞ্চলের আদিম গোঁড়রা এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আকর্ষণে দলে দলে নর্মদার সমীপবর্তী হয়েছিল ও এখানকার পর্বত-অরণ্যের প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করবার জন্যে অমিত উৎসাহে যুদ্ধ করেছিল।

সাত শতাব্দী ধরে তিলে তিলে যে সভ্যতা-সমন্বয় গড়ে উঠেছিল তাতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড আঘাত হানল মারাঠারা। গোঁড় রাজ্যগুলিকে মারাঠারা যে কেবল ধ্বংস করেছিল তাই নয়, এ অঞ্চলে হিন্দু গোঁড় সমস্ত অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল তারা। মান্দলা-জব্বলপুর চান্দা-ছিন্দোয়াড়া অঞ্চলের

যে সব আরণ্য-পার্বত্য অঞ্চল গোঁড়রাজারা উদ্ধার করেছিলেন, সেগুলি তারা শ্মশান করে দিয়েছিল। আদিবাসীরা দলে দলে পালিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের খাদে, জঙ্গলের গভীরে। ফিরে গিয়েছিল তাদের আরণ্যক জীবনযাত্রার বর্বরতায়।
তারপর ইংরেজ অধিকার। আর তাদের চতুর সাম্রাজ্যবাদী নীতি। আদিবাসীদের আরণ্যক বলিষ্ঠতা যেন সাধারণ গণজীবনে সঞ্চারিত না হয়ে যায় আবার পরাধীন জাতির স্বাধীকার বোধের আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের মনকে যেন কিছুতেই স্পর্শ না করে। এই নীতির নাম পলিসি অফ সেগ্রিগেশন।
প্রায় দুশো বছর পরাধীনতার পর আমরা স্বাধীন হলাম। ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারি স্বতন্ত্র ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানে ঘোষিত হলো যে আদিবাসীরাও ভারতের অধিবাসী। স্বাধীনতা সংস্কৃতি ও জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি আদিবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার। পরাধীনতার অপরাপর দৈন্যের মতো আদিবাসীদের পশ্চাদ্‌গতিও জাতীয় কলঙ্ক। এই কলঙ্কমোচন জাতীয় দায়িত্ব।

কুজ্ঝটিকার ঘন আবরণের মধ্যে নর্মদাতীরে একলা দাঁড়িয়ে ছিলাম। ধীরে ধীরে ছায়ান্ধকার কাটছে। নদীতীরে প্রাণের সাড়া জাগছে। রাজঘাটের ধারে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা কয়েকটি ছড়ানো জাল। কয়েকজন জেলে এসে সেই জালগুলি গোটাতে লাগল। ঘাটের সামনে জলে শীতের সর ভাসছে। সেই শীতলতা উপেক্ষা করে কয়েকজন ঘাটে নামল। অদূরে মাঝ নদীতে কয়েকটি ভাসমান নৌকার রেখা ফুটে উঠল।
সূর্যের অবশ্য দেখা নেই। এই কুয়াশাজাল ছিন্ন করে কখন তার প্রথম রশ্মিটি স্তম্ভশীর্ষ চুম্বন করবে বলা যায় না। কুয়াশার ঘন আস্তরণের মধ্যে দিয়েই গড়হা-মান্দলার এই স্মৃতিচিহ্নের দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি ভারতবর্ষের এক প্রাচীন আদিম জাতির বলিষ্ঠ সংস্কৃতির কথা, ভারত ইতিহাসে তাদের উত্থান-পতনের কথা। এই জাতি গোঁড়, যাদের বিপুল স্থাপত্য নিদর্শন জব্বলপুরে, মান্দলায়, রামনগরে, চান্দায়, দেওগড়ে সহানুভূতিশীল সন্ধানীর প্রতীক্ষায় বৃথাই দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এই জাতির আশ্চর্য প্রাগ্রসরতার মূল্যায়নে ঐতিহাসিকের কার্পণ্যের অবধি নেই—আবার এই জাতির আদিম পশ্চাদ্‌বর্তিতা নিয়ে চিত্তচমৎকারী গবেষণা করতে নৃতাত্ত্বিকের উৎসাহের অবধি নেই।
পিছন থেকে ডাক শুনলাম—মহারাজ!
চমকে উঠলাম ডাক শুনে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—কোন?
গেট খুলা হায় মহারাজ! মাতাজীকা মন্দির মে আইয়ে!

দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে সোজা যে রাস্তা ধরে রাজঘাটে এসেছিলাম, সেই রাস্তার নাম রাজরাজেশ্বরী পথ। নদী-তীরের কাছাকাছি বাঁ দিকে রাজরাজেশ্বরী মন্দির। মন্দিরদ্বার এতোক্ষণে খুলেছে। দ্বার খুলতে এসে অদূরে কুয়াশার মধ্যে অপরিচিত মানুষের প্রতি চোখ পড়েছিল পূজারীর। তিনি কাছে এসে আহ্বান করেছেন। প্রাচীরের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা। উঁচু চত্বরের উপর বেশ বড়ো মন্দির। মন্দিরে আছেন শংকর ও শিবানী। মন্দিরদ্বারের মুখোমুখি সাদা পাথরের বৃহৎ নন্দী। একধারে গভীর একটি বাঁধানো ইঁদারা। অন্যধারে ধর্মশালা। মন্দিরমার্জনা ও পূজা-য়োজনের কাজে আরো দু-তিনজন পুরোহিত লেগেছেন। ইঁদারার ধারে ও সামনের চাতালে কয়েকজন গেরুয়াধারী সাধু।

রাজরাজেশ্বরীর মন্দির প্রাচীন—অথচ খুব প্রাচীন নয়। ভক্ত-বন্দিত জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। নানা সময়ে সংস্কার হয়েছে ও বাড়ানো হয়েছে। মন্দিরের চারদিকে বহির্গাত্রে অনেকগুলি প্রস্তরনির্মিত বিগ্রহ। প্রদক্ষিণ করতে করতে সেগুলি দেখতে হয়! দুটি মূর্তি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি শ্বেত পাথরের অষ্টাদশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি। আর একটি চতুর্ভুজ মহাদেব, কোলে পার্বতী।

মন্দির দর্শন সেরে চলে যাচ্ছি—পুরোহিত শুধোলেন—পূজা দেবেন না?

প্রশ্ন করলাম—কতোক্ষণ পরে পূজা দেওয়া যাবে?

বুঝেছিলেন দূরদেশী আগন্তুক। বললেন—আজ কুয়াশার জন্য বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক পরে পূজা দিতে পারবেন। থোড়া ভোগভী সেবা করবেন।

ধর্মশালাটি আকৃষ্ট করেছিল। বললাম—রাতের আশ্রয়ও পেতে পারি কি?

একটু ইতস্তত করলেন। বললেন—

নিশ্চয়ই আশ্রয় পাবেন। তবে বিছানাপত্র তো দিতে পারব না, রাত্রে শীতে বড়ো কষ্ট পাবেন যে!

আমি মুচকি হেসে বললাম—সাধুরা থাকেন না?

ওদের কথা বাদ দিন মহারাজ। ওরা ধুনি জ্বালে, কষে ছাই মাখে। ওদের সঙ্গে আপনার কথা?

আমি বললাম—কিছু ভাববেন না পাণ্ডাজী! আমারও কম্বল আছে। আমি একটু ঘুরে আসছি। এসে পূজা দেব।

মনে খুব আনন্দ নিয়ে যাত্রা করলাম সহস্রধারার পথে। ফিরবার সময় রেস্ট হাউসে যাব। কম্বল আর ব্যাগটা নিয়ে মন্দিরে চলে আসব। একটা রাত সেখানে চৌর্য-বৃত্তি করে কাটিয়েছি—আর নয়।

দিনান্তে নর্মদাতীরে বসে আছি। কাদা বাঁচিয়ে রাজঘাটের শুকনো পৈঠায় পা ছড়িয়ে। পূজা দিতে বেলা হয়েছে, অবেলায় ভোগ খেয়েছি। তারপর সারা বিকেল রিকশায় করে শহরের এধারে ওধারে ঘুরে বেড়িয়েছি। বড়ো ক্লান্ত লাগছে। নাগরিক আয়েসের ক্লান্তি বলে মনে হচ্ছে। মুণ্ড মহারণ্যে সারাদিন হেঁটেও দিন-শেষে এমনি ক্লান্তি অনুভব করি নি একদিনও।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গেছে। আকাশ লালে লাল। সেই রক্তিমাভা ক্রমে মুছে যাবে। সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে ভরা শুক্লপক্ষে চাঁদের আলো ফুটবে। আকাশে পাতলা কুয়াশা। নদীর শিয়রে পাতা হবে রূপালি চাঁদোয়া।

পুরোহিত পিছনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—বাবুজী, আপনি এখানে? সারা বিকেল আপনি কোথায় ছিলেন? দেখা তো পাইনি!

আরতির পর খাসা জমায়েত। ধর্মশালার সামনের ঘরটিতে পাঁচ-ছজন জমিয়ে বসেছি। চেনা পুরোহিত আর তাঁর একজন সহকারী আছেন। আছেন জনা-তিনেক সাধু। সামনের চাতালে অগ্নিকুণ্ডে দুজন সাধু চাপাটি বানাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ধুনি জলছে। বৃদ্ধ সাধুটিকে ঘিরে আমরা গুছিয়ে বসেছি। পুরোহিত রাত্রের জন্যে একটি অতিরিক্ত কম্বল আমাকে দিয়েছেন।

এঁদের মধ্যে আমি অপরিচিত অতিথি। ভিন্ন প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী। কিন্তু সেই বাধা বড়ো বাধা নয়। রাত্রের কম্বলটি রেস্ট হাউসের গদির চেয়ে সুখকর শয্যা হবে।

আমি অমরকণ্টক দর্শন করে এসেছি, মুণ্ড মহারণ্য পরিক্রমা করে এসেছি—একথা জেনে আমার প্রতি সৌজন্যের সীমা নেই।

পুরোহিত বললেন—বাবুজী, ভৃগু-কমণ্ডলু দেখে এসেছেন?

আমি বললাম—হাঁ।

তিনি বললেন—এই রাজরাজেশ্বরী তীর্থ মহর্ষি বেদব্যাসের নামে পবিত্র। এই-খানে ব্যাসাশ্রম ছিল। তিনি তাঁর আশ্রমে শংকর মূর্তি স্থাপন করে আরাধনা করেছিলেন। সেই শংকর ব্যাসনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি আরও বললেন—

রেবাখণ্ড ও বশিষ্ঠসংহিতায় এই ব্যাসাশ্রমের উল্লেখ আছে বাবুজী। সেই প্রাচীন-কালে নর্মদা ব্যাসাশ্রমের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। একদা পরাশর, মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, অঙ্গিরা আদি মহাঋষিগণ ব্যাসের আশ্রমে এলেন। ব্যাসদেব তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে মৃগচর্ম পেতে ঋষিদের উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন!

ঋষিগণ ব্যাসকে বললেন—ব্যাসদেব, আপনার এই সুন্দর আশ্রম নর্মদা-শংকরের আরাধনার উপযুক্ত স্থান। সেই আরাধনার মানসেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তবে আপনার আশ্রম দেখছি নর্মদার দক্ষিণ তীরে। আমাদের মনস্কামনা ছিল দক্ষিণমুখী হয়ে নর্মদামাতার বন্দনা করব।

ব্যাস বললেন—ঋষিগণ, আপনাদের মনস্কামনা ব্যর্থ হবে না।

নর্মদার তপস্যায় নিমগ্ন হলেন ব্যাস। তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে নর্মদা তাঁর স্রোত-ধারাকে সংহত করলেন। তারপর তাঁর আশ্রমকে উত্তরে রেখে দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেলেন। কিছু দূর যাবার পর আবার উত্তরাভিমুখী হলেন মাতা নর্মদা।

ব্যাসদেব কোন্ পৌরাণিক যুগে এখানে শংকরপূজা করেছিলেন, ইতিহাসের মাপ-কাঠি দিয়ে সেই যুগনির্ণয় সম্ভব নয়। সেই যুগের সেই ঘটনার অবস্থান শুধু স্মৃতিতে, শুধু কল্পনায় আর বিশ্বাসে। কিন্তু রাজরাজেশ্বরী মন্দির জীবন্ত। সেই মন্দিরে পূজা দিয়েছি সকালে, ভোগ খেয়েছি দ্বিপ্রহরে। এখন পেয়েছি রাত্রের আশ্রয়।

প্রশ্ন করলাম—এই মন্দিরের নাম রাজরাজেশ্বরী হলো কেন পাণ্ডাজী?

পাণ্ডা বললেন—

লক্ষ্য করেছেন এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী নর্মদামাতা নন, সিংহবাহিনী শিবপ্রিয়া শিবানী। তিনি সৃষ্টিকারিণী, প্রজাপালিনী, শত্রুবিনাশিনী, সবসমৃদ্ধিদায়িনী। তিনি রাজবন্দিতা। রাজা তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজার চিত্তেশ্বরী তিনি—তাই তিনি রাজরাজেশ্বরী।

ঠিক কথা। গড়হা-মান্দলার গোঁড় রাজবংশ শিবভক্ত ছিলেন। রাজ্যের সম্পদে বিপদে রাজরাজেশ্বরী শিবানীর অর্চনা তাঁরা করতেন—দুঃখে সুখে শোকে উৎ-সবে পার্বতীর চরণে প্রণিপাত করত তাঁদের হিন্দু গোঁড় প্রজাপুঞ্জ।

দামী জুতোর মস্‌মস্ শব্দ। জানলার কাঁচে ঝনঝন্ শব্দ। এক ধাক্কায় দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। হু-হু করে ঘরে ঢুকল শীতের বাতাস।

বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে চিৎকার—

তুম্ কৌন্ হ্যায়!

আত্মপরিচয় দেবার মতো কিছুই নেই। আমতা-আমতা করে নিজের নামটা উচ্চারণ করলাম।

জানি জানি। সব শুনেছি। এও জানি দুনিয়ায় সাধুবেশে তস্করের অভাব নেই!

তস্কব ! আমি ?

আলবৎ, তুমি। তুমি তস্কর, প্রতারক। মিথ্যার মায়াজাল সৃষ্টি করে সেই জালের আড়াল দিয়ে ঢুকে পড়েছ। ভেবেছিলে কেউ জানবে না, কেউ ধরতে পারবে না। হেসে পরের ঘরের আরামটি লুটে নিয়ে যাবে—তাই না ?

আমি বললাম—না, আপনি অন্যায় বলছেন, মিথ্যা আমি বলি নি।

মিথ্যা বলো নি, মিথ্যার সৃষ্টি করেছ। চতুর প্রবঞ্চক তুমি। যাও দূর হয়ে যাও এই মুহূর্তে !

কোথায় যাব ? এই নিশীথে, এই নিকষ অন্ধকারে, এই অপরিচিত জগতে ?

শঠের প্রতি করুণা নেই, পাপীর প্রতি মমতা নেই। কেনই বা থাকবে ? দূর হয়ে যাও! দূর হয়ে যাও !

শীতের কনকনানিতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতেকাঁপতে ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্ন দেখছিলাম। তীর্থপথের প্রথম দুঃস্বপ্ন।

কোথায় আছি ? না, রেস্ট হাউসে নয়, মন্দিরের ধর্মশালায়। পাপকলুষনাশিনী নর্মদার তীরে, রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে, শংকরের আশ্রয়ে।

ধুনিতে আগুন নিবে এসেছে। কম্বলটা সরে গেছে গা থেকে। তাই শীত, তাই দুঃস্বপ্ন। নিজের কম্বলটা পেতেছি। গায়ের কম্বলটি আশ্রিতের প্রতি করুণা। সেই করুণার উষ্ণতায় কান মাথা ঢেকে আবার চোখ বুজলাম।

মান্দলায় দ্বিতীয় প্রভাত। আজও গভীর কুয়াশা। পাঁচহাত দূরে সবকিছু ঝাপসা। নর্মদার এপার-ওপার শ্বেত-ধূসর আস্তরণে আচ্ছাদিত।

ব্যাগটি কাঁধে তুলে আর পাট-করা কম্বলটি হাতে ঝুলিয়ে আমি প্রস্তুত। পুরোহিত করুণা করলেন। তখনো সময় হয় নি—আমার জন্যে মন্দিরের দ্বার তিনি খুললেন। মন্দিরের মধ্যে ঘন অন্ধকার।

একটি প্রদীপ তিনি জাললেন। ছায়াবৃত চরাচর জলস্থল অন্তরীক্ষ। ম্লান প্রদীপ মন্দিরমধ্যে আলো-আঁধারির সেই ছায়াকে আনল। যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেন সংস্থিতা—সেই দেবীকে প্রণাম করে পথে বার হলাম। ছায়াঘেরা শীতল পথ বেয়ে চললাম বাস স্ট্যাণ্ডের উদ্দেশে।

মধ্যপ্রদেশ রোড-ওয়েসের বাসগুলি ভালো। পশ্চিম বাংলার মফস্বলের বাসের তুলনায় তো স্বর্গ। চেহারায় খুব লম্বাচওড়া। সামনে পিছনে বড়ো দরজা, খোল-তাই জানলাগুলি খোলাও যায় এবং বন্ধ করাও সম্ভব। মোটা ও নরম গদিওয়ালা সীট, পরিসরে উদার, যাত্রীকে বুকের মধ্যে দুহাত পুরে ব্যালান্স করে এক পায়ে

বসতে হয় না। কণ্ডাকৃটরেরও আলাদা বসার সীট আছে।

লম্বা লম্বা গাড়ি, দূর-দূরের যাত্রী। ফাঁকা পথে তীব্রগতিতে বাস ছোটে, ঢালুতে নামে, চড়াইতে ওঠে, পাহাড়ী বাঁকে বাঁকে বোঁ-বোঁ করে ঘোরে। রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলা বলতে গেলে অসম্ভব। আসন সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী ঠাসার উদ্যম নেই। তা ছাড়া শীতকালে যাত্রীসংখ্যা তো কমই।

সাধারণত সামনের কটি সীটের ভাড়া একটু বেশি। পিছনের সীটগুলিতে ঝাঁকানি বেশি লাগে, তা ছাড়া যাত্রী বেশি হলে ঐ পিছন দিকটাতেই ঠাসাঠাসি। এ ছাড়া সামনে পিছনে আর কোনো পার্থক্য নেই। নামে দামে যদিও ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস।

রয়্যাল ক্লাসও আছে। একটি-দুটি আসন, ড্রাইভারদের পাশের ড্যাশবোর্ডের মুখোমুখি। নিচে নরম গদি যদিও নেই, পায়ের কাছে ইঞ্জিনের মধুর উষ্ণতা। সামনে বিশাল ঝকঝকে উইণ্ড-স্ক্রীন। টাইট করে আঁটা। বাস যতো জোরেই ছুটুক, ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কা-ধমক নেই। উইণ্ডস্ক্রীন যেন প্যানোরামিক সিনেস্ক্রীন। তার স্বচ্ছতার পারে দ্রুত পরিবর্তনশীল দূর প্রসারিত দৃশ্যপট।

এই রয়্যাল ক্লাসের সীট কটির ভাড়া বেশি নয়, কিন্তু রিজার্ভেশন কঠিন। ড্রাইভার-কণ্ডাক্‌টর বা মালিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দাবি আগে। তা ছাড়া ঐ ডাকবাংলোরই মতো সরকারী অফিসারের টপ্‌ প্রাইয়োরিটি। আইয়ে মালিক সাব্‌!

এই রয়্যাল ক্লাসে আসন সংগ্রহ করার টেক্‌নিক আমার জানা আছে। এ টেক্‌নিক বহু-পরীক্ষিত, সহজে বিফল হবার নয়। তাই মান্দলা বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে জব্বলপুরগামী বাসের ড্রাইভারের খোঁজ করলাম সর্বাগ্রে।

ড্রাইভার তখন রাস্তার ধারে বেঞ্চিতে বসে মাথা নিচু করে পায়ে ফেট্টি জড়াচ্ছিল। বুঝলাম, শিরার টনটনানি আছে।

নমস্তে ড্রাইভার সাব!

চমকে মুখ তুলে তাকালো।

নমস্তে।

ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। আমি হাঁ-হা করে উঠলাম—নেহী নেহী, আরাম কিজিয়ে, হাতকা কাম খতম কর লিজিয়ে!

মাথা নিচু করে টাইট করে পায়ের গুলিতে ফেট্টি বাঁধতে বাঁধতে বললে—শালা বহুত দুখাতা!

সমবেদনায় জিব দিয়ে কিছুটা চুকচুক শব্দ করে পাশে বসলাম আমি। ঘাড় থেকে নামালাম ব্যাগ আর কম্বল। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে বললাম—

আপ্ হী মুঝে জব্বলপুর পৌঁহুছা দেঙ্গে, ড্রাইভার সাব ?

জী।

সংক্ষিপ্ততম উত্তর। বুঝলাম পায়ের টনটনে ব্যথা নিয়ে অচেনা লোকের সঙ্গে বকর বকর করার মেজাজ তার নয়। তবু বোকার মতো সাদা গলায় আবার বললাম—

আপ্ কী মোটর কিতনা বাজে খুলেগী ড্রাইভার সাব ?

সাড়ে আট বাজে।

আওর লৌটেগী উঁহা ? জব্বলপুর মে ?

সাড়ে বারা সে এক !

ঘড়িটা দেখলাম। মাত্র আটটা। পায়ের উপর পা তুলে বসলাম। ভরা প্যাকেটটি সামনে খুলে বললাম—

পিজিয়ে ড্রাইভার সাব, এক সিগারেট ! জ্যাদা সে জ্যাদা আধা ঘণ্টা টাইম অভী তক্ !

সিগারেট ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার আমার প্রতি কৌতূহলী হয়েছে। পাশে বসে আমিও সিগারেট ধরিয়েছি একটা। একটি সিগারেটের অবসরে জানিয়েছি যে আমি নিতান্ত নিরীহ অচেনা লোক। এ অঞ্চলে আগে কখনো আসি নি। পথঘাট লোকজন জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য সবই আমার অজানা। তবে আমি কোনো ব্যবসা উপলক্ষে আসি নি, নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারী মাত্র। কী দেখব কী বুঝব কী জানব তা বলে দেবার মতো কেউ নেই।

সময় হয়ে এলো। ড্রাইভার উঠল। আমিও আর একটি সিগারেট তার হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলাম—সড়কমে চা উ কৌঈ জায়গা মে মিলেগী ড্রাইভার সাব ?

হাঁ জী সাব ! মিলেগা পাদোরিয়া মে !

এমন ভদ্র ও নির্ভরশীল যাত্রী এ বাসে আর দুটি নেই। কার্পণ্য নেই সিগারেট বিতরণে। চার পাঁচ ঘণ্টার জার্নি, পথে ক-বার ধূমপান তো করতেই হবে। তা ছাড়া চা খাওয়াও কি হবে না একসঙ্গে ?

বাসের ভিতরে ঢুকবার জন্যে এগোচ্ছি ড্রাইভার হাসিমুখে ডাকলে—

আইয়ে বাবুসাব, ইহাঁ বৈঠিয়ে, মেরে বীচ্ মে।

মান্দলা থেকে নর্মদার গতি পরিবর্তন হলো। নদীস্রোত হলো উত্তরাভিমুখী। মান্দলা শহর নর্মদার উত্তর তীরে। অতএব পরিক্রমাবাসীর তীর থেকে এখানে আমার যাত্রা বিচ্যুত। নর্মদাকে বামে রেখে আমার যাত্রা জব্বলপুর পর্যন্ত। নর্মদার পূর্বাঞ্চল দিয়ে।

উত্তরাভিমুখী নর্মদা। তার দক্ষিণ তীরকে এখন পশ্চিম তীর বলে অভিহিত করা চলে। মান্দলা থেকে জব্বলপুরের মধ্যে এই পশ্চিম তীরে নানা তীর্থ। প্রধান তীর্থ লুকেশ্বর। লুকেশ্বর অতি জাগ্রত স্থান। বিশ্বাস যে, এখানে নদীর ভীষণ স্রোতের মধ্যে মণিময় শিবলিঙ্গ লোকচক্ষের আড়ালে নিত্য জাগ্রত আছেন।

পূর্ব তীরে সহস্রধারা ছাড়িয়ে চিরাইডোংরী, পদ্মীঘাট, ছোলিয়াঘাট, নন্দিকেশ্বর তীর্থ। চিরাইডোংরি থেকে কান্‌হা প্রিসার্ভড ফরেস্টে যাবার পথ। পদ্মীঘাট অতি মনোরম। এখানকার শংকর-চবুতরা পরিক্রমাবাসী সাধুদের অতি প্রিয়। ছোলিয়া-ঘাটে সুন্দর শিবমন্দির। নন্দিকেশ্বর এ অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থ। এখানে নাকি ব্রহ্মাতনয় ধর্ম সুদীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। এখানে শিবমন্দির ধর্মশালা প্রভৃতি আছে। শিবরাত্রির সময় বড়ো মেলা হয়। নন্দিকেশ্বর থেকে জব্বলপুর জেলার শুরু। নন্দিকেশ্বরের পর নদিয়াঘাট। এখানেও শিবরাত্রিতে বিশাল মেলা। নদিয়া-ঘাট ছাড়িয়ে গোরনদীর সংগম। গোর-সঙ্গমের কাছেই নর্মদার উপর রেলপুল।

সহস্রধারার পর থেকে নর্মদাধারা ক্রমে ক্রমে চওড়া হয়েছে। দুধারে সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চল, কোথাও কোথাও গভীর শালবন—আবার কোথাও ছোট ছোট গ্রাম জনপদ ঘাট মন্দির শস্যক্ষেত্র।

মান্দলা-জব্বলপুর সড়ক নর্মদার পূর্বতীর দিয়ে পদ্মীঘাট পর্যন্ত গেছে। পদ্মীঘাট ছাড়িয়ে ছোলিয়াঘাট পর্যন্ত নর্মদা পশ্চিমমুখী। সেখান থেকে নর্মদার আবার উত্তর দিকে যাত্রা। ছোলিয়াঘাটে নর্মদাকিনার পরিত্যাগ করে সড়ক সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। নাগা পর্বতমালার ফাঁকে ফাঁকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত গোরনদী পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে জব্বলপুরে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেই পথেই আমার বাস যাবে। এই সড়কপথে মান্দলা থেকে জব্বলপুর উনষাট মাইল।

মান্দলায় নর্মদাতীব দেখা শেষ হলো। আবার নর্মদার সাক্ষাৎ পাব জব্বলপুরে — গোয়ারীঘাটে, তিলওয়ারাঘাট ভিড়াঘাটে।

১৮

পুরো দুটি সপ্তাহ। পুরো একটি শুক্লপক্ষ। এক চতুর্দশী থেকে আর এক চতুর্দশী। কাটিয়েছি তটিনী নর্মদার পাশে পাশে, অরণ্য পর্বতের নিভৃত আশ্রয়ে। এতোদিন নর্মদাকে দেখেছি—ক্ষীণা ক্ষিপ্রা নির্ঝরিণী। শৈলচারিণী, অরণ্যগামিনী। নিভৃত কান্তারের নির্জন উৎসশিখরে সমুৎপন্না দেবী নেমে চলেছেন মর্তভূমিতে—মর্তসন্তানের জনপদে।

সংসারাশ্রয়ী মর্তমানবকে তিনি আশীর্বাদ করবেন, তৃপ্ত করবেন, পুণ্যময় করবেন। শুভ কল্যাণস্পর্শে তার সমাজ-সংসার সভ্যতাকে সার্থক করবেন। তার সংস্কৃতিকে নব নব উপচারে পরিপূর্ণ করবেন। কঠিন গিরিসানু ও অরণ্যপন্থাকে উপলঝংকৃত কুটিল গতিতে অতিক্রম করে নর্মদা তাই অবতীর্ণ হয়েছেন উপত্যকায়। উপত্যকার বিস্তীর্ণ হৃদয়কে প্লাবিত করে বয়ে চলেছেন উদার ধারায়।

নদী মানব-সভ্যতার জননী ও লালয়িত্রী। সভ্যতার দোলনা নদীকূলে। মানবজাতির আদি সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল নদীর তীরে, বিকশিত হয়েছে নদীতীরবর্তী উপত্যকায়। নীল, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস, গঙ্গা, ইয়াংসি।

নদী দেশমাতৃকা। নদীকূলে কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম, নগর ও বন্দর। ভারতের উত্তর দক্ষিণের যে সপ্তনদীর কূলে কূলে লোক-সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার, সেই নদীগুলি ভারতবাসীর পরম পবিত্র।

> গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
> নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

চোদ্দ বছর নয়, মাত্র চোদ্দদিন। চোদ্দ দিন অরণ্যবাসের পর এখন আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এসেছি। নর্মদাশ্রয়ী বিরাট নগর। বিশাল বিশাল রাস্তা, বিরাট বিরাট অট্টালিকা। বড়ো বড়ো সরকারী দপ্তর, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হেড পোস্ট অফিস, হাইকোর্ট। কল-কারখানা, দোকান, বাজার, সিনেমা, প্রদর্শনী, রমণীয় ভ্রমণ-উদ্যান। জনতার আলোড়ন, নবীনতার উচ্ছ্বাস।

পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন এক প্রাসাদ। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। সেই প্রাসাদের জীর্ণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে সিংহাবলোকন করছি। সামনে এই আধুনিক নাগরিক উজ্জ্বল মানচিত্র।

এ নগর জব্বলপুর।

জবলপুর বা জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত শহর। মধ্যপ্রদেশের নর্মদাতীরবর্তী বৃহত্তম শহর। ইস্টার্ণ-সেন্ট্রাল রেলওয়ের বোম্বাইগামী রেলপথে জবলপুর স্টেশন। এলাহাবাদ থেকে নাগপুরগামী বিশাল জাতীয় রাজবর্ত্মের উপর জব্বলপুর শহর অবস্থিত। এ ছাড়া আরো কটি সড়ক জব্বলপুর থেকে এদিক ওদিক গেছে। যেমন উত্তর দিকে দামো, পূর্ব দিকে শহপুরা হয়ে ডিণ্ডোরী, দক্ষিণ পূর্বে মান্দলা।

নূতন পুরাতন শহর মিলিয়ে জব্বলপুর শহরের পরিসীমা মস্ত—বাহান্ন বর্গমাইল। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ ঘাঁটি জব্বলপুর। সমস্ত পূর্বাঞ্চল জুড়ে ক্যাণ্টনমেণ্ট আর গান-ক্যারেজ ফ্যাক্টরী। এ জন্যে এখানে ভারতের সমস্ত রাজ্য-বাসী ও ভাষাভাষীর বাস। পুরানো শহরে দোকান-বাজার ঠাসাঠাসি। পথে লোকের ভিড়ে হাঁটা দায়। অনেক দপ্তর, অনেক ব্যাংক, ছোটবড়ো অনেক হোটেল, অনেক সিনেমা-হাউস।

জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের প্রধান উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র। নাম-করা স্কুলের সংখ্যা দশ-বারোটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী। মহা-কোশল মহাবিদ্যালয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া বিভাগীয় উচ্চশিক্ষার জন্য সারা মধ্য প্রদেশের ছাত্রদের জব্বলপুর আকর্ষণ করে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ভেটি-রিনারি কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ল-কলেজ, বুনিয়াদী উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ। বহুমুখী উচ্চশিক্ষার মহার্ঘ ব্যবস্থায় জব্বলপুর সমৃদ্ধ। সম্প্রতি এখানে যে নূতন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে তা বিরাটত্বে ও আড়ম্বরে ভারতের সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যালয়কে হার মানায়।

এই জব্বলপুরের সন্নিকটবর্তী নর্মদাতীরে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল। সেই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। জব্বলপুর শহরের মধ্যে এই ত্রিপুরী কংগ্রেসের একটি স্মারক-তোরণ দর্শনীয়।

মদনমহল থেকে পুব দিকে তাকালে এই আধুনিক শহরের চিত্রার্পিত রূপ চোখে পড়ে। পাহাড়ের মাথায় এই প্রাসাদ—শহর থেকে মাইল চারেক দূরে নাগপুর রোডের ধারে। আগে গ্রাম ছিল—এখন সব শহর হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের নাম গড়হা। এইখানে গড়হা-মান্দলার গোঁড় রাজবংশের প্রথম রাজধানী ছিল। সেই রাজধানীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন মদনমহল প্রাসাদ। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা মদন-শাহ এই পার্বত্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। রাজা সংগ্রামশাহ এই প্রাসাদকে ভালোভাবে মেরামত করেন। রানী দুর্গাবতীও এখানে বাস করেছিলেন। জবল-

পুরের পরবর্তী রেল স্টেশনের নামও মদনমহল।

জব্বলপুরে যাঁরা ভ্রমণ করতে আসেন তাঁদের প্রধান আকর্ষণ মার্বল রক্‌স্। আমারও প্রধান আকর্ষণ বই কি! মার্বল রক্‌সের পাশ দিয়েই তো নর্মদা প্রবাহিত। মার্বল রক্‌স্ দেখব বই কি—সে তো আমার তীর্থযাত্রার অঙ্গ। কিন্তু এতোটা পথ গোঁড়রাজ্যের উপর দিয়ে আর গোঁড়দের কথা ভাবতে ভাবতে আসছি। তাই প্রথম দিনই মদনমহলটা সেরে নিই। দেখে নিই গড়হা-মান্দলা রাজ্যের এই প্রাচীনতম স্মৃতিচিহ্ন। সবাই তো মার্বল রক্‌স্ দেখতেই ছুটছে। মদনমহল উপেক্ষিত।

যতোটা উপেক্ষিত ভেবেছিলাম ততোটা নয়। পাহাড়ের নিচে রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটা সাইকেল-রিকশার জমায়েত। দু-একটা মোটর গাড়িও আছে। চড়াই ভেঙে পাহাড়ের মাথায় অনেকেই উঠছে। আধুনিক টুরিস্ট, মেয়ে-পুরুষ। পশমের স্যুট—সিল্কের শাড়ির উপর বংবাহার কার্ডিগান।

পাহাড়ের মাথায় দুর্গ। উঠতে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। তবে শীতের সকালে বেশ ভালোই লাগছে। তাছাড়া পেটে আছে উত্তম খাদ্য। উৎকৃষ্ট ব্রেকফাস্ট—নাগরিক জীবনের প্রভাতী আশীর্বাদ। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছি। এমন কিছু ক্লেশ বোধ হচ্ছে না। দু-একজন নিরীহ অগ্রবর্তীদে ছাড়িয়ে গেছি।

পাহাড়ের মাথায় মদনমহল। পাথরকাটা উঁচু-উঁচু ধাপ পৌঁছেছে মহলের সামনে পর্যন্ত। উঁচুনিচু নানা আকারের প্রস্তরস্তূপ। পাথরের গায়ে গুল্মলতা গজিয়েছে। নীরস পাষাণ থেকে রস শোষণ করে বেঁচে আছে উদ্ভিদ। সামনে বিশাল এক গোলাকার পাথরের পিণ্ড। অন্তত ষাট ফুট ব্যাস। সেই পিণ্ডের গা ঘেঁষে ও মাথার উপর রচিত হয়েছে মদনমহল। বিশাল বিশাল প্রস্তরের আয়তক্ষেত্র একের উপর একে বসিয়ে তার দেয়াল। দুর্গদ্বারের মাথায় বিশাল খিলান। পাথুরে কঠিন মেঝে ও ছাদ। ছাদের ধারে পাথরের মোটা কার্নিস ও রেলিং। অলিন্দে বাতায়নে গবাক্ষে কোথাও কোনো কারুকার্য নেই। শুধু গাম্ভীর্য, বিরাটত্ব আর রুক্ষতা। একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন এই ভীমকঠোর স্থাপত্যের মধ্যে ঘুমন্ত হয়ে রয়েছে।

হিন্দু কলচুরি রাজত্বের অবসানে গোঁড় রাজত্ব শুরু হয়েছিল। কলচুরি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সৌন্দর্যকলার যেটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে গোঁড় স্থাপত্যের কতো অমিল। চন্দেল্লদের প্রায় সমসাময়িক গোঁড। চন্দেল্লদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ভুবনজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর খাজুরাহোর মন্দির আর গোঁড়দের এই মদনমহল তো প্রায় সমসাময়িক। দু-এর মধ্যে কী পার্থক্য! প্রকৃতির সমস্ত সুষমা, সমস্ত মাধুর্য খাজুরাহোর শিল্পকলায় প্রকাশ। আরণ্যক অনার্য জাতির নবলব্ধ শক্তির ছন্দহীন পেলবতাহীন দুর্জয় দুর্মদ অভিব্যক্তি এই মদনমহলের স্থাপত্যে।

কঠিন খাড়াই উঁচু-উঁচু সিঁড়ি, হাঁটুভাঙা ধাপ। সেই ধাপ বেয়ে মদনমহলের উচ্চতম তলায় উঠছি। আমার আগে আরো অনেকে উঠেছে। কলকোলাহল কানে আসছে। প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছি আমি।

এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত বেগে পায়ের কাছে গড়িয়ে এলো একটি বল। ঘন হলদে রঙের উলের বল। তার পরেই ছিটকে নেমে এলো একটি পশম-বোনার কাঁটা।

কানে এলো ভর্ৎসনা ভরা কণ্ঠ—

ফেলে দিলি? কাঁটা-উল সব ছুঁড়ে ফেলে দিলি তুই?

বেশ করব ফেলব। এতোক্ষণ ধরে বলছি, কথা শুনছ না কেন?

যা শিগ্গীর, ছুটে নিয়ে আয় এক্ষুনি!

বয়ে গেছে আমার।

বাংলা ভাষা। নারীর কণ্ঠ। হোক এক কণ্ঠে ক্ষোভ আর এক কণ্ঠে অভিমান! কিন্তু এ যে সেই ভাষা! আমার মাতৃভাষা। কতোদিন এ ভাষা শুনি নি—এ ভাষায় কথা বলি নি! আনন্দ-বিস্ময়ভরা এ যেন আগমনীর স্বর!

নিচু হয়ে উল-কাঁটা ডান হাতে তুলে নিলাম। তারপর বাকি ধাপ কটি অতিক্রম করলাম নবীন আবেগে।

সামনে নয়ন লোভন দৃশ্য। ধুলোভরা পাথরের মেঝের এক কোণে রঙিন একটি শতরঞ্চি। ঝকঝকে টিফিন কেরিয়ার, থার্মোফ্লাস্ক, প্লাস্টিকের রঙিন ডিশ আর গ্লাস। মুখোমুখি বসে দুই মহিলা। একজন মধ্যবয়স্কা—অন্যজনের বয়স আরো কম, যুবতী। ঝগড়া লেগেছে দুজনের মধ্যে। অল্পবয়সী মেয়েটি রাগ করে অন্য মেয়েটির উল-কাঁটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

কানে এলো অভিযোগ ভরা কণ্ঠ—

কখন থেকে বলছি খিদে পেয়েছে. আর পারছিনে। তা নয়, খালি—আর কটা ঘর বুনি আর একটা লাইন শেষ করি।

আমি তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গেলাম। হাত বাড়িয়ে বললাম—

এ দুটি আপনাদের না? এই নিন!

দুজনেই অপ্রতিভ হলো আমাকে দেখে। আমার দিকে দুজনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মেয়েটি ধাতস্থ হলো আগে। ভালো করে আমাকে লক্ষ্য করে বললে—আপনি বাঙালী?

আমার পরনে সেই ভুসো পাতলুন, গলাবন্ধ ভুসো কোট আর মাথায় গেরুয়া টুপি। পোশাকে বাঙালিত্বের চিহ্নমাত্র নেই। কর্কশ পাদুকায় বুরুশ পড়ে নি তিন দিন। সুবেশিনী নাগরিকার সামনে নিজেকে বড়ো হীন মনে হলো। উল-কাঁটা দেবার সুযোগে ছুটে এসেছিলাম কেন? নারীকণ্ঠ শুনে? না, বাংলা ভাষা শুনে? আ মরি বাংলা ভাষা!

বললাম—নিশ্চয়, আমি বাঙালীই তো! আপনারা?

বাঃ, আমরাও তো বাঙালী! তা ছাড়া কী আবার?

আমি হেসে বললাম—তা তো ঠিকই। সিঁড়ি থেকে আপনাদের কথা শুনে আমিও তাই ভেবেছি। তবে কিনা একটু ধোঁকা লেগেছিল।

তেমনি স্মিতমুখে উত্তর—ধোঁকা কিসের?

আমি খুব ভালোমানুষের মতো মুখ করে আমতা-আমতা করে বললাম—

মানে আপনার বয়সী কোনো বাঙালী মেয়েকে খিদের জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি করতে কখনো দেখি নি কিনা—তাই!

এমনি কথার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না নিশ্চয়ই। বিস্ময়ে রাগে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বর্ষীয়সী মহিলাটির আর রাগ নেই। মনের মতো কথা তিনি শুনেছেন। কেমন জব্দ! হাসিতে ভেঙে পড়লেন তিনি।

প্রবাসে সামনে দুই বাঙালিনী—একজনের হাসি, অপরজনের ভ্রূভঙ্গি।

বিকেল বেলা গেলাম নর্মদাতীরে। ত্রেতাযুগে এখানে এসেছিলেন জাবালি মুনি। জাবালি এখানে তপস্যা করেছিলেন। তাঁরই নামে জবলপুর। জবলপুরের আদি নাম নাকি ছিল জাবালিপত্তন।

জাবালির নাম রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে আছে। তিনি রামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত চিত্রকূটে রামসকাশে গেলেন বনবাস পরিত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে সিংহাসন গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। সেই সঙ্গে গেলেন দুই মহর্ষি—বশিষ্ঠ আর জাবালি। রামকে জাবালি বললেন—

পিতৃসত্য পালনকে তুমি ধর্মাচরণ বলে মনে করছ, তোমার ধারণা ভ্রম। সত্য বলে যা তোমার ধারণা তা সংস্কার মাত্র। দশরথ মরে ভূত হয়ে গেছেন। নশ্বর জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতি জীবনশেষের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। তুমি অযোধ্যায় ফিরে চলো। রাজসিংহাসন অধিকার করো।

রাম বললেন—এ কি কথা প্রভু? আপনি যে মহা নাস্তিকের মতো বলছেন? এ যে মহা পাপ!

জাবালি বললেন—ত্যাখো, অবস্থা অনুসারে কখনো আমি নাস্তিক কখনো আমি

আস্তিক। আজ আমি যে নাস্তিক পাপী, সে তোমারই স্নেহে বৎস!

রামচন্দ্র জাবালির উপদেশ নেন নি। বনবাসের সত্যপালন থেকে তাঁকে কেউ বিচ্যুত করতে পারে নি। তারই ফলে সীতাহরণ, রামের রাক্ষসরাজ্য আক্রমণ, নর্মদার দক্ষিণে আর্যশক্তি ও সংস্কৃতির বিস্তার।

জাবালি জানতেন স্নেহবশে রামকে যে উপদেশ তিনি দিয়েছেন তা অসত্য। তাঁর মতো সত্যসন্ধ ঋষির উপযুক্ত নয়। সহচর বশিষ্ঠও সে কথা বলেছিলেন। সেই পাপক্ষালন শেষ পর্যন্ত জাবালি করেছিলেন এইখানে—এই নদীতীরে। পাপঘ্ন নর্মদার তপস্যায়।

নর্মদার এখানে তপস্বিনী বৈরাগিণী রূপ। জলধারা অনেক চওড়া হয়েছে। গভীরতা অবশ্য নেই, উচ্ছলতাও নেই। এপার-ওপারের তীর জুড়ে নেই গ্রাম বা শস্য-ক্ষেত্র। অরণ্যও নেই। শ্যামায়িতা প্রকৃতি এখানে নর্মদার দু-কোল জুড়ে আঁচল বিছায় নি। শুধু পাথর, শুধু রুক্ষতা। ওপারে তীরভূমি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। সেখানে উঁচু নিচু অসমতল পাথরের চাঙড—তার মাঝে মাঝে কণ্টকময় উদ্ভিদের ইঙ্গিত। জব্বলপুর পাথরের রাজ্য। পাথুরে দেশ। জবল মানে পাথর। তাই এব নাম জব্বলপুর।

জমাট সিমেণ্ট-কংক্রিটের বিরাট রোড-ব্রীজ নর্মদার বুকের উপব দিয়ে। জাতীয় মহাসড়কের অঙ্গ—যে সড়ক জব্বলপুর থেকে নাগপুর পর্যন্ত চলে গেছে। ব্রীজের নিচে তিলওয়ারা ঘাট। এখানে আছেন মহাজাগ্রত তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেব।

শহর থেকে ছ-মাইল দূরে নর্মদাতীরে আসার আর একটি কারণ ছিল। এ যুগেব শ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ মহামানবের স্মারক-মন্দির এখানে। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী। নানা ভাষা নানা ধর্ম নানা জাতি মিলে ভারতবর্ষের যে মহাজাতি আমরা—সেই মহাজাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। সত্য যাঁর প্রাণ, সত্যাগ্রহে যাব জীবনের আহুতি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিভিন্ন রাজ্যের নদী ও সমুদ্রের পূত সলিলে গান্ধী-জীর চিতাভস্ম নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেই সমস্ত স্থানে রচিত হয়েছে গান্ধীঘাট ও স্মারক-মন্দির। ভারতের পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে ভাগীরথীর পূর্ব-তীরে গান্ধীঘাট। তেমনি মধ্য প্রদেশে এই জব্বলপুরে নর্মদার উত্তর তীরে গান্ধী-স্মারক। তিলওয়ারা ঘাটের সন্নিকটে। এই স্মারক-মন্দিরের কথা আগেই শুনে এসেছিলাম।

নর্মদা সেতুকে পিছনে রেখে স্মারক-মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করে এগিয়ে এলাম। চার-

দিকে উঁচু দেয়াল। সামনে মস্ত গেট। গেটের মধ্যে সুন্দর সাজানো উদ্যান। উদ্যানের মাঝখানে গান্ধীস্মারক মন্দির। গেটের ধারে একটি মোটরগাড়ি। আরোহীরা নিশ্চয় ভিতরে।

গেট পার হয়ে দুধারের উদ্যান-শোভা উপভোগ করতে করতে এগোলাম। অপূর্ব উদ্যান—মন্দিরের অপরূপ আধুনিক স্থাপত্যশোভা। কিন্তু একটি লোক কোথাও নেই। সুন্দর করে ছাঁটা লন, সুন্দর করে ছাঁটা গাছের বেড়া। সামনের গোল বারান্দায় সারি সারি চকচকে রং করা গাছের টব। ঝকঝকে গম্বুজে দেয়ালে মেঝেতে এক বিন্দু মালিন্য নেই—এক টুকরো কাগজ বা একটি জীর্ণ পাতা পড়ে নেই কোথাও।

স্মারক-মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি পিছন দিকে। সিঁড়ির ধারে জুতো খুলে বারান্দাটি প্রদক্ষিণ করছি, আর ভাবছি—দিনের বেলাতেও কী নির্জন এই মন্দির! জনপ্রাণী নেই, দর্শক নেই, একজন কেয়ারটেকারও কি নেই?

হঠাৎ চমকে উঠলাম মানুষের গলা শুনে।

আরে, আপনি এখানে?

পরিচিত গলা, পরিচিত মুখ। এই মুখ সকালবেলা আরক্ত হয়ে উঠেছিল আমার হঠাৎ ঠাট্টায়। ভালো লেগেছিল সেই মুখের রাগত ভ্রূবিলাস।

বললাম—বাঃ, আপনিও যে দেখছি! দুবার দেখা হলো দিনে!

সকালে মদনমহলে যে দুটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাদের মধ্যে অল্পবয়সী যেটি—সেটি। সঙ্গিনীব উল-কাঁটা যে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

আমি বললাম—কতোক্ষণ এসেছেন?

কতোক্ষণ? মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে আছি। দরজা বন্ধ, একটি লোক নেই, ভিতরে যেতে পারছিনে।

কী আশ্চর্য! দরজা খোলবার কেউ নেই? এখানে কেউ আসে না নাকি? চলুন দেখি, কাউকে পাই কিনা!

বললেন—কে যে আসে তাতো জানিনে! এই দেখুন না এমন সুন্দর জায়গা, বিকেলবেলা। অথচ আমরা তো দুজন মাত্র। আপনি আসার আগে খালি আমিই ছিলাম—মাত্র একজন।

সত্যি আমরা দুজন ছাড়া সারা তল্লাটে আর একটি লোকের দেখা নেই। এমন সুন্দর বাগানের একজন মালী পর্যন্ত না।

হাঁটতে হাঁটতে গেট পর্যন্ত এলাম। শুধোলাম—আপনার সঙ্গে আর একজন যিনি ছিলেন, তিনি কোথায়?

সুচরিতাদি ? মদনমহল থেকে নামতে গিয়ে পা মচকেছে। ঘরে পড়ে আছে। আহা বেচারী ! জব্বলপুরে কিছুই ওর দেখা হবে না।

নূতন অ্যামব্যাসাডার গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। ফিকে হলদে রঙের সিল্কের শাড়ি, গায়ে ছাই রঙের খদ্দরের জ্যাকেট, গলায় সাদা সিল্কের স্কার্ফ। মুখের রং মাজা পিতলের মতো, চুলে বাদামীর ছোঁয়া। ছিপছিপে চেহারা। উজ্জ্বল দুই চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি।

আমি বললাম—ও, আপনারা বুঝি দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন ?

তা বলতে পারেন। দুই সখীতে মোটর-বিহারেও বটে। নাগপুর থেকে জব্বলপুর এসেছি। এবার এখান থেকে সগর হয়ে খাজুরাহো থেকে এলাহাবাদ ! আপনি ?

আমিও ভ্রমণে বেরিয়েছি। কলকাতা থেকে।

মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে আমার হাঁটুঝুল গলাবন্ধ কুর্তাপরা মূর্তিটা ভালো করে যেন নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন—তাই নাকি ? কী সর্বনাশ, কী কাণ্ড !

আমি বললাম—কেন এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

খুব বেকুবের মতো আমতা-আমতা করে বললেন—ওমা, আমিতো ভেবেছিলাম দ্বারভাঙ্গার কোনো গোয়ালাবাড়ির জন্যে মধ্যপ্রদেশের মহিষ কিনতে বুঝি এসেছেন ? এমনি চেহারার কলকাত্তাই টুরিস্ট কখনো দেখি নি কিনা ? তাই। বলেই খিলখিল হাসি। বুঝলাম সকালবেলার তামাশার যোগ্য জবাব বিকেল-বেলা পেলাম। হাসিতে খুশীমনে যোগ দিলাম আমিও।

মোটরের ইলেকট্রিক হর্নটা ক-বার জোর করে বাজাতেই কোথা থেকে দু-তিনটে বাচ্চা ছেলে ছুটে এলো। পিছনে পিছনে এলো চাবির থোলো হাতে এক আধ-বুড়ো। স্মারক-মন্দিরের চৌকিদার।

অদূরে একটি সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গিনী বললেন—আপনার রিকশা তো ? ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুন। একসঙ্গে ফিরব। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

চৌকিদারের নির্দেশ—ফুল ছিঁড়ব না, সিগারেটের টুকরো ফেলব না, জুতো পরে ঢুকব না, দেয়ালে হাত লাগাব না। গান্ধী-স্মারক বড়ো পবিত্র প্রতিষ্ঠান। এতো-টুকু নোংরা যেন না হয়, মালিন্যের ছায়াটুকু যেন না লাগে।

পয়লা নম্বর টাকের কারুকার্যখচিত বিশাল দরজা খুলল। সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম দুজনে। কী বিশাল প্রকোষ্ঠ, কী সুউচ্চ গম্বুজ, রেখাচিহ্নহীন নবনীধৌত কী অপূর্ব দেয়াল, পালিশ-পিচ্ছিল কী সুন্দর কক্ষতল !

হাতে-বোনা মোটা চটের হাঁটু-তোলা খাটো ধুতি পবনে। রামনামাশ্রয়ী এই অর্ধোলঙ্গ ফকিরকে স্মরণ করার জন্য কী রাজকীয় আড়ম্বর! কী প্রচণ্ড অপব্যয়! নর্মদাতীরে অসংখ্য গ্রাম। দরিদ্রের গ্রাম, অশিক্ষিত কৃষিজীবীর গ্রাম, বন্য আদিবাসীর গ্রাম। এই অভিজাত অট্টালিকার পরিবর্তে একটি পাঠশালা, একটি পান্থশালা, একটি চিকিৎসাকেন্দ্র বা একটি পঞ্চায়েত-ঘর হলে কী ক্ষতি হতো? আশ্চর্য হওয়ার আরো বাকি ছিল।. সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম রাজকীয় শূন্যতা দেখে। মহাত্মা গান্ধীর কোনো মূর্তি নেই, কোনো প্রতীক নেই—দেয়ালে তাঁর নামটুকু পর্যন্ত লেখা নেই!

কারা এই স্মরণ-মন্দিরে আসে জানিনে। কাকে স্মরণ করতে আসে তার ও কোনো পরিচয় নেই। স্বাধীনতা পেতে না পেতেই গান্ধীজীকে আড়ম্বরপূর্ণ শূন্যতার সিংহাসনে আমরা সযত্নে তুলে রেখেছি সেই সত্যই এই স্মরণ-মন্দিরে উদ্ঘোষিত। বড়ো মন খারাপ হলো নর্মদাতীরের এই গান্ধীস্মারক দেখে।

কন্যাকুমারীর গান্ধীস্মারক দেখেও এমনি মন খারাপ হয়েছিল। সেদিন দক্ষিণ সমুদ্রতীরের সন্ধ্যায়। আজও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দিনান্ত নর্মদাতটে।

পরিব্রাজক হলে ক' হয়, বাবুয়ানা আছে। গায়ে আছে সাদা টেরিলিনের শার্ট। আর ব্যাগের মধ্যে পাউডারের একটা পুরানো টিনে আছে কিছুটা নীলচে রঙের গুঁড়ো সাবান। ময়লা হলে চট করে সাবান মাখিয়ে শার্টটা কেচে নিই। শুকোতে দু-মিনিট। অবশ্য খুব ময়লা না হলে কাচার ঝামেলা কে করে—কোটের নিচেই তো ঢাকা থাকে। সন্ধ্যেবেলাই শার্টটা ভালো করে কেচে ধবধবে করে রেখে-ছিলাম।

হোটেলটা ভালো। দোতলায় এক-বিছানাওয়ালা একটা ঘর পেয়েছি। পাশেই বাথরুম। নিচে রাস্তার উপর রেস্তুরেণ্ট ও ডাইনিং হল।

ভোরবেলা উঠেই ভালো করে দাড়ি কামিয়ে গরম জলে স্নান করেছি। ফরসা শার্টের উপর চড়িয়েছি সোয়েটার। এমন কিছু শীত নেই—মহিষওয়ালার কোটটা আজকের দিনে বর্জন করলে ক্ষতি নেই। মাথা-ঢাকা নোংরা গেরুয়া টুপিটাও আজ পরিত্যজ্য। মাথার চুলে চিরুনির পালিশ।

সকাল আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিচে নেমে এসেছি। যাঁর জন্যে অপেক্ষা তিনি এখন এলে হয়। কথা আছে তিনি ব্রেকফাস্ট খাবেন আমার সঙ্গে। তাই বেয়ারা শুধু এক কাপ চা রেখে গেছে সামনে। পা দুটো কোলের কাছে টেনে নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে হাত চালাচ্ছে ছোকরা জুতি-পালিশওয়ালা।

রাস্তার দিকে নজর ছিল। দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই চেয়ার ছেড়ে সামনে উঠে গেলাম। বললাম—এই যে, সুপ্রভাত, আসুন আসুন।

সোনালী হলুদ রঙের সিল্কের রুমালে মাথা-কান ঢাকা। চিবুকের নিচে বাঁধা গিঁট। স্বচ্ছ কপাল, উজ্জ্বল চোখ, মুক্তার মতো দাঁতের সারি। গায়ে গোলাপী রঙের খাটো কার্ডিগান। ফিকে নীল শাড়ির রূপালী পাড়।

সামনের চেয়ারে ধপ করে বসে বললেন—কই, খেতে দিন, বড়ো খিদে পেয়েছে। সকালের আলোর মতো সুস্থ যৌবনের আনন্দিত প্রকাশ। আনন্দ আনন্দকে জাগায়। বললাম—

নিশ্চয়, এক মিনিট। আপনার খিদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—ও খিদেকে ভয়ও করি।

খিলখিল হাসি। আনন্দিত ঝরনার মতো। হাসি থামতে না থামতেই ট্রে হাতে বেয়ারা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম—দেখুন, একটা কথা ভাবছিলাম, কাছাকাছি থাকলে আসুন-বসুন বলে বেশ চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু দূরে যদি এগিয়ে যান বা পিছিয়ে পড়েন, তা হলে আপনাকে ডাকাডাকি করব কী করে বলুন তো?

থাক, আর ডাকাডাকির ভান করতে হবে না। অচেনা একজন মহিলার সঙ্গে সারাদিন ঘুরঘুর করবেন, আগে নিজের নাম ধাম পরিচয় ঠিকমতো দিন তো।

দিলাম। অল্পই বলবার, তবু যা বলবার বললাম। আত্মপরিচয়ে আড়াল রাখবার মতো দামী লোক আমি নই।

মন দিয়ে শুনলেন। তারপর নিজের পরিচয়ও দিলেন অকপটে।

যথারীতি সৌজন্যসূচক গম্ভীর গলায় তাঁর নামটি আমি পুনরুক্তি করলাম—

সরযূ সরকার। বাঃ, বেশ সুন্দর নাম, সরযূ! হ্যাঁ দেখুন। সরযূ দেবী—

আবার হাসির হাওয়া।

আরে—থামুন থামুন মশাই! আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে না করে তুমিই বলবেন, আর দূর থেকে ডাকতে হলে সরযূ বলেই চেঁচাবেন, কেমন?

বলেন কী, এতো আমার সৌভাগ্য!

আজ্ঞে না, সৌভাগ্য আমার!

আমার মাথার কালো চুল, গলার সাদা কলার আর গায়ের রঙিন সোয়েটারের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে হাস্যমুখী সরযূ বললে—

নিজে তো দেখছি বেশ ছোকরা-ছোকরা সেজেছেন আজ! আর আমাকে বুঝি বুড়িয়ে-যাওয়া দেবী বানাবার মতলব?

কান্‌হাইয়ালাল নয়, সরযু। সাধুসঙ্গী নয়, লীলাসঙ্গিনী। মোটর চালাচ্ছে সরযু, পাশে আমি। পাহাড়ী শীতের প্রকোপ উপত্যকায় নেই। সুন্দর সূর্যের আলো, মধুর প্রভাতী বাতাস। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গাড়ির গতিবেগ। এতো আয়েস, এতো মাধুর্য, এতো প্রসন্নতা। মনের মধ্যে গুনগুন করছে গান।

কাল সন্ধ্যায় গান্ধীস্মারক থেকে ফেরার পথে সরযূই নিমন্ত্রণ করেছিল অচেনা সহযাত্রীকে। অচেনা শহরের নিঃসঙ্গ আগন্তুককে। বলেছিল --

আমার বন্ধু তো পা-ভাঙা ঘরকুনো হয়েই রইল। চলুন, কাল আমরা মার্বল রক্‌স্ দেখেআসি। যাবেন আমাকে নিয়ে ?

আমি হেসে বলেছিলাম—আমি আপনাকে নিয়ে যাব, না আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন ?

ঐ একই কথা হলো। আপনিও তো যাবেনই—দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে, কেমন ?

সেই যাত্রায় চলেছি সকালবেলা। পথে কয়েক মিনিটের জন্য মোটর থেকে নেমে দেবতালের সরোবর ও মন্দিরগুলি দেখে নিয়েছি।

জব্বলপুর থেকে মার্বল রক্‌স্ মাইল চোদ্দ পনেরো। ভারতবর্ষের অবশ্য দর্শনীয় প্রাকৃতিক লীলাভূমি। বছরে হাজার হাজার দেশী বিদেশী পর্যটক এখানে আসে। শহর থেকে যাত্রী নিয়ে রোজই কয়েকটা বাস সকালে যায়, বিকালে ফিরে আসে। ছুটির দিনে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ে। সেদিন অনেক বাস, অনেক প্রাইভেট মোটর, অনেক সাইকেল। মার্বল রক্‌সে পৌঁছবার আধ মাইলটাক আগে ছোট গ্রাম। প্রতিটি ঘরই দোকানঘর। চায়ের দোকান, জলখাবারের দোকান, ভাতরুটি ভাজি-তরকারির দোকান। ছুটির দিনে এসব দোকান সরগরম। দুপুরের খাওয়া সকালে অর্ডার দিয়ে যেতে হয়।

এখান থেকে ধুয়াধার জলপ্রপাত পর্যন্ত দেড় মাইল। চওড়া চড়াই পাকা রাস্তা। প্রথমে ডানদিকে প্রাচীন পঞ্চশিবমন্দির। পূজাহীন, আরতিহীন। তারপর ভিড়াঘাট বা ভেরাঘাট।

ভিড়াঘাট নর্মদার অতি প্রাচীন ঘাট। কথিত আছে এখানে ভৃগুমুনির সঙ্গে দত্তাত্তেয় মুনির মিলন হয়েছিল, উভয়েই এখানে নর্মদার তপস্যা করেছিলেন—তাই এই স্থানের নাম ভিড়াঘাট। আর একটি লৌকিক অর্থও আছে। এখানে নর্মদার সঙ্গে বামনগঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র নদীর সংগম। নদীর সঙ্গে নদী এখানে ভিড়েছে, তাই নাম ভিড়াঘাট।

ভিড়াঘাটের অদূরে নর্মদার দুধারে মার্বল পাথরের পাহাড়। দু-পাশের প্রস্তর-প্রাচী-

রের মাঝখান দিয়ে নর্মদার বঙ্কিম গতি। নর্মদা এখানে যেন স্রোতহীন স্বচ্ছ শান্ত হ্রদ। সেই নিস্তরঙ্গ হ্রদে মনোরম নৌকাবিহার।

ভিড়াঘাট থেকে চড়াই। সেই চড়াই গিয়ে পৌঁছেছে ঘন অরণ্যঘেরা পার্বত্যভূমিতে। নর্মদার বুক পাথরে পাথরে বোঝাই। ছোট-বড়ো নানা বর্ণের নানা চেহারার চাঙড়ের পর চাঙড়। সেই পার্বত্যবাধার মাঝখান দিয়ে ভীম গতিতে ছুটে আসছে নর্মদা। সেই বেগ ধুঁয়াধারে আছড়ে পড়ছে চল্লিশ ফুট নিচুতে। প্রচণ্ড প্রপাত, প্রচণ্ড শব্দ, কোটি কোটি জলকণার চঞ্চল সিঞ্চনে চোখের সমুখে শ্বেত ধূম্রজাল! ধুঁয়াধারে নর্মদার রেবা নাম সার্থক।

চড়াই রাস্তা বেয়ে পয়লা গীয়ারে গাড়ি উঠছিল ধুঁয়াধারের উদ্দেশে। হঠাৎ আমি বললাম—

থামাও, থামাও এখানে সরযূ!

গাড়ি থামল। সরযূ বললে—সে কী? এই যে বললেন আগে ধুঁয়াধার দেখে এসে তারপর ভিড়াঘাটে নামবেন? গাড়ি ঘোরাব নাকি?

আমি বললাম—না, না ঘোরাতে হবে না। একপাশে রাখো। নামতে হবে এখানে।

গাড়ি থেকে নামলাম। ডানদিকে সার সার পাথুরে সিঁড়ি। উঠেছে পাহাড়ের মাথায়।

সিঁড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম—চলো, ঐটি আগে সেরে আসি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। বেলা হলেই কষ্ট।

সরযূ বললে—কী আছে ঐ সিঁড়ির মাথায়?

হেসে বললাম—ঐতো নোটিস। চোখে পড়ে নি? ঐ ত্যাখো লেখা রয়েছে—চৌষট-যোগিনী মন্দির।

পর্বতশীর্ষের ঐ মন্দিরে আছেন গৌরীশংকর। তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর চৌষট্টি যোগিনীর দল। মধ্য ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কলচুরি রাজত্বের বিরল স্মৃতি-নিদর্শন।

১৬

জব্বলপুর, দামো, মান্দলা ও নরসিংহপুব—বর্তমানে এই চারটি জিলা মিলে যে অঞ্চল, সেই অঞ্চল পৌরাণিক যুগে ছিল চেদীরাজ্যের অন্তর্গত। মহাভারতের যুগে এই চেদীরাজ্যের শাসক ছিলেন শিশুপাল।

বর্তমান বেরার প্রাচীনকালের বিদর্ভ। সে সময় এই রাজ্যের রাজা ছিলেন ভীষ্মক। ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করার অভিলাষ ছিল শিশুপালেব। কিন্তু কৃষ্ণ বিদর্ভ-নন্দিনীকে হরণ করে বিবাহ করেন। এই নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে শিশুপালের শত্রুতা। শিশুপালকে কৃষ্ণ হত্যা করেন ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুনপুত্র বভ্রুবাহনকে চেদীরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিক যুগেও এখানকার প্রাচীন রাজারা নিজেদের পাণ্ডব বলতেন।

মধ্য যুগে এই চেদীদেশ ছিল কলচুরি রাজবংশের অধীন। কলচুবি রাজবংশ ক্ষত্রিয় রাজবংশ। পুরাণোক্ত চন্দ্রবংশের হৈহয় শাখাব অন্তর্ভুক্ত বলে তাঁরা নিজেদের দাবি করতেন। নবম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইতিহাসে তাঁদের স্থায়ী আসন। নর্মদা-তীরবর্তী ত্রিপুরী শহরে তাঁদের রাজধানী। আরাধ্য দেবতা ত্রিপুরেশ্বর। দ্বাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যন্ত কলচুরি যুগেব মধ্যাহ্ন। তারপর ভাগ্য-সূর্য পশ্চিমে হেলেছে।

কলচুবি রাজারা প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। বিশাল এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ দুই রাজা গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণদেব। উত্তরে কাশ্মীর ও নেপাল, পূর্বে বঙ্গ-কলিঙ্গ, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত তাদেব প্রভাব ছড়িয়েছিল। গাঙ্গেয়দেব জিতবিশ্ব নামে খ্যাত হয়েছিলেন ও কর্ণদেবের উপাধি ছিল চেদীমহীচন্দ্র।

ত্রিপুরীর পাশে কর্ণদেব এক নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সে নগরীর নাম কর্ণ-বতী। কাশীতেও তিনি এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন—যার নাম কর্ণমেরু।

ভিড়াঘাট থেকে মাইল তিনেক দূরে তেবরগ্রাম। কলচুরি রাজধানী ত্রিপুরী ছিল এইখানে। এখানে কলচুরি রাজাদের বিশাল বিশাল হর্ম্য ও মন্দিরাজি ছিল। এখন ধ্বংসাবশেষও নেই।

অনুপম কারুকার্য-মণ্ডিত কলচুরি স্থাপত্যের নিদর্শন গত একশো বছরের মধ্যে নষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের সেই অমূল্য সম্পদ ভেঙে ভেঙে নিয়ে গিয়ে তা দিয়ে

ঠিকাদাররা এ যুগের ঘরবাড়ি রাস্তা বানিয়েছে। ঠিক যেমন নিশ্চিহ্ন করেছে মান্দলার দুর্গ। কর্ণবতী নগরী এখন অরণ্য। সে অরণ্যে অনেক বেলগাছ আছে— তাই স্থানটির নাম করণবেল। বারাণসীতে কর্ণমেরু মন্দিরেরও কোনো চিহ্ন নেই।

আছে দুটি মাত্র নিদর্শন। অমরকণ্টকের কর্ণমন্দির, যা দেখে এসেছি—আর ভিড়া-ঘাটের চৌষট্টি-যোগিনী, যা এখন দেখতে চলেছি। আমি আর আমার নূতন সঙ্গিনী সরযূ।

পাথরের চওড়া সিঁড়ি। একশো আটটি ধাপ। পাহাড়ের মাথায় বিরাট বৃত্তাকার সমমালভূমি। সমস্ত পরিধি জুড়ে মোটা পাথরের উঁচু প্রাচীর। সামনে প্রবেশপথ। প্রাচীরের ভিতর দিককার সমস্ত দেয়াল জুড়ে সার সার একাশিটি প্রস্তরমূর্তি। দেবী দুর্গার সহচরী চৌষট্টি যোগিনীর মূর্তির সঙ্গে গণেশাদি আরো কয়েকটি দেব-মূর্তি। এখানে ওখানে কিন্নরীমূর্তিও কয়েকটি। মূর্তিগুলির নিচে পাথরে নাম খোদাই করা।

বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে গৌরীশংকর মন্দির। অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন। মন্দিরমধ্যে বৃহৎ এক কষ্টিপাথরের গায়ে খোদাই করা অতি সুন্দর দেবমূর্তি। বৃষভা-রূঢ় হরপার্বতী। হরপার্বতীকে ঘিরে সূর্য, চন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ, তারাদেবী, গণেশ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। গ্রহনক্ষত্র দেবদেবী ও মুনিঋষি সকলে মিলে হরপার্বতীর বন্দনা-রত।

কলচুরিদের ইতিহাস আগে কিছু কিছু পড়েছিলাম। অমরকণ্টকে কর্ণমন্দির দেখার পর থেকে ভিড়াঘাটে এই চৌষট্টি-যোগিনী দেখবার কথা মনে ছিল। তাই প্রথ-মেই এখানে এসেছি। তাছাড়া সঙ্গে সরযূ থাকায় আমার উৎসাহের শেষ নেই। আমি বললাম—

তুমি তো খাজুরাহোতে যাবে সরযূ। খাজুরাহোতে এমনি এক চৌষট্টি-যোগিনীর প্রাচীন মন্দির আছে। এমনি আকাশের নিচে খোলা চাতাল। তবে গোল নয়, চৌকো। সেই মন্দিরে যোগিনী মূর্তি কিন্তু নেই। বিশ্বাস যে মহাদেব খাজুরাহোর চন্দেল্লদের প্রতি বিমুখ হয়ে তাঁর যোগিনীদের নিয়ে নর্মদাতীরে চলে আসেন। কলচুরিরা তাঁদের বরণ করে নেন।

সরযূ মন দিয়ে একটি গণেশ মূর্তি দেখছিল। বললে—জানি। খাজুরাহো সম্পর্কিত একটা বই-এ পড়েছি।

নিচের পঞ্চশিবমন্দিরে পূজার কোনো আয়োজন নেই। কিন্তু গৌরীশংকর মন্দিরে

নিত্য পূজা। স্থানীয় পূজারী রোজ সকালে আসেন। তিনি যত্ন সহকারে বিগ্রহাদি দেখালেন। মন্দিরটিও অতি সুরক্ষিত। কালের আঁচড় বিশেষ লাগে নি।

আমি বললাম—ছ্যাখো সরযু, কী সুন্দর কী পরিচ্ছন্ন! কতো নতুন রয়েছে। অথচ এ মন্দির কতো দিনের জানো? ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে কলচুরিরাজ নরসিংহদেবের মা রানী অল্হনদেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সরযূ মুচকি হেসে বললে—তাও জানি।

এবার অপ্রতিভ হতেই হলো। বললাম—কী করে জানলে?

কেন অসুবিধা কী? সিঁড়ির গোড়ায় এনামেলের প্লেটে তো লেখাই ছিল—আপনার চোখে পড়ে নি বুঝি?

সরযূর হাসির সঙ্গে আমিও হাসলাম। তারপর বললাম—

যাই হোক, আর একটা খবর বলি। কলচুরি যুগে এই চৌষট্টি-যোগিনীতে ছিল বিখ্যাত এক শৈবমঠ! এই গোলাকার চত্বরে। তাই মঠের নাম ছিল গোলকী মঠ। কলচুরি রাজারা পরম শিবভক্ত ছিলেন। এই গোলকী মঠের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন রাজা কেযূরবর্ষ যুবরাজদেব। তিনি এই মঠের আচার্য সদ্ভাবশম্ভুকে তিন লক্ষ গাভী দান করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিব-সন্ন্যাসীরা এই গোলকী মঠের আচার্যপদ অলংকৃত করেছিলেন। অন্যতম আচার্য ছিলেন বিশ্বেশ্বরশম্ভু। ইনি বাঙালী ছিলেন, জন্মভূমি রাঢ় দেশে। তাঁর সময় বহু বাঙালী শৈব-সন্ন্যাসী এই গোলকী মঠে এসেছিলেন। জানতে এসব কথা?

এবার দাঁত বার করে হাসল সরযূ।

বললে—না, এতো তথ্য জানতাম না। আপনি দেখছি অমুকদাদাকে হার মানাতে পারেন!

আমি বললাম—অমুকদাদা? অমুকদাদাটি আবার কে?

সরযূ হাসতে হাসতে বললে—চেনেন না তাকে? নাম বললে চিনবেন।

আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। যার সঙ্গে মাত্র একদিনের আলাপ, যার ঘর জানিনে দোর জানিনে—তার দাদাকে চিনব কোথা থেকে। নাম জানলেই বা কী?

সরযূ মুখ ঘুরিয়ে আবার বললে—সত্যিই তো, আমারই ভুল হয়েছিল। আপনি কী করে চিনবেন?

মন্দিরের সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়ল। বললে—পাশে বসুন আমার, একটা দর-কারী কথা আছে।

খপ্ করে হাত ধরে টেনে পাশে বসাল আমায়। খুব জরুরী কথা বলার ভঙ্গিতে শুধালো—

আচ্ছা, কাল যে বলছিলেন অমরকণ্টকের কথা, অমরকণ্টক থেকে দিনের পর দিন বনের পথে হেঁটে হেঁটে পাহাড় ভাঙার কথা—অনেক আপনি ঘুরেছেন, তাই না ?
আমি বললাম -
ঘুরেছি মানে আর কী ? নানা জায়গায় তীর্থ দর্শন করে বেড়িয়েছি বলতে পারো।
তা বেশ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এতো যে ঘুরলেন, কেউ জোটে নি ?
সরযূর কৌতুক-প্রশ্নের অর্থ এবার বুঝতে পারলাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—
কেউ জোটে নি সরযূ !
বলেন কি ? সত্যি ?
নির্জলা সত্যি।
আশ্চর্য শান্ত গলায় সরযূ বললে—অমুকদাদার তো জুটেই আছে, বাকি সকলেরই জুটল, খালি আপনারই জুটল না ? আমার তো ধারণা হালের ভ্রমণকারীদের ঐ জোটাটাই মুখ্য—ভ্রমণটা নেহাত ফালতু।
কপট শোকে ম্লান কণ্ঠে বললাম—আমার ভাগ্যটা নিতান্তই মন্দ সরযূ !
লাফিয়ে উঠে দাড়াল আবার। খোলা হাওয়ায় অলকগুচ্ছ কাঁপছে, দুলছে শাড়ির আঁচল। কটাক্ষকোণে সূর্যরশ্মির আভা। বললে—
যাক্, এতোদিনে আপনার ফাঁড়া কাটল। এবার দুঃখ ঘুচবে। দেখুন না কেমন হলো ! এই তো আমি আপনার সঙ্গে জুটে গেলাম—তাই না ?

শংকর জানেন, সে সৌভাগ্যকে আমি গ্রহণ করতে পারি নি। সরযূকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আকর্ষিত হয়েছিলাম। কল্পনার যাত্রাসহচরী যেন সরযূ হয়ে মূর্ত হয়েছিল আমার সামনে। তার সরলতা, তার সরসতা, তার মাধুর্যের বিরল প্রসাদে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। পরম ভাগ্যবন্ত হয়েছিলাম তার মহার্ঘ সঙ্গের আমন্ত্রণে। কিন্তু সেই আমন্ত্রণে আমি সাড়া দিতে পারি নি।
সারাদিন একসঙ্গে কাটালাম দুজনে। ধুঁয়াধারে পিছল পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে প্রপাতের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। জলোচ্ছ্বাসে সূর্যকিরণ পড়ে সপ্ত রঙের খেলা। প্রপাতের উপর ঝুঁকে পড়া পাথরের উপর পাশাপাশি বসে দুচোখ ভরে প্রকৃতির সেই অপূর্ব বর্ণালী দেখলাম। শীকর-শীৎকারে পাণ্ডুর হলো সরযূর রক্তিম গাল, আর্দ্র হলো তার রঙিন বসনাঞ্চল। বনঝাউ-এর নিভৃত ছায়ায় পাশাপাশি দেহ এলিয়ে কাটালাম শুভ্র দ্বিপ্রহর। তারপর অপরাহ্ণে সুদীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম ভিড়াঘাটে নর্মদাতীরে। আমাদের নৌকা ভাসল নর্মদার জলে।
স্থির নিস্তরঙ্গ জল। সবুজ হ্রদ যেন। হ্রদের মতো শান্ত, হ্রদের মতো গভীর। মাঝির

দাঁড় ছপাৎ ছপাৎ করে পড়ছে। ঐটুকু মাত্র শব্দ, ঐটুকু চঞ্চলতা। ভিড়াঘাট থেকে নৌকা বাঁক নিল বাঁ দিকে। প্রবেশ করল মার্বল রক্সের মধ্যে।

দুধারে বিরাট উঁচু উঁচু সাদা পাহাড় নর্মদার জলে ঝুঁকে পড়েছে। ঘুমন্ত নর্মদার বুকে তাদের ছায়া পড়েছে। তাদের গায়ে প্রকৃতির বিচিত্র লিখন, অদ্ভুত জ্যামিতিক কারুকার্য। আরো কয়েকটি নৌকা চলছিল—তাদের ছাড়িয়ে আমাদের নৌকা ভেসে চলল নিস্তব্ধতা থেকে নিস্তব্ধতায়। নির্বাক বিস্ময়ে দুধারে পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা চললাম। সাদা পাহাড়ের শুভ্রতায় কোথাও নীল, কোথাও হলুদ, কোথাও গোলাপীর ছোঁয়া। পাহাড়ের খোঁদলগুলি কোথাও যেন হাতীর পা, কোথাও ঘোড়ার পা, কোথাও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল। দুধারের পাহাড় একজায়গায় এতো কাছাকাছি যে এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায় বাঁদর লাফিয়ে যেতে পারে।

দিন শেষ হয়ে এলো। ঘনতর হলো ছায়া। তীরে পাথরের উষ্ণ চাতালে শুয়ে যে কুমীরটা আরামে ঘুমোচ্ছিল, তার শরীরটা এতোক্ষণে নড়ল। ধুঁয়াধারের দিক থেকে পাহাড় অতিক্রম করে উঠল পূর্ণিমার হলুদ চাঁদ।

চন্দ্রিমার অমৃত ধারায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি পরিপ্লুত। সৌন্দর্যের অমৃত ধারায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ আমাদের অন্তর। মাঝিরা দাঁড়টানা বন্ধ করেছে—আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে তরণী। সেই তরণীবক্ষে দুটি মানুষ। দুদিন আগেও কেউ কাউকে দেখে নি, এখনো কেউ কাউকে চেনে না—শুধু নিঃসীম নিসর্গের অনন্ত রূপের মায়াবন্ধনে বাঁধা পড়েছে দুটি বিহ্বল হৃদয়।

এ কোন্ রহস্য ভরা রৌপ্যময় জগৎ। আকাশ থেকে রৌপ্যধারা ঝরে পড়েছে। দুধারে রৌপ্যময় পাহাড়। গলিত রৌপ্যধারায় পরিপূর্ণ হ্রদ।

সেই হ্রদের মাঝখানে একটি পার্বত্য দ্বীপ। সেই পার্বত্য দ্বীপের উঁচু চূড়ার দিকে চোখ পড়ল। দৃষ্টি যেন ঝলসে গেল অকস্মাৎ। চন্দ্রোদ্ভাসিত সমস্ত বিহ্বল চরাচর যেন সন্নিহিত হয়েছে ঐ পর্বতচূড়ার একটি মাত্র ভাস্বর শিখায়। সমস্ত প্রকৃতি যেন নীরব বন্দনা করছে ঐ পরমোজ্জ্বল পরমাশ্চর্য শিখাকে।

ঐ দ্বীপের মাথায় শ্বেত শিবলিঙ্গ। জ্যোতির্লিঙ্গের মতো দীপ্যমান। মর্ত্যবাসিনী শংকর-কন্যা দেবী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত। ঐ শিবশংকরের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংহত হলো ঐ অনন্ত বিন্দু পানে।

আমার বিহ্বলতাকে মোচন করো হে শংকর, দৃঢ় করো আমার সংকল্পকে। মুক্ত করো অন্ধ মোহপাশ, চেতনাকে উদ্ভাসিত করো তোমার জ্যোতির প্রভায়।

মনে মনে আবৃত্তি করলাম—

কর্মপাশনাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।

শর্মদায় নর্মভস্মকণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥
জন্মমৃত্যুঘোরদুঃখহারিণে নমঃ শিবায় ।
চিন্ময়ৈকরূপদেহধারিণে নমঃ শিবায় ॥

নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়। মরজীবনের প্রতি নিশ্বাসে নমঃ শিবায় এই প্রণামমন্ত্রটি জপ করেছিলেন রানী অহল্যাবাঈ! তিনি ছিলেন মর্ত্যবাসিনী শংকর-কন্যা। তাঁর করুণাঘন হৃদিমন্দিরে সর্বদা ছিল শংকরের আবির্ভাব। সারাজীবন ধরে তিনি শংকর-মূর্তিকে বক্ষে ধারণ করে রেখেছিলেন। নর্মদার তীরে কতো শংকরতীর্থকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।
ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ। প্রখ্যাত হোলকার নৃপতি মলহররাও হোলকারের পুত্রবধ্। অল্প বয়সে বিধবা হন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর অযোগ্য ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে আশ্চর্য যোগ্যতার সঙ্গে ত্রিশ বৎসর ধরে হোলকার রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। ন্যায় সত্য ও ধর্মের গৌরবে তাঁর রাজত্বকাল উজ্জ্বল। শত্রুদমনে যেমন কঠোর, প্রজাপালনে তেমনই হৃদয়বতী।
অহল্যাবাঈ ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখশোকে পাষাণময়ী। অনুপযুক্ত বিলাসী স্বামী খান্দেরাওকে অল্প বয়সে হারান। শ্বশুরের প্রিয় পুত্রবধ ছিলেন—সেই শ্বশুর যখন দেহ রাখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। নিকট আত্মীয়ের বীভৎস শত্রুতার সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধ করেন রাজ্যের কল্যাণে। বালবিধবা কন্যা মাতৃ-অনুরোধ উপেক্ষা করে চোখের সামনে সতীদাহের চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। একমাত্র পুত্র মালেরাও পুণ্যময়ী মাতার সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে কুলাঙ্গার হয়ে যায় ও শেষ পর্যন্ত উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করে।
পাষাণী অহল্যাবাঈ-এর উষর অন্তরে করুণার ফল্গুধারা সঞ্চারিত করেন শংকর। পরমপিতার আশীর্বাদে সুকন্যা অহল্যাবাঈ ভারত ইতিহাসের অবিস্মরণীয়া করুণা-ময়ী। তাঁর সুশাসনে ইন্দোর রাজ্য ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হয়ে ওঠে। এই সমৃদ্ধিকে তিনি গৌরবান্বিত করেন তাঁর অতুলনীয় দানে।
রাজধানী ইন্দোর অহল্যাবাঈ-এর সৃষ্টি। ইন্দোর রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম তাঁর জন-হিতকর পরিকল্পনায় সুখসম্পন্ন হয়েছিল। নর্মদাতীরে মহেশ্বর তীর্থে তিনি এক অতি বিভবশালী মহানগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বহু মন্দির শোভিত যে সুমহান ঘাট তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তা বারাণসীর গঙ্গাঘাটের সঙ্গে তুলনীয়।
অহল্যাবাঈ-এর কল্যাণকীর্তি কেবলমাত্র হোলকার রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শংকরকন্যা নর্মদার তীরে তীরে বহু তীর্থকে তিনি জাগ্রত করেন। অমরকণ্টকের

আদি যাত্রীনিবাস তাঁর সৃষ্টি। সারা ভারতের নানা স্থানে অসংখ্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, রাজবর্ত্ম নির্মাণ, জলাশয় পান্থশালা ও অন্নসত্র স্থাপন, নদীতীরে স্নানঘাট নির্মাণ তিনি করেছিলেন। শত শত দরিদ্র আতুর ও সাধুকে অন্নবস্ত্রদান তাঁর দৈনিক ব্রত। কাশীধামের বিশ্বনাথ ও গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দির তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। বঙ্গদেশ থেকে কাশী পর্যন্ত এক রাজবর্ত্ম তিনি নির্মাণ করেন—অহল্যা-বাঈ রোড নামে আজও যা খ্যাত।

ইন্দোরের পূর্বস্মৃতি। মাত্র ক-বছর আগেকার কথা। ইন্দোর ভ্রমণে গিয়েছিলাম—একজন প্রবীণ রাজকর্মচারীর কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। তিনি দপ্তর ফাঁকি দিয়ে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিলেন, সারা শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়েছিলেন ঘুরিয়ে। দেখেছিলাম লালবাগ মানিকবাগ প্রাসাদ, কাঁচমন্দির, হুকুমচাঁদ ইন্দ্রপুরী। ইন্দোর আধুনিক শহর। বিশাল বিশাল রাজবর্ত্ম, বিরাট বিরাট অট্টালিকা। দোকান-বাজার, সিনেমা-হোটেল, অফিস-আদালত। বস্ত্রশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র। সারাদিন পথে পথে মানুষ আর মোটরের ভিড, সন্ধ্যাবেলা চারদিক আলোয় আলো। নাগরিক বিলাস-বৈভবের অতি-আধুনিক উপচার।

অনেক কিছু দেখার পর বন্ধুকে বললাম—একবার ছত্রীবাগে যেতে হবে।

ছত্রীবাগ? সে যে অতি নোংরা শহরতলি, নিতান্ত ওঁচা পাড়া। সেখানে যাবেন কেন?

চলো না একটু ঘুরে আসি।

বন্ধুর কথা সত্য। ছত্রীবাগ অঞ্চল আধুনিক ইন্দোরের কলঙ্ক। অতি নোংরা পথঘাট, দীনদরিদ্র শ্রমিকের বাস। ভাঙা ভাঙা পুরোনো ঘরবাড়ি, ছাপরা-চালের চায়ের দোকানে গুণ্ডার আড্ডা। ইন্দোরের কোনো সভ্য মানুষ ছত্রীবাগের পথে হাঁটে না। সন্ধ্যাবেলা বিজলীর আলো জ্বলে না কলঙ্কিত পল্লীপথে। সে পল্লীর মাঝখান দিয়ে চলেছে শহরের সমস্ত আবর্জনা নির্গমনের দুর্গন্ধ প্রণালী। তৃণবিরল উঁচুনিচু শুকনো মাঠটা আড়াআড়ি পার হয়ে পৌঁছলাম বদ্ধদ্বারের সামনে। চারদিক পুরোনো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চত্বর, সামনাসামনি বিশাল প্রাচীন গেট।

অনেক ধাক্কা দিতে গেট খুলল—বার হয়ে এলো দুটি প্রাচীন মানুষ। দৃষ্টি তাদের নিষ্প্রভ, জরাজীর্ণ তাদের পোশাক, স্খলিত তাদের পদক্ষেপ। ক্লান্ত বিস্মিত চোখে আগন্তুকদের দিকে তাকাল।

ছত্রীবাগ হোলকার বংশের স্মৃতিমন্দির। উচ্চ প্রাচীর ঘেরা পাশাপাশি দুই উদ্যান।

সেই উত্থানের মধ্যে রাজ পরিবারেব বিভিন্ন ব্যক্তির স্মারক-অট্টালিকা। ক্ষত্রিয়-বাগিচা, মহারাজাদের উত্থান। একদা এই উত্থান মনোরম করে রচিত হয়েছিল, এখন তার কিছু নেই। ঘাস কেউ ছাঁটে না, গাছের ডালপালা কেউ কাটে না, তরুলতার সামান্যতম পরিচর্যা কেউ করে না। মনোরম দীর্ঘিকা পচা ডোবায় পরিণত।

সাতটি স্মৃতিমন্দির আছে। সবচেয়ে যেটি বৃহৎ ও কারুকার্যখচিত সেটি মলহররাও হোলকারেব। সবচেযে ছোট যেটি সেটি অহল্যাবাঈ-এর একলার নয়—মন্দিরটি মূলত খান্দেরাও ও তাঁর তিন পত্নীর নামে উৎসর্গীত। অহল্যাবাঈ খান্দেরাও-এর অন্যতমা পত্নী। অহল্যাবাঈ দেহরক্ষা করেছিলেন নর্মদা তীববর্তী তাঁব প্রিয় নগর মহেশ্বরে—সেখানে তাঁর সমাধিমন্দির আছে।

মহীয়সী মহিষী অহল্যাবাঈ এর স্মৃতিমন্দির দেখতে এসেছিলাম ছত্রীবাগে। আমার বন্ধুটি অনেক বছর ইন্দোরে আছেন। এখানে তিনি কখনো আসেন নি – খবরও রাখতেন না। আমারও না এলেই ভালো হতো।

স্খলিতপদ অতিবৃদ্ধ তুই পরিচারক। আব কেউ নেই। মাসিক পঁচিশ টাকা তাদেব বেতন। সেই টাকা থেকেই তারা একজোড়া লণ্ঠনে তেল ভবে রাখে। দিনতুপুরে ছায়ান্ধকার মন্দিরের কোণে কোণে লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমাদরে আমাদের তারা সব দেখাল। হর্ম্যতল যদিও যথেষ্ট নোংরা, তবু শ্রদ্ধাভরে জুতো খুলে আমরা প্রবেশ করলাম।

পরিত্যক্ত প্রেতপুবী। রাজবংশের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৯৪৮ সাল থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা নজরানা পেয়েও সে বংশ নাকি আজ এতো দরিদ্র যে পিতৃপুরুষের এই গৌরবময় স্মৃতি-রক্ষার ও সংস্কারের কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। ঐ বৃদ্ধ পরিচারক তুটির ক্ষীয়মাণ প্রাণপ্রদীপ নেবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের শেষ যবনিকা পড়বে।

বৃদ্ধ পরিচারক ডানদিকের দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে—এই দেখুন! দেয়ালের গায়ে দেবী অহল্যাবাঈ-এর মূর্তি। অপরিচ্ছন্ন মলিন দেয়াল। মূর্তিও ম্লান। ম্লান গম্ভীর মুখে স্তম্ভিত বেদনার ছায়া, সন্নত তুই চোখে অপার করুণা। দক্ষিণ হাত বুকের কাছে ধরা, অঞ্জলিভরা শিবলিঙ্গ।

ইতিহাসে অহল্যাবাঈ-এর যৎসামান্য উল্লেখ—তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ বিরল। স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত মানচিত্রে ইংরেজ যুগের সামন্ত রাজ্যগুলির চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত। এগুলি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরাধীন যুগে এদের কোনো পৃথক সত্তা ছিল, পৃথক রাজমর্যাদা ছিল—সে কথা

মনে রাখার আগ্রহ গণতান্ত্রিক ভারতে কারুর নেই। এই সব রাজবংশের ভালো-মন্দ, খ্যাতি-অখ্যাতি স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই জনমানস থেকে অবলুপ্ত হয়েছে—তাতেই প্রমাণ হয়েছে প্রজাপুঞ্জের আশা-নিরাশার ও প্রীতিশ্রদ্ধার কতোটুকু অংশভাগী ছিলেন এই বিপুলবিত্তধারী সামন্তনৃপতিরা! এই নৃপতিদের আধুনিক বংশধররাও তাঁদের পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি কতো যে শ্রদ্ধাশীল তার প্রমাণ ইন্দোরের এই মুমূর্ষু ছত্রীবাগ।

অহল্যাবাঈ ইন্দোরের রানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা ভারতের দীনহীন ও পুণ্যাত্মা পরিব্রাজকের হৃদয়-রাণী। সারাজীবনে তিনি কুড়ি কোটি টাকার বেশি দান করে গিয়েছিলেন। জনবিরল হৃতসৌন্দর্য ছত্রীবাগ তাঁর স্মৃতিমন্দির নয়—ভারতের অসংখ্য মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে বারাণসীর গঙ্গাতীরে, গয়ার ফল্গু-বৈতরণীর তটে আর অমরকণ্টক ভিড়াঘাট ও মহেশ্বরের নর্মদাতীর্থে।

সরযূ বললে—এতো করে সাধছি চলুন আমাদের সঙ্গে, এখান থেকে সাগর, সাগর থেকে খাজুরাহো—বলুন যাবেন?

আমি বললাম—বেশি লোভ দেখিয়ো না সরযূ।

স্বচ্ছ হেসে বললে—

লোভ তো সমানে দেখাচ্ছি, কিন্তু লুব্ধ হচ্ছেন কই? আপনি বেড়াতে বেরিয়েছেন, আমরাও বেরিয়েছি। একসঙ্গে গেলে ক্ষতি কী? আমাদের রুটটা কি খারাপ? আমার সঙ্গ কি এতোই অপছন্দ?

আমি বললাম—

তোমার সঙ্গ অমৃত সরযূ, তুমি পূর্ণিমা-কাননের সোমলতা। কিন্তু তোমার রুট আর আমার রুট যে একান্ত আলাদা। তুমি চলেছ দক্ষিণ থেকে উত্তরে, আমার যাত্রা পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

একেবারে সংকল্প করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন?

বাড়ি থেকে সংকল্প করে বার হই নি ঠিক, তবে পথে সংকল্প পেয়েছি। এ যাত্রায় সে সংকল্প আমাকে রাখতেই হবে।

সরযূ বললে কী আপনার সংকল্প, কোথায় আপনি যাবেন?

যাব জ্যোতির্লিঙ্গের পদতলে।

১০

সেই যাত্রায় চলেছি দিনের পর দিন। চলেছি নর্মদা-জননীর কোলে কোলে। কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা বাসে, কিছুটা লরির মাথায়—আবার কিছুটা পায়ে হেঁটে। উদয়-সূর্যকে পিছনে রেখে, অস্তরবির অভিমুখে।

দুধারে পর্বতমালা—বিন্ধ্য আর সাতপুরা। মধ্যে নর্মদা উপত্যকা। মাঝখান দিয়ে নর্মদা নদী প্রবাহিত। তার উত্তর ও দক্ষিণের পর্বতধারাকে বিন্ধ্য আর সাতপুরা এই দুই আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক পার্বত্যবিন্যাসে এই দুই ধারাই এক বিশাল পার্বত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত। নাম তার বিন্ধ্যজগৎ। সে জগৎ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানে এক বিশাল ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নর্মদার এপার ওপার জুড়ে এই অবিচ্ছেদ্য পার্বত্য জগৎ পশ্চিমে আরব সাগরের ক্যাম্বে উপসাগর থেকে পশ্চিমে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। বীরভূমের পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলে এই বিন্ধ্যেরই নিশানা। কর্কটক্রান্তিবৃত্ত এই বিশাল বিন্ধ্য জগৎকে ভেদ করে গেছে। উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি। বিন্ধ্যের উত্তরে উত্তরাপথ, দক্ষিণে দক্ষিণাপথ। সমগ্র বিন্ধ্যজগতের দৈর্ঘ্য সাতশো মাইল, পরিধি চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল।

এই বিন্ধ্যজগৎকে উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ করেছে পশ্চিম প্রবাহিণী নর্মদা। উত্তরাংশের লৌকিক নাম বিন্ধ্য, দক্ষিণাংশ সাতপুরা। বিহারে রাজমহল, ছোটনাগপুর ও রোটাসের পর্বতাবলী, বাঘেলখণ্ডের কৈমুর পর্বতমালা, নরসিংহপুর অঞ্চলের ভাণ্ডের পর্বতমালা, এবং সেখান থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত মালবের বিন্ধ্য পর্বতমালা এই উত্তরাংশের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম সীমান্তে গির্ণার বা রৈবতক। মেকল, মহাদেব ও সাতপুরা পর্বতমালা দক্ষিণ বিন্ধ্যাচলের অন্তর্ভুক্ত। বিন্ধ্যের এই উত্তর ও দক্ষিণাংশ নর্মদা নদীর উৎস মেকলচূড়া অমরকণ্টকে যুক্ত হয়েছে।

এই বিশাল পার্বত্য রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা। দুধারে অরণ্য শ্যাম-গম্ভীর পর্বতমালার মাঝখানে ভারত-ভূগোলের এক আশ্চর্য সৃষ্টি নর্মদা-উপত্যকা। সৃষ্টির পালয়িত্রী, সভ্যতার লালয়িত্রী। শ্যামল ধরিত্রী—মাঝে মাঝে কোথাও অরণ্যসংকুল, কোথাও পর্বতবন্ধুর। কতো কানন, কতো শস্যক্ষেত্র, কতো গ্রাম, কতো জনপদ—কতো ঘাট, কতো তীর্থমন্দির।

নর্মদাশ্রয়ী দুই বিন্ধ্যতীর্থ অমরকণ্টক ও ওংকারেশ্বর। অমরকণ্টক নর্মদার উৎস-

তীর্থ। আর সেখান থেকে পাঁচশো মাইল দূরে নর্মদা যেখানে উদারবক্ষা সেখানে তার গভীর হৃদয়তল থেকে এক বিন্ধ্যশিখরের অভ্যুত্থান। যার শীর্ষে মহাতীর্থ ওংকার। সেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ অমলেশ্বর।

নিরূপণবিহীন কালপরিধির অজ্ঞাত প্রান্তে এই মহতী উপত্যকায় প্রতি কল্পান্তে দেবী নর্মদার দর্শনলাভ করেছিলেন সপ্তকল্পজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয়। মায়ূর, কৌর্ম, পুর, কৌশিক, মাৎস্য, দ্বিরদ ও বারাহ—এই সপ্তকল্প। মার্কণ্ডেয় বলছেন —
আমি সপ্তকল্পজীবী। প্রতি কল্পান্তে প্লাবনের মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি যখন বিনষ্ট, সমস্ত জগৎ যখন মহাসমুদ্রে বিলীন তখন শংকরের বরে আমি জীবিত ছিলাম। সেই অন্তবিহীন একার্ণবে একাকী সন্তরণ করতে করতে প্রতিবারই আমি এক কামগামিনী নদীর দর্শন পেলাম। সেই নদী অনন্ত সাগর মধ্যেও স্বরূপা—মহা আবর্তসংকুলা, শুভ্রফেনতরঙ্গায়িতা।
মার্কণ্ডেয় আরো বলছেন—
সেই স্বপ্রতিষ্ঠা তটিনীর বক্ষে আমি দেখলাম একার্ণবে ভ্রমন্ত্যেকা চন্দ্রনিভাননা দেবী। মহা বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—কে তুমি ? তুমি কি বেদমাতা গায়ত্রী বা বাগ্দেবী সরস্বতী ? তুমি কি সাগরোত্থিতা লক্ষ্মী অথবা শিখরবাসিনী উমা ? তুমি কি সবিদ্বরা স্বর্গমন্দাকিনী অথবা কালরাত্রি করালিনী ?
সেই দেবী আমাকে রক্ষা করলেন, আশ্রয় দিলেন। বললেন—
আমি রুদ্রাঙ্গ-সমুদ্ভূতা, আমি পাপহরা স্রোতস্বতী—আমি অমৃতা নর্মদা।

প্রলয় বা মহাপ্রলয়, যুগান্ত বা কল্পান্ত—এক অপ্রতিরোধ্য অকল্পনীয় সর্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়—যার ফলে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির চরম ধ্বংস। আবার এই সম্পূর্ণ ধ্বংসের অবসানে নূতন করে সৃষ্টির উন্মেষ। এই প্রলয়ের ধারণা আদিম কাল থেকে মানুষের মনে স্থিতিলাভ করেছে। মানুষের ধর্মচিন্তা, পরিণামবাদ, পাপপুণ্যবোধ যুগে যুগে এই ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই ধারণা আশ্রয় পেয়েছে মানুষের কল্পনায়, জাতির পুরাণে।
প্রতীচ্য পুরাণেও প্রলয়-ভাবনা আছে। গ্রীক পুরাণে একাধিক মহাবন্যার উল্লেখ —এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ডিউক্যালিয়নের প্রলয় কাহিনী। অনন্ত জীবনসন্ধানী গিলগামেশকে মহাপ্রলয়ের কাহিনী শুনিয়েছিলেন চিরঞ্জীব উটনাপিশটিম। বাইবেলেও আছে মহাপ্রলয়ের কাহিনী—সে প্রলয়ের পূর্ণগ্রাস থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন নোহা।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে এমনি প্রলয়ের সংখ্যা একাধিক। ব্রহ্মার এক একটি অহো-রাত্র এক একটি কল্প। এক এক কল্পের অবসানে এক এক প্রলয়। কল্পক্ষয়সঞ্জাত মহাপ্রলয়কালে স্থাবর জঙ্গম অন্তচিহ্নিত সর্ব বাস্তব অনন্তে বিলীন হয়, অস্তি-নাস্তির ভেদাভেদ থাকে না। তখন সকল প্রাণী বিনষ্ট হয়, বিলুপ্ত হয় সূর্যচন্দ্রতারা। অনন্ত তমসাব বক্ষে কেবল ব্যক্ত অব্যক্তরূপী মহান্ একমেব সনাতন পুরুষ বিচরণ করেন। বর্তমান যে কল্প তারও সূচনা প্রলয়ান্তে। সেই প্রলয়পয়োধি মধ্যে শায়িত ছিলেন পরমপুরুষ বিষ্ণুনারায়ণ। তাঁব নাভি থেকে বর্তমান কল্পের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির তিনি পালয়িতা। তাই কৃত যুগ থেকে কলি পর্যন্ত যুগে যুগে বারে বারে তিনি নব নব অবতার-রূপ পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হচ্ছেন পরিত্রাণায় সাধুনাম্ চ বিনাশায় দুষ্কৃতাম্। কলির সন্ধ্যায় কল্পান্ত যখন ঘনিয়ে আসবে তখন তিনি আসবেন শেষ অবতাব কল্কিরূপে। তারপর আবার মহাপ্রলয়।

এই মহাবন্যারূপী প্রলয়ের কল্পনা মানুষের মনে কোথা থেকে এলো? পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলবাসী বিভিন্ন প্রাচীন জাতির পুরাণে একই রকমের প্রলয়-কাহিনী কী করে জন্ম নিল? পুরাণের আরম্ভ কবে?

মানবসভ্যতার প্রভাতী যুগকে কল্পনা করি। সে যুগে এই বিরাট ও প্রচণ্ড বিশ্ব-প্রকৃতির সামনে মানুষ কতো দুর্বল, কতো অসহায়! নির্বোধ সে, নিরস্ত্র সে—সম্পূর্ণ শক্তিহীন সে। প্রতি মুহূর্তে এই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মাঝখানে তাব আতঙ্কিত পদক্ষেপ। প্রকৃতি ঝঞ্ঝারূপে তাকে ধ্বংস করে, বন্যারূপে বিধ্বস্ত করে, তুষার ও হিমবাহরূপে সমাধিস্থ করে।

সে আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার কথা। তখন পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সব বিশালকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরও জন্ম হয়েছিল। সেই মানুষের কাজ ছিল অন্যান্য বলিষ্ঠতর প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা, নিম্নশ্রেণীর প্রাণী শিকার করে ও বন্যগুল্মাদি সংগ্রহ করে উদরপূর্তি করা ও গুহা-কন্দরে বা অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে কালাতিপাত করা ও বংশবৃদ্ধি করা।

ভূতাত্ত্বিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে এই মহাপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কালে সৃষ্টির বুকে কয়েকবার তুষার যুগ নেমে এসেছিল। এক একটি তুষার যুগে হাজার হাজার বছর ধরে তুষার ও হিমবাহের আক্রমণে সৃষ্টি অনড় হয়েছিল—আবার হাজার হাজার বছর ধরে তুষার ও হিমবাহ গলেছিল। তুষার যুগের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল—সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসে অনেক প্রাণীর দৈহিক রূপ ও জীবনযাত্রার অভ্যাস বিবর্তিত

হয়েছিল—যেমন প্রাগৈতিহাসিক বিশাল-করীর সারা গায়ে ঘন লোমগজিয়েছিল। তবু তারা বাঁচতে পারে নি। তুষার যুগগুলি যখন শেষ হলো, তখন প্রাগৈতিহাসিক বিরাটকায় অধিকাংশ প্রাণীই বিলুপ্ত হয়েছে। তবে অনেক মরে মরেও বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি—মানুষের বিবর্তনের ধারাটি ঠিক আছে।

উত্তর থেকে ইউরোপ-এশিয়ায় যে তুষারযুগ নেমে এসেছিল তা থেকে বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিও পরিত্রাণ পায় নি। এ অঞ্চলগুলি তুষার আচ্ছাদিত না হলেও সম্পূর্ণভাবে জলপ্লাবিত হয়েছিল। পৃথিবীর উত্তরাংশের তুষার যুগের সঙ্গে সঙ্গে এই উষ্ণতর মধ্য অঞ্চলে নেমেছিল প্লাবন যুগ। বিভিন্ন তুষার যুগের সেই মহাপ্লাবনই মহাপ্রলয়, যা নানা প্রাচীন পুরাণের স্মৃতিভাণ্ডারে জমা আছে।

স্কন্দপুরাণ বর্ণিত বিভিন্ন প্রলয়ের কল্পনার উৎস প্রাগৈতিহাসিক কালের বিভিন্ন তুষার বা প্লাবন যুগ। এক এক প্লাবন যুগে সহস্র সহস্র বছর ধরে সমগ্র ভারতভূমি বিশাল জলরাশির গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিল। গঙ্গা প্রমুখ উত্তর ভারতীয় নদীগুলির চিহ্ন মাত্র ছিল না। গঙ্গার বর্তমান ভৌগোলিক রূপও হয়তো তখন স্পষ্ট হয় নি। হিমালয় হয় নি এতো উন্নতশির।

অমরকণ্টকে কপিলধারা প্রপাতের পাশে বসে যাত্রাসঙ্গী কান্‌হাইয়ালাল এক আশ্চর্য প্রশ্ন করেছিল, বলেছিল—গঙ্গা যখন ছিলেন স্বর্গে, নর্মদা তখন ছিলেন মর্তে, তাই না? ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গায় মর্তাবতরণের অনেক আগেই নর্মদা মূর্তিময়ী হয়েছিলেন, তাই না?

কান্‌হাইয়ালালের এই ধারণা সত্যাশ্রয়ী। কানহাইয়ালালের প্রশ্নের উত্তর মার্কণ্ডেয়ের প্রলয়-বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেই সর্বগ্রাসী প্লাবনে সারা উত্তর ভারত যখন দিক্‌চিহ্নবিহীন অনন্ত জলধিতে পরিণত তখন হয়তো বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যবর্তী গভীর উপত্যকায় নর্মদার স্রোতোধারা এই মহা একার্ণবের মধ্যেও নিজস্ব রূপ নিয়ে টিঁকে ছিল। এবং এই উপত্যকার নিভৃত আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল মনুষ্যজাতির কয়েকটি প্রাণী। মনে হয় সৃষ্টির সেই আদিম নির্ভরতার স্মৃতিকেই স্কন্দপুরাণ মার্কণ্ডেয়-কাহিনীর মধ্যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ধারণ করে রেখেছে।

বিভিন্ন প্লাবন যুগে পর্বতসানুবর্তী এই নর্মদা-উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে অতি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই শতাব্দীর আরম্ভ থেকে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা নর্মদা-উপত্যকায় প্রাক্‌-ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব

সম্পর্কিত তথ্য আবিষ্কারের জন্যে সন্ধানী অভিযান আরম্ভ করেছেন। এই অনুসন্ধানের সূচনা করেন ১৯০৫ সালে পিলগ্রিম নামে এক ভূতাত্ত্বিক ও তাঁর সঙ্গীরা। পিলগ্রিম এখানে প্রাচীনতম ধরনের এক প্রস্তর-কুঠার আবিষ্কার করেন। তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হন যে এটি কোনো প্রাকৃতিক প্রস্তরখণ্ড নয়, আদিপ্রস্তর যুগের মানুষের হাতের তৈরি ও ব্যবহৃত প্রস্তরাস্ত্র।

পিলগ্রিমের এই ঘোষণার পর নর্মদা-উপত্যকা সারা পৃথিবীর প্রাক্-ইতিহাস গবেষকদের আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকবার এই নর্মদা-উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক গবেষণামূলক অভিযানে ব্রতী হন। প্রধান উল্লেখযোগ্য ইয়েল ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত অভিযান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল গবেষক অমরকণ্টক থেকে নরসিংহপুর পর্যন্ত নর্মদা-উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে অনুসন্ধানে রত হন। পুণা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা পশ্চিমাঞ্চলে মহেশ্বর এলাকায় অনুসন্ধান করেছেন। বরোদা ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ও এই গবেষণাব্রতে উৎসাহী।

সন্ধানব্রতী পণ্ডিতরা নর্মদার তীরে তীরে সেই মানবসভ্যতার অন্বেষণ করেছেন যা আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছরেরও পুরাতন। নর্মদা-উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে তারা উদ্ঘাটন করেছেন পুরাপলীয় যুগের বহু প্রস্তরাস্ত্র ও জান্তব ফসিল। প্রমাণিত হয়েছে যে নর্মদা উপত্যকা পুরাপলীয় মানবসভ্যতার এক বিশিষ্ট আধার। বিশ্বমানবসভ্যতার আদি বিকাশ মধ্য ভারতের এই নর্মদাতীরেই মূর্ত হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা।

সেই আদিম কালের প্লাবন ও প্লাবনোত্তর যুগ মিলিয়ে নর্মদার ভূত্বকে সাতটি বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি স্তরের মধ্যেই পুরাপলীয় মানব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সাতটি স্তর সাতটি কল্প। প্রতিটি প্লাবন-প্রলয়ে নর্মদা-উপত্যকায় আদি মানবসভ্যতা রক্ষা পেয়েছে। পুরাপলীয় যুগে টিঁকে থেকে থেকে পৌছেছে নবপলীয় সভ্যতায়। তারপর এগিয়ে চলেছে আত্মবিকাশের নব নব যুগধারায়। আদিম সেই সপ্তকল্প ধরে মানবসন্তান মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করেছিলেন একার্ণবে ভ্রমন্ত্যেকা অমৃতা নির্ঝরিণী নর্মদা।

সারাদিন ধরে ধরে ধূলিধূসর পথে উত্তরাভিমুখী হেঁটেছি। দশ মাইল পথ—করেলি রেল স্টেশন থেকে নর্মদার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত। শত শত যাত্রীর সঙ্গে পা মিলিয়ে। সাময়িক গোটা কতক বাস অবশ্য দিয়েছে। কিন্তু সে বাসে ওঠা কার সাধ্য! সারা দেশ ঝেঁটিয়ে লোক চলেছে পৌষসংক্রান্তির মেলায়।

দিনান্তে পৌছলাম অভীপ্সিত ব্রহ্মাণ তীর্থে। ওপারে মন্দিরের চূড়া তখন অস্তসূর্যের

রশ্মিতে লালে লাল।

ব্রহ্মাণ নর্মদাতীরের মহাতীর্থ। এখানে স্বয়ং ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন। তাঁর নামে ব্রহ্মকুণ্ড। চন্দ্র-সূর্য প্রণতি করেছিলেন নর্মদাকে। তাঁদের নামে চন্দ্রকুণ্ড। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস কালে এখানে এসেছিলেন। তাঁদের স্মরণে ভীমকুণ্ড ও অর্জুনকুণ্ড। ব্রহ্মাণ ঘাট থেকে মাইল দেড়েক পূর্বে যেখানে নর্মদা পাহাড়ের মাঝে মাঝে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়েছেন সেখানে নর্মদার নাম সপ্তধারা।

ব্রহ্মাণে নর্মদার বিশাল প্রসার। এপার ওপারের মাঝখানে বিশাল চড়া পড়েছে। সেই চড়ায় হাজার হাজার যাত্রীর সমাবেশ। বহু দোকানপাট। নানা দেশের নানা সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়। বর্ষায় এই চড়া আর থাকে না। বিশালবক্ষা মহাবর্তসংকুলা নদী এপার ওপার ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

উত্তর দক্ষিণ দুই তটেই লাল পাথরের মস্ত ঘাট। দুদিক জুড়েই তীর্থ। মাঝখানে নর্মদাবক্ষে একটি প্রস্তরদ্বীপ। সেই দ্বীপেও তীর্থ।

শীতকালে নর্মদাধারা ঝিরঝির করে বইছে। নদীর বুকে খুঁটি পুঁতে সেই খুঁটির মাঝখানে বাঁশ বিছিয়ে ও বাঁশের উপর জঙ্গলের ঝাঁকড়া পাতাভর্তি কাঁচা ডাল ফেলে সাময়িক একটি সেতু হয়েছে। অতি সাবধানে পা ফেলে সে পলকা সেতু পার হওয়ার কথা। কিন্তু মেলার দিনে সে সাবধানতাকে কে গ্রাহ্য করে? শত শত লোক দু-পয়সা করে টোল দিয়ে পারাপার করছে।

ব্রহ্মাণ নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত। নরসিংহপুর জেলার প্রধান শহর নরসিংহপুর। জব্বলপুর থেকে নরসিংহপুর যাবার কোনো রাস্তা নেই। জব্বলপুর নর্মদার উত্তর তীরে, নরসিংহপুর নর্মদার দক্ষিণে। রেলপথে যাওয়াই সুবিধে। পথে রেলওয়ে সেতু আছে—সেই সেতু দিয়ে নর্মদার পারাপার। অদূরে দক্ষিণ থেকে সিনোর নদী নর্মদায় এসে মিশেছে। এইখান থেকেই নরসিংহপুর জেলার আরম্ভ।

রেলযাত্রা কয়েক ঘণ্টার মাত্র। নরসিংহপুরের মাইল দশ দূরে পরবর্তী স্টেশন করেলি পর্যন্ত। করেলি থেকে উত্তরমুখী রাস্তায় হেঁটে পৌঁছেছি নর্মদাতীরে—ব্রহ্মাণতীর্থে। ব্রহ্মাণের কাছে সিমেণ্ট কংক্রিটের মস্ত পাকা ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। শেষ হলে এপার ওপার সংযুক্ত হবে। ছিন্দোয়াড়া থেকে নরসিংহপুর হয়ে সোজা উত্তরে পাবলিক বাস ছুটবে সাগর পর্যন্ত।

ব্রহ্মাণ নর্মদা-শংকরের লীলাক্ষেত্র। এপারে শংকর ওপারে শংকর, নর্মদাবক্ষেও তিনি। দক্ষিণ তীরে টিলার মাথায় মাথায় চার পাঁচটি মন্দির। প্রধান শংকরমন্দির ও ঘাট নির্মাণ করেছিলেন রানী দুর্গাবতী। শারদামন্দিরটি দর্শনীয়। শারদামন্দিরে আছেন শ্বেতপাথর নির্মিত শুভ্রধবলা সরস্বতী। আর আছেন দেবী দুর্গা। উত্তর

তীরে ব্রহ্মাণ গ্রাম। প্রধান মন্দির শংকর-নর্মদার। দুই তীরের মাঝখানে কিছুটা পূর্বদিকে শিলাদ্বীপ। অযত্নবর্ধিত ঘন জঙ্গলে ঘেরা। সেই দ্বীপের উপর প্রাচীন শিবমন্দির। অন্য মন্দিরগুলির মতো নয়। এই মন্দিরে যাওয়া শক্ত। যাত্রী দুর্লভ। উত্তর তীরে থেকে নৌকা করে পূজারী গিয়ে এই মন্দিরে পূজা দিয়ে আসেন।

ব্রহ্মাণতীর্থে নর্মদার অতি অপূর্ব মূর্তি। অমরকণ্টকে যেমন দেখেছিলাম। শংকর-নন্দিনী ধূসরমেঘসন্নিভা শ্যামা। অমরকণ্টকের মতো এখানেও কালো কষ্টিপাথরে গড়া কন্যা মূর্তি। অমরকণ্টকে পাপহরা নর্মদার পূজা দিয়েছিলাম বিরলভক্ত নির্জনে। এখানে অসংখ্য উন্মাদ ভক্তের ভিড়ের মধ্যে কায়ক্লেশে পৌঁছলাম দেবী-মূর্তির কাছে। অমরকণ্টকে তাঁর পদতলে শান্ত মনে বসে প্রাণভরে তাঁকে দেখেছিলাম—এখানে এই প্রচণ্ড জনসমাবেশে একটি মুহূর্তের জন্য তাঁর দর্শনলাভ মহাভাগ্য।

তাই বলে দুঃখ নেই। মেলায় মেলায় আমি অনেক ঘুরেছি। মেলা আমার বড়ো প্রিয়। মেলা নামে মিলন। অগণিত ভক্ত প্রাণের মহামিলন। সহস্র ভক্তের বন্দনা-গানে যে লগ্ন মুখরিত সেই লগ্ন মহা পুণ্যলগ্ন। পৌষসংক্রান্তির দিন ব্রহ্মাণতীর্থে মহামেলা। নরসিংহপুর জেলার প্রতি গ্রাম ঝাঁটিয়ে তো এসেছেই—দূর-দূর থেকেও যাত্রীর বাধা-বিরাম নেই। উত্তরে দামো সাগর থেকে দক্ষিণে বেতুল ছিন্দোয়াড়া পর্যন্ত, পূর্বে শাডোল থেকে পশ্চিমে নিমাড় পর্যন্ত সব জায়গায় যাত্রীরা এসেছে। দলে দলে সাধুরা এসেছেন—নদীতীরে, পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের চাতালে তাদের জমায়েত বসেছে। মাথায় জটা, দীর্ঘ শ্মশ্রু, অর্ধোলঙ্গ ভস্মমাখা দেহ। ধনী ভক্তরা ভিন্ন ভিন্ন ভাণ্ডারায় তাদের সেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। এসেছে রাজ-স্থানী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয়, গোঁড।

এই পৌষসংক্রান্তির দিনে এই পুরাণপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণতীর্থে সারা মধ্য ভারতের প্রাণ নর্মদা-শংকরের চরণে নিবেদিত। আমি দূর পূর্ব ভারতের একমাত্র আগন্তুক—মহামানবের এই সুবিপুল মিলনক্ষেত্রে আমার প্রণামটিও আমি রাখলাম।

অনন্ত জনসমুদ্র—কূল নেই, পার নেই। এক হয়ে গেছে নদীর এপার আর ওপার। সেই সমুদ্রের মধ্যে আমি একলা অচেনা মানুষ—কখনো ভাসছি কখনো ডুবছি। তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে ছিটকে পড়ছি এপাশ থেকে ওপাশে। দূর পশ্চিম বঙ্গের একটি মাত্র মানুষ আমি এই লক্ষ লোকের জনতায়—ভিন্ন রাজ্যবাসী, ভিন্ন-ভাষাভাষী। তাই বলে একেবারে ভেসে যাই নি—একেবারে ডুবে যাই নি। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছেছি, বেলাভূমিতে পা ছড়িয়ে বসে দেখছি লোক-

তরঙ্গলীলা।

নর্মদার দক্ষিণ তীরে ফিরে এসেছি কাঁচা বাঁশের পুল পার হয়ে। এ দিকে বিরাট চড়া পড়েছে। সেই চড়া জুড়ে মেলার জোর বাহার। সার সার অস্থায়ী দোকান। কাপড়ের দোকান, কম্বলের দোকান, খাবারের দোকান, পানবিড়ির দোকান। অবধি নেই মনোহারি দোকানের। বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার উপর তক্তা বিছানো। চটের দেয়াল, চটের ছাদ। সামনে বেঞ্চি। খাবারের দোকানগুলির পিছনদিকে ভিয়ান—সারারাত্রি কাজ, সারাদিন বিক্রি। চায়ের দোকানের উনুনেও রাতভোর আঁচ।

এমনি এক বড়োসড়ো খাবারের দোকানকে আশ্রয় করেছিলাম বিকেলবেলা। সামনে ইয়া ইয়া বারকোশে বুরুজ করে ঢালা নানা রকমের আর নানা সাইজের পেঁড়া গজা লাড্ডু আর কটকটি। পিছনে বিশাল-হাঁ দুই গনগনে উনুনে তপ্ত কড়াই—পুরী-ভাজি বানাবার বিরাম নেই। একধারে চায়ের বন্দোবস্ত। মালিক লোক-লস্কর আর মালপত্র নিয়ে বেশ ক-সপ্তাহের জন্য এখানে গেড়ে বসেছে—পাকা দোকান নরসিংহপুরে। খদ্দেরের বিরাম নেই। আট দশটা কর্মচারী খাবার বানিয়ে আর বেচে হিমসিম খাচ্ছে দিনরাত। অমায়িক লোক, কর্মচারীরা বাবুরামজী বলে ডাকে।

ভিয়ানঘরের গরম আবহাওয়ায় বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে আর বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আরামে রাতটা কাটালাম। সেখানেই রাখলাম ব্যাগ আর কম্বল। পরদিন সারাবেলা ঘুরলাম এপারে ওপারে মন্দিরে মন্দিরে মেলার ভিড়ে ভিড়ে। মেলার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মতো মজা আর নেই। ঢেউ হয়ে সমুদ্রের মধ্যে নিশ্চিন্ত বসতি।

বরোদা থেকে এক ধনী শেঠ এসে নদীতীরের অনেকটা জুড়ে বিরাট এক ভাণ্ডারা লাগিয়েছেন। মস্ত চৌকো জায়গা দড়ি দিয়ে ঘেরা। সামনের গেটে লাল শালুর ফেস্টুন, বাঁশের ডগায় ডগায় লাল-হলুদ পতাকা। বসিয়ে খাওয়াবার উপায় নেই—এতো ভিড়। তাই লাইন লেগেছে। ভিক্ষার্থীর লাইন নয়, বাঞ্ছিত নিমন্ত্রিতের লাইন। শেঠজীর সাঙ্গোপাঙ্গরা যাত্রী পছন্দ করে করে আইয়ে-আইয়ে বলে লাইনে ঢোকাচ্ছে।

সেই আইয়ে-আইয়ের আমন্ত্রণে আমিও লাইনে ভিড়ে গেলাম মধ্যাহ্নবেলায়। লাইনের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন গলাবন্ধ সাদা কোট পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। গলায় গাঁদা ফুলের মালা, চন্দনচর্চিত কপাল। চাঁচাছোলা ফরসা মুখে বিনয়-প্রসন্ন হাসি। পাশের কর্মচারীরা পাতার ঠোঙায় করে চারখানি করে ঘৃতপক্ক রুটি

কিছুটা তরকারি আর দুটি লাড্ডু তুলছেন। শেঠ একটি করে ঠোঙা দিচ্ছেন লাইনবন্দী প্রতি লোকের হাতে হাতে। দিচ্ছেন আর প্রত্যেককে দুহাত তুলে নমস্কার করছেন। পাশেই আছেন একটি মোটাসোটা মধ্যবয়সী মহিলা। শেঠের শেঠানী হবেন। লাইনের মধ্যে যারা সাধু, তারা খাবারের ঠোঙা নিয়ে যাচ্ছে তাঁর সামনে। তিনি তাদের প্রত্যেককে দিচ্ছেন একটি করে ছাইরঙা তুলোর কম্বল। আর তেমনি হাত তুলে নমস্কার করছেন।

কম্বল অবশ্য আমার জুটল না—তবে সহস্র যাত্রীর সঙ্গে ভাণ্ডারার ভোজে দ্বিপ্রহ-রের ক্ষুন্নিবৃত্তি হলো। আঙুল চাটতে চাটতে খাবারের দোকানে এসে এক ঘটি জল গেলাম।

বাবুরাম নিজ হাতে ঝকঝকে লোটা ভর্তি জল আমার হাতে তুলে দিল।

লোটা শেষ করে বললাম—বাবুরামজী আজ আমি বিদায় নেব।

কখন যাবেন?

এই বিকেলের দিকে।

বাবুরামজী বললে—এখান থেকে কোথায় যাবেন শেঠ?

নর্মদামায়ীর কাছে কাছেই থাকব। এই ব্রহ্মাণেরই মতো নর্মদাতীরের বড়ো বড়ো তীর্থগুলি দেখে বেড়াব। অমরকণ্টক থেকে আসছি—নর্মদার সঙ্গমতীর্থ পর্যন্ত এমনিভাবে পৌছবার ইচ্ছে আছে।

অনেক পুণ্য, সেই সঙ্গে অনেক কষ্ট আপনার ভাগ্যে আছে। এখানেই কি কম কষ্ট আপনার হলো?

আমি হেসে বললাম—কী আর কষ্ট বাবুরাম ভাই? খেলাম দেলাম, তোমার আশ্রমে রাত কাটালাম—মহানন্দে তীর্থদর্শন করলাম।

বাবুরামও হেসে বললে—কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। আর কষ্ট ভাবলে নিস্তার নেই। তাঁর একটা কথা বলি—পিষণহারীর মন্দিরে ভালো করে পূজো দিয়ে যান। তা-হলে আর কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হবে না।

সব মন্দিরগুলিই আবার দেখে বেড়ালাম,—সেই সঙ্গে পিষণহারীর মন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে এক বিচিত্র কাহিনী আছে। সেই কাহিনী-মাহাত্ম্য স্মরণ করে পরিক্রমাবাসীরা এখানে পূজা দেন। দেবতার প্রসাদে পরিক্রমাবাসীর সব দুঃখভয়ের পরিত্রাণ হয়।

প্রায় দুশো বছর আগে এখানে এক পরম ভক্তিমান দম্পতি বাস করতেন। স্বামী ছিলেন সংসারবিমুখ উদাসীন, সারাক্ষণ নামকীর্তনে অতিবাহিত করতেন—নাম ছিল রামদীন। সংসারনির্বাহের সব ভার বেচারী স্ত্রীর ওপর, তিনি নীরবে সেই

দায় পালন করতেন। প্রতিবেশীদের গম আর বাজরা তিনি দিনরাত তাঁর চাকীতে পিষে দিতেন—বিনিময়ে যা পেতেন তাই দিয়ে স্বামী সন্তানের পেট ভরাতেন। তাদের প্রতিপালন করাই তাঁর দেব আরাধনা।

এই সেবার প্রতি ভগবানেরও বুঝি মাৎসর্য ছিল। স্বামী সন্তানদের তিনি অকালে হারালেন। মনে মনে বললেন—প্রভু এতোদিন যাদের উপাসনা আমি করে এসেছি তুমি তাদের সকলকে কেড়ে নিয়েছ। এইবার তোমার উপাসনা করবার সময় হয়েছে। কিন্তু কী দিয়ে করব? আমি তো মন্ত্র জানিনে, পূজা জানিনে—জানি কেবল চাকীতে গম পিষতে।

সেই চাকীটি বুকে আঁকড়ে ধরলেন পিষণহারী। দিনরাত্রি সমানে পরিশ্রম চলল। প্রতিজ্ঞা করলেন—এই গম পেশার কাজ থেকে সারা জীবন যা কিছু সঞ্চয় করবেন—তা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন দেবমন্দির। পরিণত বয়সে সেই নিত্যশ্রমদাত্রী বিচিত্র পূজারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। পিষণহারীর মন্দির নামে তা খ্যাত হলো।

এবার ফেরার পালা। কিন্তু ফেরার কোনো উপায় নেই। দু-তিনটে ছোট বাস দাঁড়িয়ে আছে—বাসের সীটে, ছাদে, মাডগার্ডে তিলার্ধ স্থান নেই। খালি বাস আবার সন্ধ্যার মুখে ফিরে আসবে। সেই ট্রিপে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে দশ গুণ লোক এখন থেকে তৈরি হয়ে পোটলা পুঁটলি গুছিয়ে বসে আছে। সেই জনতা ভেদ করে কোনো একটা বাসে কখনো যে আশ্রয় পাব সে আশা নেই। তাই পা ছড়িয়ে বসলাম বেঞ্চিতে—গুরুভার উদর। আজ রাতটাও এই বেঞ্চিতে কাটাব—হাঁটা শুরু করব কাল ভোরে করেলি স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ কানে এলো, কে যেন ডাকছে—সাব, ও সাব?

কে ডাকছে? কাকে, আমাকে নাকি? ফিরে দেখি অদূরের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসা একটা লোক আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই হাত নেড়ে ডাকল।

আশ্চর্য হলাম সম্বোধনটা শুনে। ডাক তো অনেক রকমেরই আছে, কিন্তু এ ডাকটা নিতান্ত নতুন। সাব বলে ডাক কেন? আমি সাহেব হলাম কোথা থেকে? কী আশ্চর্য—ভুসো পাতলুনটা অবশ্য পরা আছে, তাই বলে মধ্য ভারতের এই মহামেলার বিপুল জনতার মাঝখানে আমাকে সাহেবের মতো দেখাচ্ছে নাকি?

পায়ে পায়ে এগিয়ে কাছে গেলাম। ঠাসাঠাসি বেঞ্চিটার এক কোণে বসেছিল। কড়া ধমক দিয়ে অন্য লোকগুলোকে হটিয়ে দিল। তারপর কাঠের উপর চাপড়

মেরে বললে—

বৈঠিয়ে না সাব! চায় পিয়েঙ্গে?

আমি ভালো করে তাকালাম লোকটার দিকে। তামাটে মুখ, কটা চুল, খাঁড়ার মতো নাক, গালে দিনদুই-এর খরখরে দাড়ি। বলিষ্ঠ চেহারা, মোটা হাতের কব্জি।

পরনে ময়লা ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, পাঁশুটে রঙের টুইডের পুরোনো টাইট কোট, গলায় জড়ানো রঙিন মাফলার, পায়ে রঙ-ওঠা ভারী বুটজুতো। যে ডাকছে সেই তো দেখছি পাকা সাহেব — আমাকে আবার সাহেব ডাকে কেন?

বললাম—না চা খাব না, একটু জল খাব ভাবছিলাম!

বললে—তা কেন? এই তো দেখলাম এক লোটা জল খেলেন। এখন চা খান। এ বালক, বালকরাম রে, জলদী চা লাগা এক কাপ!

পাশে বসে চায়ে চুমুক দিলাম। পকেট থেকে ঝটিতি বার করে সামনে এগিয়ে ধরল চারমিনার প্যাকেট। তারপর আয়েসী গলায় বললে—

কহিয়ে সাব দুনিয়াকা হালচাল!

অস্বস্তিকর হৃদ্যতা। তবে আমিও সাহেব, তুমিও সাহেব। তোমারও পাতলুন, আমারও পাতলুন। পাতলুনে পাতলুনে কোলাকুলি।

বললাম—আপ কেয়া বোলতেহে সাব! ইহা বৈঠ্‌কর দুনিয়াকা খবর কেয়া বলুঙ্গা?

হিহি করে হাসল। বললে—ঠিক বলেছেন সাব! এ শালার জায়গা দুনিয়ার বাইরে। স্রিফ জঙ্গল—জংলী মেলা দেখতে এসেছেন বুঝি? কোথা থেকে!

আমি বললাম—জব্বলপুর থেকে।

জব্বলপুরেই থাকেন?

না, কলকাতায় থাকি। কলকাতা থেকে এদিকটা ঘুরতে এসেছি।

ঠিক ধরেছি সাব। দূর থেকে দেখেই বুঝেছি। তা এ মেলায় কী দেখলেন সাব?

কী দেখলাম কী করে বলব? কতো কীই তো দেখলাম?

আক্ষেপ করে বললে—কলকাতার আমার লোক আপ্‌ লোগ সাব! আপনাদের কিছুই দেখবার নেই এখানে। সব জংলী, সব দেহাতী. সবই গন্ধা! একঠো চীজ আছে, তবে উয়োভী আপনাদের চোখে লাগবার মতো নয়!

একটু ঔৎসুক্য হলো। শুধোলাম—

কোন্ চীজ সাব?

ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছিল এক আদিবাসী যুবতী। তার অনবগুণ্ঠিত স্তনভারের

দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললে—ওহী চীজ।

সাহেবে সাহেবে দোস্তি। মস্ত একটা রসিকতার কথা দোস্তকে শুনিয়েছে তাই কথা শেষ করেই হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল।

খুব প্রসন্ন মনে দোস্তের সে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। আমার অপ্রসন্নতা লোকটাব চোখ এড়াল না। একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—

ড্রাইভার লোক সাব আমরা, আমাদের আলগা কথা—মনে কিছু কববেন না।

আমি চমকে উঠলাম।

আপনি বাস-ড্রাইভাব ?

বাস-ড্রাইভার হব কোন্ দুঃখে সাব ? আমি লরি-ড্রাইভার। ঐ যে পুল বানাচ্ছে না ? কণ্ট্রাকটরের লরি করে স্টেশন থেকে মাল নিয়ে আসি। লোহা আনি, সিমেণ্ট আনি, আবাব খালি লরি ফিবতি নিয়ে যাই ! আপনি স্টেশনে ফিরবেন না ?

হ্যাঁ, তা তো ফিরতেই হবে ?

সেই জন্যেই তো আপনাকে ডাকলাম সাব। আপনাকে আমি নিয়ে যাব। আমাব পাশে বসে লরিতে চেপে আপনি যাবেন। কোনো তকলিফ হবে না।

অচেনা লবি-ড্রাইভাবের সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। সে ঠিক পাতলুনধারীকে চিনেছে—বিদেশী আগন্তুককে সাহায্য করতে আপনা থেকে এগিয়ে এসেছে। তাকে ধন্যবাদ দেবাব ভাষা খুঁজে পেলাম না।

সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। খালি লরিব পিঠে ড্রাইভার দেখে দেখে যাত্রী তুলল। অশক্ত বৃদ্ধ নারী আর শিশু। আমাকে নিল তাব পাশেব সীটে। লবি ছাড়ল করেলি স্টেশনেব উদ্দেশ্যে। আবার দশ মাইল ফিরতি পথ।

স্টেশনে পৌছে ভাঙা-হিন্দীতে ড্রাইভারকে প্রচুব ধন্যবাদ দিলাম। এক টাকাব একটা নোট জোর করে গুঁজে দিলাম হাতে। বললে—

এবকম তো কথা ছিল না সাব ! আমি তো কিরায়া নিই নি !

আমি জোর কবে বললাম—না না, এটা রাখুন। থোড়া মিঠাই—।

হোহো কবে আবার হাসল লোকটা। তেলচিটে সুতীব ব্যাগে নোটটা বেখে তিন আনা পয়সা বের কবে আমার হাতে তুলে দিল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করার আগেই বললে—

বহুত আচ্ছা, এই তেরা আনা আমি নিচ্ছি সাব ! একটা দেশী বোতলের দাম। আপনাকে মেলায় চা খাইয়েছিলাম না ?

২১

ইয়া ইয়া তামাকপাতার বস্তা। করেলি স্টেশনের খোলা প্ল্যাটফর্ম। মধ্যরাত্র পর্যন্ত দুই বস্তার মাঝখানে কুকুর-কুণ্ডলী। বাকি রাত থার্ড ক্লাস রেল-কামরায়। মানুষ আর মালের হাঁফধরা ভিড়ের মধ্যে নোংরা মেঝের এক কোণে অষ্টাবক্র অবস্থিতি।

ভোরবেলা নামলাম হোসাঙ্গাবাদ স্টেশনে। রাত্রে ট্রেনে নরসিংহপুর জেলা পার হয়ে হোসাঙ্গাবাদ জেলায় প্রবেশ করেছি। হোসাঙ্গাবাদ জেলার কেন্দ্রীয় শহর হোসাঙ্গবাদ উত্তর দিয়ে পশ্চিম দিকে নর্মদা প্রবাহিত। নর্মদার তীরবর্তী পুরোনো শহর। দক্ষিণপূর্ব দিকে নিউ টাউন গড়ে উঠেছে। সরকারী দপ্তর, কাছারী আদালত, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সিনেমা-ঘর এইসব নিয়ে হোসাঙ্গাবাদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রও বটে। নতুন শহর যেমন খানাদানি, পুরোনো শহর তেমনি ঘিঞ্জি। নোংরাও মন্দ নয়।

রিকশাওয়ালাকে বলেছিলাম কোনো একটা নির্ভরযোগ্য আস্তানায় নিয়ে যেতে। চকচকে পিচঢালা বাগিচা-সাজানো সুন্দর পরিচ্ছন্ন পল্লীপথে সাঁ-সাঁ করে ছুটল। কয়েক মিনিট যেতে আমি শুধোলাম—

কোন্ দিকে যাচ্ছ? কোথায় তুলবে আমাকে?

রেস্ট হাউস পর চলিয়ে!

সরকারী রেস্ট হাউস। মান্দলার অভিজ্ঞতা মনে পড়ল! দরকার নেই। শুধোলাম—

শহরে কোনো হোটেল নেই?

ভালো হোটেল তো পাবেন না।

বাজারের কাছে কোনো সরাই, কোনো যাত্রীনিবাস কিছু নেই?

লোকটা গাড়ি থামাল। আশ্চর্য হয়ে ভাবল কিছুটা। তারপর বললে—

ঠিক হ্যায়, মহল্লা পর লে যাতা হুঁ।

ঘিঞ্জি পাড়া। সরু সরু রাস্তা, একধারে খোলা ড্রেন। পাশাপাশি পুরোনো ইট বারকরা বাড়ি, কোনোটার ছাদ পাকা, কোনোটার ছাদ খোলার। মাঝখানে ফাঁক নেই। রাস্তার ধারে সার সার দোকান।

অনেক মোড় নিয়ে আর পাক খেয়ে এমনি এক পাড়ায় পুরোনো দোতলা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো রিকশাওয়ালা। রাস্তার ধারের একতলাটা জুড়ে মস্ত

একটা খাবারের দোকান। দোকানের উনুনে ভোরবেলাতেই আঁচ লেগেছে—ঘিয়ের কড়া চেপেছে, কেটলিতে জল ফুটছে। সামনের বেঞ্চিতে লেগেছে খদ্দেরের জটলা। দোকানের মাথায় একটা ময়লা সাইন-বোর্ড বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। তাতে লেখা—কান্যকুব্জ ভোজনালয়।

রিকশাওয়ালা বললে—এখানে থাকবার জায়গা পাবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—নদী কতো দূর এখান থেকে?

বাঁ দিক ঘুরেই সোজা রাস্তা। তিন চার মিনিট।

ব্যস, এই ভালো—খাসা এই কান্যকুব্জ ভোজনালয়।

নোংরা উঠোন। বাঁ দিক দিয়ে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। সারা উঠোন ঘিরে এক-তলা দোতলা সারি সারি ঘর। সামনে সরু বারান্দা।

গৃহকর্তার পিছনে নড়বড়ে রেলিং ধরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার পেছনের ঘরে ঢুকলাম। পাশের ছোট জানলাটা খুলতেই ভোরবেলাকার ফুরফুরে হাওয়া। ধুলো ভরা খাটিয়াটা জানলার ধারে টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর কাঁধের নিচে একটা ব্যাগ রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। কাল সমস্ত রাত একফোঁটা ঘুমুতে পারি নি—হাত পা ছড়াতে পারি নি এক মিনিটের জন্যে। শুতে না শুতেই গভীর ঘুম।

নর্মদা তীরে হোসাঙ্গাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। মালবের সুবিখ্যাত পাঠান নৃপতি হোসাঙ্গশাহ এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তার নামে নাম হোসাঙ্গাবাদ। রাজধানী নর্মদা তীরবর্তী মণ্ডপদুর্গ মাণ্ডু।

হোসাঙ্গশাহ বিখ্যাত নরপতি ছিলেন—বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সিংহাসন লাভ করে ত্রিশ বছর তিনি রাজত্ব করেন ও সুদীর্ঘ রাজত্বকালে মালবের স্বাধীন সুলতানীকে দৃঢ়ভিত্তি করেন। যুদ্ধবিগ্রহও তাঁকে প্রচুর করতে হয়েছিল—উত্তরে গুজরাটের সুলতান আর দক্ষিণে বাহমনি সুলতান—এই দুই সুলতানের বিরুদ্ধেই সুলতান হোসাঙ্গশাহ অভিযান চালিয়েছিলেন। এই সমস্ত আক্রমণাত্মক লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে মালব রাজশক্তিকে তিনি পাকা করে-ছিলেন।

হোসাঙ্গশাহের সঙ্গে বাহমনি সুলতান আমেদশাহের শত্রুতার মাঝখানে পড়েছিলেন খেরলার গোঁড়রাজা নরসিংহ রায়। দুই সুলতানই তাঁর আনুগত্য চান। নরসিংহ গেলেন বাহমনির পক্ষে। ফলে হোসাঙ্গশাহ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন, তখন কিন্তু বাহমনির সুলতান তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। হোসাঙ্গশাহ

যুদ্ধে নরসিংহ রায়কে পরাজিত ও নিহত করলেন। খেরলা রাজ্য দখল করে নর্মদার দক্ষিণতীরে প্রতিষ্ঠা করলেন হোসাঙ্গাবাদ শহর।

আমি এসেছি হোসাঙ্গাবাদে মাতা নর্মদার আকর্ষণে। হোসাঙ্গাবাদ সুপ্রসিদ্ধ নর্মদাতীর্থ। আগের কালে নামই ছিল নর্মদাপুর। নাম বদলালেও তীর্থ-মাহাত্ম্য নষ্ট হয় নি। যুগ যুগ ধরে তীর্থ-যাত্রী এখানে এসেছে। নর্মদাশ্রয়ী সাধু মহাত্মার চরণস্পর্শে হোসাঙ্গাবাদ ধন্য হয়েছে।

নর্মদাতীরে অতি বিশাল ও সুন্দর পাকা ঘাট। ঘাটের পর ঘাট পাশাপাশি লাগালাগি। শ্রেষ্ঠ ঘাটটির নাম শেঠানীঘাট। জানকীবাঈ শেঠানী নামে এক ভক্তিমতী মহিলা বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই ঘাট বানিয়েছিলেন। ঘাটের পাশে পাশে উত্তরমুখী অনেকগুলি মন্দির—নর্মদামন্দির, শংকরমন্দির, বিষ্ণু নারায়ণ ও হনুমান মন্দির প্রভৃতি। নর্মদামন্দিরে শ্বেতপাথরের পূর্ণাবয়ব মাতৃমূর্তি। ঘাটের ধারের রাস্তার উপর দোকান-বাজার, স্কুল, ধর্মশালা। বালগঙ্গাধর তিলক মেমোরিয়াল মিউনিসিপ্যাল হল।

মনোরম নর্মদাতীরে বহু পুণ্যার্থীর সমাবেশ। স্নান ও তীর্থক্রিয়াদির জন্য পাণ্ডা-পুরোহিতরা মন্দিরেই আছেন। মন্দিরগুলি নিত্যজাগ্রত। শেঠানী ঘাটের ঠিক সামনে নর্মদার উত্তর তীরে গুলজারী ঘাট। গুলজারী ঘাট থেকে এপারে শেঠানী ঘাটের দৃশ্য বড়ো মনোরম। মাঝখানে উদারবক্ষা নর্মদা। আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথ-যাত্রা। এখানকার শ্রেষ্ঠ উৎসব। শ্রাবণ শুক্লপক্ষ জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে ঝুলনোৎসব। নর্মদাভক্ত বহু সাধু মহাত্মার পাদস্পর্শে হোসাঙ্গাবাদ পুণ্যময়। আদি শঙ্করাচার্যের পর থেকে কতো শত সাধু মহাত্মা যে নর্মদাতীরে জপতপ বিহার ও বাস করে-ছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। মহাত্মা রামজী বাবা, রামফলজী, প্রিয়ালপুরীজী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ যুগের সবচেয়ে প্রাচীন নর্মদাশ্রয়ী সাধু যাঁর নাম পরিচয় লোকস্মৃতিতে জাগ্রত তিনি ভক্ত রামদাসজী বা রামজী বাবা। হোসাঙ্গাবাদে রেল স্টেশনের কাছে রামজী বাবার সমাধি আছে।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে মহাভক্ত রামজী বাবা অবতীর্ণ হয়ে-ছিলেন। হোসাঙ্গাবাদের সন্নিকটবর্তী ঘানাবড গ্রামে এক চাষীর ঘরে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। পৈত্রিক ক্ষেতিবাড়ির কাজে তিনি লিপ্ত থাকতে পারেন নি। বালক কাল থেকেই তিনি ছুটে ছুটে নর্মদাতীরে যেতেন ও পরিক্রমাবাসী সাধুদের সঙ্গ করতেন। নর্মদা-আরাধনা ও সাধুসঙ্গই ক্রমে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য হয়ে উঠল। ব্যর্থ হলো সংসারের আকর্ষণ।

অকর্মা মানুষটার জন্যে একটা তামাকের দোকান করে দেয়া হলো। রামজী

বাবা দোকানের পাশে থাকতেন। ভজনগানে আর নামসংকীর্তনে দিবারাত্র বিভোর থাকতেন তিনি—খরিদ্দার যারা আসত তারা নিজেরাই তামাক ওজন করে নিয়ে দাম রেখে চলে যেত। এমনি দোকানীকে ঠকানো নিতান্ত সোজা, তবু কেউই তা করত না—তার কারণ উদাসী লোকটাকে ভালোবাসত সবাই। একদিন এক চতুর ক্রেতা এক সের তামাক কিনে আধসেরের দাম রেখে চলে গেল। বাড়ি ফিরে দেখে তামাকটা যেন হাল্কা লাগছে! ত্রস্তে তামাক ওজন করল। কোথায় সেরভর মাল—তামাক তো আধসেরই! ছুটে গেল লোকটা রামজী বাবার কাছে—লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। রামজী বাবার এই প্রথম ভক্ত।

একবার নর্মদায় প্রচণ্ড বান এলো, দিগ্বিদিক ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সারা নদীতীর ডুবে গেল সেই বানে। লোকজন বাড়িঘর ফেলে পালাল। বানের জল একটু নামতে লোকজন ছুটল রামজী বাবার সন্ধানে। দেখল থৈ থৈ করছে জল আর জল, মাঝখানে রামজী বাবার কুটীরটি শুধু ভেসে আছে। নর্মদা জননী তাঁর প্রিয় সন্তানকে অভয় দিয়েছেন—সেই কুটীরের মধ্যে মহানন্দে পরম নির্ভয়ে তিনি নামকীর্তন করে চলেছেন।

রামজী বাবা সুন্দর ভজনগান রচনা করতেন। তাঁর আর কোনো জপতপ ছিল না,—শুধু নিরবধি ভজন আর নামকীর্তনের মধ্য দিয়েই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। দূর-দূরান্তর থেকে বহু দুঃখী বহু আতুর শান্তিলাভের আশায় তাঁর কাছে ছুটে আসত, নামগানের অমৃত সুধাধারায় তিনি তাদের সর্ব বেদনা মোচন করতেন। রামজী বাবার কাছে যে আসত আনন্দে সার্থকতায় ও তৃপ্তিতে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। ক্রমে তাঁর ভগবৎভক্তি মানবপ্রেম ও ভজন-কীর্তনের আকর্ষণে প্রতিদিন শত শত ভক্ত তাঁর পুণ্যছায়ায় সমাগত হতে লাগল। বিশেষ করে নর্মদা-পরিক্রমাবাসীরা তাঁর দর্শনলাভ অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন।

রামজী বাবার সমাধি হোসাঙ্গাবাদে। তাছাড়া জন্মভূমি ঘানাবড় গ্রামেও তাঁর স্মারক-মন্দির আছে। তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। তাঁর তিরোধানের দিন আগেই তিনি ভক্তদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন তাঁর অঙ্গনে শত শত ভক্তের সমাবেশ। বাবা নিজেই তাঁর সমাধি নির্মাণ করেছেন। সেই সমাধিগৃহে বসে তিনি একনিষ্ঠ মনে ভজন গান করছেন। এই গানের শ্রবণে তাঁর প্রাণের সঙ্গে সমগ্র ভক্তপ্রাণ ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করছে।

একসময় গান ধীরে ধীরে স্তব্ধ হলো। স্তব্ধ নিশ্বাস, নিস্পন্দ দেহ। শেষ সমাধিতে নিমগ্ন হলো আত্মা। পূর্বনির্দেশ মতো ভক্তরা সমাধিগৃহের দ্বার বন্ধ করে দিলেন।

রামজী বাবা যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছিলেন। এমনকি মৃত্যুকেও যখন চেয়েছিলেন, মৃত্যু তাঁর কাছে এসে দেখা দিয়েছিল। লোকের বিশ্বাস রামজী বাবার সমাধিতে এসে মনস্কামনা করলে তা পূর্ণ হয়, তাই অর্ধ ত্রিশতাব্দী পরেও তাঁর সমাধিতে প্রতিদিন লোকে এসে ধর্ণা দেয়, পূজা-আরাধনা করে।

হোসাঙ্গাবাদে আর এক দিন। ভোরবেলাই পথে বার হলাম। কান্যকুব্জ হোটেলের দোতলা একতলার কলরব তখনো জাগে নি। সামনের খাবারের দোকানের উনুনে তখন সবে আঁচ লেগেছে। ছায়া ছায়া নদীতীরবর্তী পথ। ঘাগরাপরা ওড়না-জড়ানো ঝাড়ুদারনীরা রাস্তা ঝাঁটে নেমেছে। দরজা খুলছে দু-একটি বাড়ির। নীরব নির্জন শেঠানীঘাট। বিরল স্নানার্থী—মন্দিরদ্বারগুলি বন্ধ। শান্ত উদার নদীবক্ষে প্রথম সূর্যের আলো সবে পড়েছে। প্রভাতী বাতাসে মৃদু কল্লোল জেগেছে নর্মদাধারায়।

ক্রমে ওপারের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল—প্রতিভাত হলো উত্তর তটের দৃশ্য। সেখানে ঘন সবুজ প্রশস্ত প্রান্তর চক্রবালের দিকে উঁচু হয়ে গেছে—সেখানে দিগ্‌-বলয়কে আড়াল করে নীল আকাশের গায়ে বাদামী-ধূসর গাঢ় আলিম্পনে এঁকেছে বিন্ধ্য পর্বতমালা। এপার থেকে চোখে পড়ার নয়—ঐ উত্তরতটেই কোথায় আছে গুলজারীঘাট, যার কাছে গদরিয়া নদীর সঙ্গম।

শান্তমনে নর্মদাকে দর্শন করলাম। প্রণাম করলাম নর্মদা-মন্দিরের বন্ধ দ্বারে। তারপর হাঁটা দিলাম দক্ষিণ দিকে। পথের দুধারে প্রভাতী কর্মব্যস্ততা তখন শুরু হয়েছে। আমি পায়ে পায়ে অতিক্রম করলাম পুরোনো শহর। সামনে আড়াআড়ি চওড়া রাস্তা। ডান দিকে রেল স্টেশন, বাঁ দিক গেছে নয়া শহরের দিকে। সামনে লেভেল ক্রসিং।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে রাস্তা চলেছে দক্ষিণ-পূবে। পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা। এবড়োখেবড়ো নয়, ধূলিধূসর নয়। শহরাঞ্চল শেষ হয়ে গেল, দুপাশে পাকা বাড়ি আর একটিও চোখে পড়ে না। তার বদলে কৃষকের কুটীর, শস্যের মরাই, ফসলকাটা মাঠ। পথের ধারে নিম আর কাঁটা বাবলার বিরলপত্র গাছ। শীতের কনকনে হাওয়া—কিন্তু প্রভাতী রোদে জোর কদমে হাটতে বেশ ভালোই লাগছে। মাঝে মাঝে পথে দু-একটি লোকের দেখা মিলছে। ক্ষেতখামারের লোক। এখন ক্ষেতির কাজ নেই—শহরে আসছে মজুর খাটতে। মাথায় পাগড়ি, পিঠে পুঁটুলি, হাতে লাঠি বা কুড়ুল। তাদের ডেকে গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

মাইল দুই হেঁটেছি। পথের ধারে বুড়ো শিরীষ গাছের নিচে কয়েকজনের জটলা।

কয়েকজন শ্রমিক গোল হয়ে বসে কোঁচড় থেকে ব্রেকফাস্ট বার করে করে গালে পুরছে।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই জায়গাটার নাম কি রসুলিয়া ?
জী হা।
আচ্ছা এখানে একটা ইস্কুল কোথায় আছে বলতে পারো ?
ইস্কুল ?
হ্যা ইস্কুল, সঙ্গে আশ্রমভী আছে। বেমারী লোকদের সেবাভী করা হয় শুনেছি। এক বিলাইতি মেমসাহেব থাকেন সেখানে। কাছাকাছি ?
একজন লোক উঠে দাঁড়াল। বললে—ঠিক বলেছেন, গান্ধী-লোগোকা আশ্রম। এই তো কাছেই—চলুন, আমি পৌছে দিচ্ছি।
খাওয়া তাব শেষ হয়েছিল—কোঁচড় ঝেড়ে আমাব সঙ্গে এগোলো। মিনিট দুই এগোবাব পরই ডান দিকে সেই গান্ধী-লোকদের আশ্রমের প্রবেশদ্বার। কাঠের ফলকে নাম লেখা। গেটের মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে ফিবোজা রঙেব বুগনভিলিয়া। নামটি অপবিচিত। আসলে এই আশ্রমের কী নাম তাই আমি জানতাম না। তবু হোসাঙ্গাবাদে আসাব আমার অন্যতম আকর্ষণ এই আশ্রমটি। আর আশ্রমবাসিনী এক বিদেশিনী নারী তাঁব কথা গ্রাম্য লোকটিব কাছে উল্লেখ কবে ঠিকই কবেছিলাম। মধ্যপ্রদেশেব এই গ্রামাঞ্চলে মেমসাহেব তো চোখেপডাব মতোই। বলা মাত্রই পাত্তা মিলেছে।
লোকটি দেখিয়ে দিল—ঐ যে মেমসাব !
সামনেব উদ্যানে তিনি দাড়িয়েছিলেন। অচেনা লোক দেখে সামনে এগিয়ে এলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বইলাম।
গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল টানটানকবে পিছন দিকে বাঁধা—গভীর নীল চোখ. গৌর মুখ, গালদুটিতে স্পষ্ট রক্তিমাভা। তারুণ্যদীপ্ত দীঘ সুঠাম তনু খয়েরি বনাতেব মোটা জামা আব নীলপাড আধময়লা খদ্দরের শাডিতে আবৃত। নগ্ন দুটি শ্বেতশুভ্র পা। ঐ আড়ম্বরহীন দরিদ্র স্থূল পোশাকেব মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ও যৌবনেব আভা।
আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কে এই তপস্বিনী ? এঁকে আমি চিনিনে। এর জন্যে আমি আসিনি। একটু ইতস্তত করছিলাম—স্মিতকণ্ঠে শুধোলেন—আসুন, আসুন, কাকে চান ?
হিন্দীতে প্রশ্ন কবেছিলেন, আমিও হিন্দীতেই বললাম—
মিস্ মার্জরি সাইক্স্ কি এখানে আছেন ?

মিস্‌ সাইক্‌স্‌? সিস্টার মার্জরি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে একটু দেখা হবে?

মার্জরি বহিনের সঙ্গে দেখা করতে চান—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম—বাংলা থেকে।

প্রসন্ন হাসি হেসে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমি তাড়াতাড়ি প্রতিনমস্কার করে নিজের ভুল সংশোধন করে নিলাম।

আসুন, আসুন আমার সঙ্গে।

আশ্রম অভ্যন্তরের রাস্তা। একধারে বাগান, শস্যের মরাই, গোয়ালঘর। অন্য দিকে আধ-পাকা ঘরবাড়ি। রাস্তা পৌঁছেছে একেবারে শেষ প্রান্তে। সেখানে ছায়া ঢাকা একটি কুটীর। কুটীরের দাওয়ায় পৌঁছতেই ভিতর থেকে এক বিদেশী ভদ্রলোক বার হয়ে এলেন। বয়স চল্লিশের বেশি না। লালচে ছোট ছোট চুল, স্বচ্ছ নীল চোখ। মেদহীন ছিপছিপে চেহারা। পরনে একটা সাদা খদ্দরের ফতুয়া আর গাঢ় বাদামী রঙের হাফ প্যান্ট। অন্য কোনো শীতবস্ত্রের বদলে মাথায় কানঢাকা একটা পাহাড়ী টুপি।

আমার অগ্রবর্তিনী বললেন—দ্যাখো, ইনি বেঙ্গল থেকে এসেছেন সিস্টার মার্জরির খোঁজে।

বেঙ্গল—দি ল্যাণ্ড অব টেগোর! তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন আমার।

আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমাদের!

একেবারে অজানা পরিবেশ, সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ। আমি আমতা আমতা করে বললাম—

মিস্‌ সাইক্‌স্‌?

ভদ্রলোক বললেন—তিনি তো এখানে এখন থাকেন না, আছেন নীলগিরিতে।

মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেন—

তাই বলে সিস্টার মার্জরির সন্ধানে বেঙ্গল থেকে কেউ এলে তাঁকে আতিথ্য দেবার প্লেজার আমরা পাব না নাকি?

মার্জরি সাইক্‌স্‌। ধর্মপ্রাণা ইংরেজ মহিলা। ভারত-কল্যাণে নিবেদিত-প্রাণা। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর প্রতি পরম ভক্তিমতী। শান্তিনিকেতনে অ্যাণ্ড্রুজ-গবেষণায় ব্রতী হন ও বেনারসীদাস চতুর্বেদীর সহযোগিতায় রেভারেণ্ড সি-এফ-অ্যাণ্ড্রুজের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন। কয়েক বৎসর আগে অ্যাণ্ড্রুজের জীবনী

ও সাহিত্য নিয়ে বাংলাভাষায় কিছু কাজ করবার সুযোগ আমি পাই। এই কাজে আমাকে সবচেয়ে উৎসাহিত করেছিলেন শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁরই কল্যাণে মিস্ মার্জরি সাইক্‌সের সঙ্গে আমি পরিচিত হই ও তিনি আমার অকিঞ্চিৎকর অ্যাণ্ড্রুজ-চর্চাকে আশীর্বাদ করেন।

ট্রেনে হোসাঙ্গাবাদ আসবার সময় রাত্রিবেলাই মিস্ মার্জরি সাইক্‌সের কথা আমার মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল, রসুলিয়া-হোসাঙ্গাবাদ এই ঠিকানা থেকে তিনি আমাকে চিঠি লিখতেন বহুমূল্য উপদেশ সহযোগে। আমার কাজ শেষ হবার পর প্রকাশিত গ্রন্থটি এই ঠিকানাতেই আমি তাঁকে পাঠাই। ঠিকানা-বদল হয়ে গ্রন্থটি তাঁর কাছে পৌছয়—প্রাপ্তিস্বীকার ও সহৃদয় মন্তব্য করে তিনি আমাকে উত্তর দেন নীলগিরি পাহাড়ে কোটাগিরি থেকে। নীলগিরিতেই তিনি আছেন—মাঝে মাঝে অবশ্য রসুলিয়ার আশ্রমে আসেন।

যাঁর সন্ধানে এই আশ্রমে আসা তাঁকে পেলাম না। পেলাম ডাক্তার অ্যাবট আর মিসেস্ অ্যাবটকে—যাঁদের অনাড়ম্বর আতিথ্য বহুদিন মনে থাকবে। আর পেলাম এখানকার শিক্ষায়তনের অধিকর্তা মিশ্রজী ও তাঁব সেবাব্রতী সহকর্মীদের অনাবিল আনন্দভরা অভ্যর্থনা। আমি নামহীন পরিচয়হীন দূরদেশী আগন্তুক—কাউকে চিনিনে, কেউ চেনে না আমায়। কিন্তু মার্জরি বহিনের নাম আমি করেছি, তাঁর আমি পরিচিত, তাই যথেষ্ট। তাছাড়া আমি বেঙ্গল থেকে আসছি, যেখানে রবীন্দ্রনাথেব শান্তিনিকেতন—সে কি কম কথা?

আশ্রমটির নাম ফ্রেণ্ডস্ রুরাল সেণ্টার। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে প্রীতিকেন্দ্র। গান্ধীজীর আদর্শ-অনুপ্রাণিত জনসেবা প্রতিষ্ঠান। বুনিয়াদী শিক্ষায়তনকে মুখ্য করে এই কেন্দ্রের নানা প্রকারের সেবায়োজন। পাঠশালা, শিল্প-শিক্ষায়তন, কৃষি-শিক্ষায়তন, উদ্যান, গোশালা ও খামার, শিক্ষক ও ছাত্রদেব আবাসগৃহ। নিয়মানুবর্তিতা ও সরলতাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। প্রতিটি কর্মী আচাবে ব্যবহারে কথাবার্তায় আড়ম্বরহীন, কর্তব্যে একনিষ্ঠ। মিশ্রজী অতি যত্ন সহকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি দেখালেন। লক্ষ্য কবলাম প্রতিটি কেন্দ্রই প্রাণবন্ত। জীবন্ত প্রতিষ্ঠান—জাদুঘর নয়। গান্ধীস্মারক নয়—গান্ধীকেন্দ্র।

অ্যাবট দম্পতি ক্যানাডার অধিবাসী—খৃস্টান কোয়েকাব সম্প্রদায়ভুক্ত। নববিবাহিত দম্পতি মানবতার আহ্বানে চীনদেশে যান। সেখানে গ্রামে গ্রামে কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলেন। রক্তচীনের বিজয়-ডমরু বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবট দম্পতির কাজ সে দেশে ফুরোলো। তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছলেন ভারতবর্ষে। মধ্য প্রদেশের দরিদ্র কৃষিজীবীদের সেবার কাজ পেলেন এই ফ্রেণ্ডস্ রুরাল সেণ্টারে।

এখানে কয়েকটি কুটীর তুলে নিয়ে তাঁরা একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পত্তন করলেন। গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, মড়ক প্রতিরোধ, প্রসূতিকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন —এই নিয়ে মহানন্দে তাঁরা আছেন।

ডাক্তার অ্যাবটের গায়ে ফতুয়া, মিসেস অ্যবটের পরনে খদ্দরের শাড়ি। সাহেব কেরোসিনের স্টোভ জেলে কেটলিতে জল গরম করলেন, মেমসাহেব এনামেলের মগে চা পরিবেশন করলেন। আর নতুন অতিথিকে আদর করে সামনে ধরলেন দুখানি রুটি, ঘরে তৈরি পেয়ারার জেলি আর কয়েকটি শুকনো খেজুর।

দশটার সময় বিদ্যালয় আরম্ভ। অ্যাসবেসটস-ছাওয়া হল ঘরটিতে আমরা গেলাম। একধারে হাঁটু মুড়ে বসেছেন শিক্ষকরা, আর তাদের মুখোমুখি ছাত্রদল। মিশ্রজী তাঁর পাশে আমাকে বসালেন। সামনে প্রায় পঞ্চাশটি ছাত্রছাত্রী দু-দলে ভাগ করা। বয়সের নানা বৈষম্য আছে। তবে শ্রেণীবৈষম্য নেই। সকলেই গ্রামাঞ্চলের চাষীদের ছেলেমেয়ে। পরনে হাতে কাটা মোটা খদ্দরের খাটো বস্ত্র। স্থির হয়ে তারা বসে আছে প্রার্থনার অপেক্ষায়। প্রতিদিনের কাজ প্রার্থনা দিয়ে শুরু হয়। একটি কিশোর ছেলে দল থেকে উঠে এলো। সে প্রার্থনা পরিচালনা করল। গান্ধীজী-নির্দিষ্ট সেই প্রার্থনা, যাতে সর্বধর্মের সমন্বয়, যাতে সর্বমানুষের পরমপিতার কাছে একটি মাত্র আবেদন—যেন সত্যনিষ্ঠ হতে পারি, সত্যাগ্রহী হতে পারি।

প্রার্থনার পর মিশ্রজী সদ্ধর্ম ও সদাচার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

এই যে নূতন অতিথিকে আজ আমাদের মধ্যে দেখছ, ইনি বাংলা থেকে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাংলা, নেতাজীর বাংলা। অনেক দূর থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান দেখতে ইনি এসেছেন—কিন্তু তাই বলে মনে ভেবো না ইনি খুব দূরের মানুষ। ইনি আমাদের অনেক কাছের। তোমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—তার কারণ আমাদের বড়ো গর্বের বড়ো ভক্তির মার্জরি বহিনের ইনি বন্ধু। তোমরা সবাই আবার উঠে দাঁড়াও—আমাদের এই বন্ধুকে অভ্যর্থনা করো, সকলে মিলে বলো—নমস্তে।

পঞ্চাশটি কিশোর-কিশোরী মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। আগ্রহ আনন্দ ভরা উচ্ছলিত কণ্ঠে একসঙ্গে বললে —

নমস্তে।

২২

নিতান্ত বালক মাত্র। মাত্র আট বৎসর বয়স। অথচ মুণ্ডিত মস্তক, নগ্নপদ। অঙ্গে কৌপীন ও কাষায় বহির্বাস, হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু। গৃহহীন বালক সন্ন্যাসী। পরিক্রমা করছেন সঙ্গীহীন দীর্ঘ পথ। দক্ষিণে সূর্যোদয়, বামে সূর্যাস্ত। দৃষ্টি শুধু উত্তরমুখী। অরণ্য প্রান্তর নদী জনপদ পার হয়ে যাত্রা শুধু উত্তরের অভিমুখে। ভারতের দক্ষিণ-তম প্রান্তের কেরল দেশ থেকে।

গুরুগৃহে যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তখনি জেনেছিলেন যোগদর্শন প্রণেতা মহাগুরু পতঞ্জলির নাম। পতঞ্জলি সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন যিনি নিত্য এবং সত্য, যিনি অনাদি এবং অনন্ত। যিনি পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। যিনি স্বয়ংপ্রকাশিত অথচ স্বয়ংলুক্কায়িত। যিনি জড়ের মধ্যে নিদ্রিত, জীবের মধ্যে জাগ্রত। মায়ায় যিনি ছায়াচ্ছন্ন, প্রজ্ঞায় যিনি উদ্ভাসিত।

জেনেছিলেন যে পতঞ্জলির সেই মহাবোধি অমিতাত্মা মৃত্যুহীন। সহস্র বৎসর পরেও দীপ্যমান তার অনির্বাণ শিখা। সেই শিখাকে দর্শন করতে হবে—তার আলোকে অন্তরের মধ্যে বরণ করতে হবে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সেই অনির্বাণ শিখা যাঁর চিৎ-মন্দিরে পূর্ণ প্রকটিত তিনি মহাতত্ত্বজ্ঞ ও মহাযোগী গোবিন্দপাদ। তিনিই উত্তর দিগন্তের ধ্রুবতারা।

নর্মদাতীরে এক মহান্ জ্যোতির্লিঙ্গ। সেই জ্যোতির্লিঙ্গের ছায়ায় এক গহন গুহা-মধ্যে গোবিন্দপাদ সমাধিমগ্ন। মনে মনে সেই গোবিন্দপাদকে গুরু বলে গ্রহণ করে-ছেন বালক। সেই গোবিন্দপাদকে পেতেই হবে। তাঁর শরণ নিতে হবে। তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে দীক্ষা—লাভ করতে হবে পরম ব্রহ্মশিক্ষা।

মাত্র আট বৎসর বয়সে বিরজাহোম সমাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। তারপর চিরদিনের মতো মাতৃস্নেহের ছায়ানীড় পরিত্যাগ করে ছুটে চলেছেন গুরু-সন্ধানে। নর্মদার অভিমুখে।

কে তিনি? কে এই বালক বীর? ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিপ্লবী, শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক—আচার্য শংকর। বেদান্ত-বিচিন্তার অমোঘ অমৃতধারায় যিনি ভারতবর্ষীয় মহাজাতির সমস্ত মানস মালিন্য মার্জনা করেছিলেন। যিনি জীবনব্যাপী সাধনায় বৈদিক ধর্মকে জাতির মর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

যাঁর চিৎসরোবরে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযোগের ত্রিবেণী-সংগম ঘটেছিল। যিনি ঘোষণা করেছিলেন মানুষের চিরশুদ্ধ চিরবুদ্ধ ও চিরশান্ত আত্ম-সত্যের উপলব্ধিতেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

ভারতবর্ষের জাতীয় ও ধর্মজীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন শংকরাচার্য। যেমন আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ। সংস্কার-পঙ্কে আমজ্জিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মানবতার মহাবিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন বুদ্ধদেব। আচার-সংস্কারকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন মানবতার মহাপ্লাবনে। সেই প্লাবন-সমুদ্রে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অহিংসা, সৎকর্ম ও প্রেমের পূর্ণ শতদল।

তারপর দ্বাদশটি শতাব্দী কেটে গেছে। বৌদ্ধধর্মের সেই অমৃত শতদলও বিকৃতি কুসংস্কার ও ভ্রষ্টাচারের পঙ্কক্লেদে কলুষিত। সেই সময় আবির্ভূত হন শংকর। আর্য ধর্মের কেন্দ্রীভূত সত্যকে তিনি ভারতের বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই দ্বিধাহীন ঘোষণায় ভগবান বুদ্ধকে তিনি বিষ্ণু-অবতার রূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তী দু-শতাব্দীর মধ্যেই ভারত-সীমান্তে ইসলামের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়েছিল। ইসলাম ধর্মাভিযানের বিরুদ্ধে আত্মিক প্রতিরোধের শক্তি হিন্দু ভারতের অন্তরে শংকরই সঞ্চার করে গিয়েছিলেন।

আর্য ধর্মের প্রাণশক্তি বেদান্ত-সাধনার আদর্শে ভারতবাসী যেন চির-অনুপ্রাণিত থাকে তাই ছিল শংকরাচার্যের জীবন-ব্রত। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে তিনি উত্তরে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও নেপাল থেকে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত পশ্চিমে দ্বারকা থেকে পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত নিরলস ধর্মপ্রচারে পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভারত-ইতিহাসের তিনি শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক।

আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই যখন কুসংস্কারের ও ক্রিয়াকর্মের আবিলতায় মলিন, তখন শংকর মানুষের অমর আত্মাকে অনন্ত অসীম নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেন। চিন্তার মালিন্য ও ভ্রষ্টতাকে প্রতিরোধ করে হিন্দু সভ্যতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য তিনি ভারতের চার সীমান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে জ্যোতির্মঠ, পশ্চিমে শারদা মঠ, পূর্বে গোবর্ধন মঠ ও দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ।

গোবিন্দপাদ ছিলেন অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা গৌড়পাদের মন্ত্রশিষ্য। নর্মদাবক্ষের ওংকারতীর্থে এক পার্বত্যগুহায় সমাধিমগ্ন গোবিন্দপাদের দর্শন লাভ করেন শংকর। গোবিন্দপাদ তাঁকে দীক্ষা দেন। গুরুচরণে সুদীর্ঘ তিন বৎসর সাধনার পর ওংকারতীর্থে শংকর সিদ্ধিলাভ করেন।

নর্মদার কূলে কূলে কোটি তীর্থের সমাবেশ। সর্বতীর্থসার ওংকার। পাপপ্রবৃত্তিহীন পুণ্য-উদাসীন নর্মদা-পথিকের পরম আশ্রয় এই ওংকার। এতোদিনে পৌছব ওংকারতীর্থে। আর দেরি নেই।

অমরকণ্টক থেকে ওংকার। পদচারী পরিক্রমাবাসীর টানা পথ পাঁচশো মাইল। আমার পথ ঘুরে ঘুরে, তাই আরো বেশি—সাড়ে ছশো মাইল অন্তত। এবার পথের প্রান্তে এসে পৌছব—স্থান পাব শংকর-পূজিত জ্যোতির্লিঙ্গের পদতলে।

হোসাঙ্গাবাদ থেকে বার হলাম শেষরাত্রে। কান্যকুব্জ ভোজনালয়ে আতিথ্যের আয়োজন অপ্রতুল হলেও আতিথ্যের উত্তাপ আছে। সেই উত্তাপের স্পর্শ বিদায়-কালেও পেলাম। মালিকের পুত্রবধূ রাত সাড়ে তিনটের সময় ডেকে দিয়েছিল—আর সেই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়েছিল এক বালতি গরম জল। আধো অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোয় আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল। পিছনে পিছনে এসে পৌছে দিয়েছিল রাস্তা পর্যন্ত—যে রাস্তায় তখন একটি মানুষেরও দেখা নেই।

ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়ল। হোসাঙ্গাবাদ জেলা পার হয়ে এই বাস চলেছে নিমাড় জেলার মধ্য দিয়ে। হোসাঙ্গাবাদ থেকে খাণ্ডোয়া পর্যন্ত একশো চব্বিশ মাইল পথ। পাকা রাস্তা—হু-হু করে বাস ছুটেছে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত কেটে। চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। নর্মদাতীর থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। নর্মদার শ্যামল উপত্যকা থেকেও—সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চলের রূঢ় নির্জীব কঠিনতার মধ্যে প্রবেশ করছি। রাজবর্ত্ম বেয়ে চলেছি। এখান থেকে হরদা, খিড়কিয়া, হরসুদ ছাড়িয়ে পৌছবে খাণ্ডোয়ায়। খাণ্ডোয়া থেকে পথ বুরহানপুর ভূশাওয়াল হয়ে নাসিক-বোম্বাইগামী জাতীয় সড়কে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি চলেছে ইটারসি-খাণ্ডোয়া রেল লাইন।

পরিক্রমাবাসীর এ পথ নয়। সে পথে নর্মদামাতার কোল ঘেঁষে। সে পথ পিচ. বাঁধানো নয়, তার ওপর দিয়ে বাস ছোটে না। সে পথে নানা কষ্ট নানা বাধা। সেই পথ ওংকার-ফাঁড়ির পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেছে। সে পথে কতো নদী-সংগম, কতো ঘাট, কতো তীর্থ।

সে পথে উল্লেখযোগ্য নর্মদাতীর্থ কোকসর, গোদাগাঁও, হণ্ডিয়া, বলকেশ্বর ও সাত-মাত্রা।

হোসাঙ্গাবাদ থেকে মাইল বারো দূরে নর্মদার দক্ষিণ তীরে কোকসর গ্রাম। অতি সাধারণ বিশেষত্ববর্জিত স্থান, কিন্তু নর্মদাশ্রয়ী এক মহাপুরুষের পবিত্র স্পর্শে বিখ্যাত। এই কোকসর গ্রামে দেহরক্ষা করেন গৌরীশংকরজী মহারাজ। এইখানে তাঁর

মহাপূত সমাধি।

এখান থেকে প্রায় আঠাশ মাইল দূরে গোদাগাঁও। হোসাঙ্গাবাদ জেলার হরদা ও সিবনী তহসিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঞ্জাল নদী এখানে নর্মদাধারায় মিশেছে। স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত প্রাচীন গঞ্জালেশ্বর মহাদেব এখানে বিরাজমান। এখান থেকে নিমাড় অঞ্চলের আরম্ভ।

গোদাগাঁও থেকে মাইল সতেরো পশ্চিমে হণ্ডিয়া নগর। এপারে তীর্থ ওপারে তীর্থ। দক্ষিণতটে হণ্ডিয়া, উত্তরতটে নেমাবর। সুদীর্ঘ আটশো মাইলব্যাপী নর্মদা নদীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। নর্মদা মাতার নাভিস্থল রূপে বিখ্যাত মহা তীর্থ-ক্ষেত্র। অমরকণ্টক থেকে পরিক্রমা পথে চারশো পঁচিশ মাইল।

নর্মদার উভয় তীরেই প্রাচীন শংকরমন্দির। এপারে সিদ্ধনাথ, ওপারেও সিদ্ধনাথ। প্রাচীন কালের মুনিঋষিগণের তপোভূমি বলে এই স্থান খ্যাত। কিশোর ব্রহ্মচারী বালানন্দ এই হণ্ডিয়ার দক্ষিণ তীর থেকে নর্মদা-পরিক্রমা আরম্ভ করেন। এখান থেকে প্রায় ওংকারেশ্বর পর্যন্ত পরিক্রমাবাসীর সত্তর মাইল পথ সুকঠিন অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়ে। মুণ্ড মহারণ্যের মতো আর এক পরীক্ষার স্থান। নাম ওংকার-ঝাঁড়ি।

সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চলের গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যপ্রান্তে নর্মদার দক্ষিণ তীরে বলকেশ্বর তীর্থ। ঘাট উভয় তীরেই। কথিত আছে রাজা বলি এখানে শিবতপস্যা করে ইপ্সিত ফললাভ করেছিলেন। বলকেশ্বরজীকে তিনিই এখানে স্থাপনা করে-ছিলেন।

ওংকারেশ্বর থেকে মাত্র চার মাইল পুবে সাতমাত্রা তীর্থ। সপ্তমাতৃকার অপভ্রংশ সাতমাত্রা। এখানে বারাহী চামুণ্ডা ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ইন্দ্রাণী কৌমারী ও মাহেশ্বরী এই সপ্তমাতৃকার মন্দির আছে। আর আছেন মহাদেব ভৈরবনাথ।

•

হোসাঙ্গাবাদ বাস স্টেশনে যখন পৌছই তখন যেমন শীত তেমনি অন্ধকার। শহ-রের একধারে প্রান্তরের মাঝখানে বাস স্টেশন; একটা পেট্রোমাক্স জ্বলছে। দূর থেকে তার আলো দেখে পৌছেছি। সামনে আরো ২টি আলোকপিণ্ড—দুটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। একটি বাসের নিচে, ইঞ্জিন গরম করছে—আর একটির মাথায় চেপেছে চায়ের কেটলি। সেই কুণ্ডটি ঘিরে ড্রাইভার কণ্ডাক্টর আর আমারই মতো কয়েকটি যাত্রী হি-হি করে কাঁপছে।

তারপর সেই যে অতি প্রত্যূষে বাস ছেড়েছে—সেই বাসে চলেছি সারাদিন। মন করেছি ওংকারেশ্বরের আগে আর কোথাও থামব না—তাই সারাদিনব্যাপী

যাত্রা। নর্মদা-উপত্যকায় দুপাশে নানা উদ্যান, নানা শস্যক্ষেত্র, নানা সরস গ্রাম। যতো দক্ষিণ-পশ্চিমে নামছি—ক্রমে সেই উর্বরতা অদৃশ্য হচ্ছে। দুধারে প্রকটিত হচ্ছে উষর-কঠিন পার্বত্যরূপ। প্রথমে দেখেছিলাম দূরে বাঁ দিকে সাতপুরা পর্বত-মালা, ক্রমে প্রবেশ করছি সেই পার্বত্য বন্ধুরতার মধ্যে।

সকাল নটায় পঞ্চাশ বাহান্ন মাইল পথ অতিক্রম করে হরদাতে বাস দাঁড়ালো। অতি ঘিঞ্জি ও নোংরা শহর। জঞ্জালভর্তি সরু সরু রাস্তা। শ্রীহীন ঘরবাড়ি দোকান পাট। যাত্রীরা এখানে একপ্রস্থ চা-খাবার খেল। দশটায় খিড়কিয়া, এগারোটায় হরসুদ।

এই হরসুদের পশ্চিমে ওংকার-ফাঁড়ির পার্বত্য অঞ্চল। এপারে পাহাড় ওপারে পাহাড়। দুধারে রুক্ষ প্রান্তরে সবুজের যৎসামান্য মাত্র আভাস। শুকনো মাঠে ছোট ছোট তুলোগাছ জন্মেছে—গাছে ডালে ডালে সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে সাদা সাদা তুলোফুল। পাহাড়ী এলাকার মধ্যে দিয়ে রাস্তা আঁকাবাঁকা হয়েছে। হাওয়ার ঝাপটায় ধুলো উড়ছে—সেই ধুলোর মধ্য দিয়ে কর্কশ আওয়াজ করে হরসুদ ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটেছে বাস।

আশাপুরা থেকে খাণ্ডোয়া পর্যন্ত কুড়ি মাইল প্রস্তরাকীর্ণ শুষ্ক মরুভূমি। কৃষি নেই, শ্যামলতা নেই, লাল উঁচুনিচু রুক্ষ কঠিন মাটি। সেই মাটিতে শুষ্ক গুল্ম, বুনোনিম, বনঝাউ আর কাঁটাভরা শীর্ণপত্র বাবলা। সাতপুরা পর্বতমালার কিনারা দিয়ে অনেক দক্ষিণে নেমে এসেছি, নর্মদা থেকে অনেক দূরে—রেল-শহর খাণ্ডোয়ায়।

বাসযাত্রা শেষ হলো খাণ্ডোয়াতে এসে। বেলা ঠিক দেড়টার সময়। সব যাত্রী নামল। আমিও নামলাম। প্রায় ন-ঘণ্টা এক নাগাড়ে বাসে চলেছি। সারা গায়ে ব্যথা ধরে গেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা-ক্লান্তিতে কাতর। কিন্তু তাই বলে আজকের মতো যাত্রা শেষ হয় নি। আমাকে আরো যেতে হবে।

খাণ্ডোয়া মস্ত শহর। এখানে আশ্রয়ের কোনো অভাব নেই। হোটেল আছে, সরাই আছে—রেল স্টেশনে আরামপ্রদ রিটায়ারিং রুম আছে। রুচিকর আহার্য, সুখকর বিশ্রাম। কিন্তু তবু আমার মন টিকবার নয়। খাণ্ডোয়াতে কালহরণ করে আমি কী করব? এখানে আমার কে আছে? কীসের আকর্ষণ?

তাছাড়া আজ সারাদিন নিতান্ত মুখ বুজেই চলেছি। পথে নানা স্থানে অনেক যাত্রী ওঠানামা করেছে, কিন্তু কথা বলবার মতো একটি লোকও পাই নি। নর্মদাতীর আর নর্মদা-উপত্যকার শ্যামলতা থেকে অনেক দূরে অনেক নিষ্করুণ কঠোরতার রাজ্যে নেমে এসেছি—দূরে ফেলে এসেছি অনেক না-দেখা তীর্থ। এখনো দিন আছে, এখনো সময় আছে। বাস স্ট্যাণ্ডের পাশের হোটেলে একটু ডাল-চাপাটি

খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করব। দিনান্তে আশ্রয় নেব নর্মদারই ক্রোড়ে।

অদূরে একটি ছোট বাস দাঁড়িয়ে আছে। রং চটা নড়বড়ে, গাল তোবড়ানো। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে ড্রাইভার—চিৎকার করছে কণ্ডাক্টর। বাসের সেই ঘন ঘন নির্ঘোষে কয়েকজন লোক কাছাকাছি এগোলো। মেয়ে-পুরুষ—মেয়েদের রঙিন ঘাগরা আর ওড়না। পুরুষদের হাঁটুতোলা মোটা ধুতি আর ফতুয়া—কাঁধে কম্বল, হাতে লাঠি।

এ বাস কোথায় যাবে ?

মোরটক্কা, মোরটক্কা—স্টেশন তক্।

আর যাবে না ?

না, আবার কোথায় যাবে ? তোমরা যাবে কোথায় ?

আমরা যাব মান্ধাতা। মান্ধাতা নিয়ে যাবে তো বলো।

মান্ধাতার সার্ভিস বন্ধ। এখন কি মেলা আছে সেখানে ? মোরটক্কাতে খতম।

তাহলে আমরা যাব না।

দেহাতী ভীল ওরা। বাসকে তার টার্মিনাস উজিয়ে আরো নিয়ে যেতে চায়, তাই ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরের সঙ্গে তর্ক করছে। সেই তর্ক শুনে আমিও একটু কাছে এগিয়ে গেলাম।

কণ্ডাক্টর বললে—আপনি কোথায় যাবেন বাবুজী ?

আমি বললাম—আমিও তো ওংকার মান্ধাতায় যাব। সেখানে নাকি বাস যাচ্ছে না ?

কণ্ডাক্টর বললে—ওংকারের থ্রু সার্ভিস বন্ধ। এখন শীতকাল, মেলা-উলা কিছু নেই, প্যাসেঞ্জার বড়ো কম হয়। তবে মোরটক্কা থেকে আলাদা বাস পেতে পাবেন। ইন্দোর সার্ভিসের বাস।

ড্রাইভার আড়চোখে আমাকে দেখছিল। ধূলিমলিন চেহারা, শুকনো মুখ। হাতে ব্যাগ, কাঁধে কম্বল। মায়া হলো বোধহয়। বললে—

লে লে গিন্ লে কিত্না প্যাসেঞ্জার !

শুনে মন্দ হলো না। দেহাতী দলটি কুড়িয়ে বাড়িয়ে এগারোজন—আর আমি।

ড্রাইভার হাঁকলে—ঠিক হ্যায়, চলো সব মান্ধাতা !

এই বলে বার তিনেক হর্নটা জোর টিপলে।

কণ্ডাক্টর ঘোষণা শুরু করলে—মান্ধাতা, মান্ধাতা !

খাণ্ডোয়া থেকে আমি চললাম—সোজা উত্তর দিকে। সাতচল্লিশ মাইল পথ। এই পথের নীরসতার তুলনা নেই। নর্মদা থেকে অনেক দূরে, সাতপুরারও দক্ষিণ পৃষ্ঠে, তাই বুঝি এতো রুক্ষতা। লাল মাটির এবড়ো-খেবড়ো পথ, দুধারে বালি-

কাঁকর আর পাথুরে লাল চাঙড়ের ঢিবির পর ঢিবি। সেই ঢিবির গায়ে গায়ে ফণিমনসা আর কাঁটাবাবলা। রাস্তার পাশে কোথাও বন্য গুল্মের মাথায় মাথায় হলুদ ফুল। কোথাও জীর্ণশীর্ণ তুলোর ক্ষেত। কোথাও কোনো গ্রাম নেই, তৃণ-ক্ষেত্র নেই, ছায়াছড়ানো উঁচু ঝাঁকড়া গাছ নেই, জলাশয় নেই।
লালচে ধুলোভরা পথে বাস চলেছে। সাতপুরা পর্বতমালার ফাঁক দিয়ে। ভাঙা নড়বড়ে ছোট বাস। নোংরা গা, নোংরা মেঝে। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, গায়ে চাদর, মাথায় ইয়া পাগড়ি, হাতে লাঠি—দেহাতী সহযাত্রী। তাদের দলের ঘাগরাওয়ালী মেয়েরা ঝাঁকানির অত্যাচারে সীট ছেড়ে বাসের ধুলোভর্তি মেঝেতে নেমে বসেছে।
সনাবদ পার হয়ে মোরটক্কাতে বাস দাঁড়াল। মোরটক্কাতে কজন যাত্রী নেমে গেল। উঠল কজন মহারাষ্ট্রীয় মেয়ে-পুরুষ। মোরটক্কা রেল স্টেশন। যে সব তীর্থযাত্রী এ পথে ট্রেনে আসে তারা এই স্টেশনে নামে ও এখান থেকে বাস ধরে। মোরটক্কা থেকে ওংকার সাত মাইল।
দিন শেষ হয়ে আসছে। এই সাত মাইল পথ সাতপুরার ঢালু বেয়ে অতি সাব-ধানে বাস নামছে। চলেছি নর্মদার অভিমুখে। দুধারে আবার বন। ওংকার-ফাঁড়ির মহাবন। এই বনের গাছ প্রধানত সেগুন। সেগুনের বিরাট অরণ্য সারা আকাশকে যেন ঢেকে রেখেছে। ছায়া ঘনাচ্ছে—সেই ছায়ায় বিশাল বিশাল পাতাওয়ালা দীর্ঘ সেগুন গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য বীভৎস প্রেতের মতো।
সারা বাসে কথা বলবার মতো একটি লোক জোটে নি। কোথায় নামব, কোথায় পাব রাত্রের আশ্রয়, কিছু জানিনে। শালের অরণ্যে একটা মন-উদাস করা সৌন্দর্য আছে—সেগুনের অরণ্য আতঙ্ক-জাগানো বীভৎস। সেই ভয়ালতার মধ্যে চলেছি নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব।
এমনি নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব চলেছি আজ সারা দিন। ভোর থেকে দিনান্ত পর্যন্ত একশো একাত্তর মাইল। কতো কোলাহল, কতো চিৎকার। কতো বাজারের ভিড়। কতো যাত্রী উঠেছে, কতো নেমে গেছে বাস থেকে। আমি শুধু মুখ বুজে চুপ করে থেকেছি।
এতো দিনের যাত্রাপথে কতো বন্ধু, কতো সাথী পেয়েছিলাম। শনশন বাতাস কেটে বাস যতো ছুটছে, তাদের স্মৃতি ততো দূরে সরে যাচ্ছে—পিছনের ঐ ক্রচ-বালের মতো। মুণ্ড মহারণ্যে হেঁটেছিলাম, সঙ্গী ছিল মাত্র একজন—দুই বন্ধু মিলে সে অরণ্যের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলেছিলাম দিনের পর দিন। দুঃখ পাই নি, বিমর্ষ হই নি—কোনো দিন মন খারাপ লাগে নি মুহূর্তের

জন্যেও।

সে ছিল আমার যাত্রার প্রভাতী যুগ। আজ এই প্রদোষক্ষণে তেমনি এক গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছি। ওংকার-ফাঁড়ির মধ্যে দিয়ে। পায়ে হেঁটে নয়, মোটর বাসে—নানা যাত্রীর সহযোগে। আজ কিন্তু দৃষ্টির সামনে সৌন্দর্যের কোনো আকর্ষণ নেই—পাশে নেই কোনো পরিচিতের সহযোগিতা, কোনো বন্ধুতার উত্তাপ। হু-হু করে বাতাস বইছে, হি-হি করে নেমে আসছে শীত—সেই সঙ্গে আমার সমস্ত স্মৃতির চক্রবালকে ধূসরতায় পরিব্যাপ্ত করে নেমে আসছে বিষণ্ণ অন্ধকার।

রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত যেখানে সরু হয়ে গিয়েছে, সেইখানে এসে বাস থামল সন্ধ্যার অন্ধকারে। দুধারে যেমন বন তেমনিই আছে—যেমন অন্ধকার তেমনিই। বাঁ পাশে দুটি দোকানে টিমটিমে তেলের আলো। ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর বাসের হেড-লাইটটা জেলে রেখে দোকানে গিয়ে ঢুকল। দেহাতীরা গেল ডানদিকে, মহারাষ্ট্রীয় দলটা সোজা এগিয়ে গেল সরু রাস্তায়। কেউ ফিরেও তাকালো না এই অচেনা পথিকের দিকে।

সেই অজানা নির্জন অন্ধকারে কাঁধে কম্বল আব হাতে ব্যাগ নিয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইলাম। বাসের হেড-লাইটের আলো রাস্তার ধারে একটা কাঠের ফলকে পড়েছিল। সেই আলোয় দেখলাম, ফলকের উপর লেখা রয়েছে—ওংকার-মান্ধাতা।

মান্ধাতা সূর্যবংশীয় মহাসম্রাট। তিনি সমস্ত আর্যাবর্ত জয় করেন এবং বহুবার অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। বৈবস্বত মনুর প্রথম পুত্র ইক্ষাকু তাঁর আদি পূর্বপুরুষ। মান্ধাতার পিতার নাম যুবনাশ্ব।

পুত্রলাভ মানসে রাজা যুবনাশ্ব যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের মন্ত্রঃপূত বারি ভ্রমক্রমে রাজা নিজেই পান করেন। ফলে পিতার দেহমধ্যে মান্ধাতা সঞ্জাত হন ও তাঁর পার্শ্বদেশ ভেদ করে ভূমিষ্ঠ হন। অগর্ভভূত নবজাতকের খাদ্য কই? মাতৃস্তন তো দুগ্ধহীন! ইন্দ্র এলেন সাহায্যার্থে। শিশুর মুখে তিনি তাঁর অঙ্গুলি পুরে দিলেন, বললেন—মাম্ ধাতা। আমার দ্বারা তুমি পালিত হও। ইন্দ্রের এই স্নেহ-ঘোষণায় নবজাতকের নাম মান্ধাতা।

বিশাল উত্তর ভারতকে সূর্যবংশীয় সাম্রাজ্যের অধীন করেন সম্রাট মান্ধাতা। উত্তর ভারতে চন্দ্রবংশীয় পৌরব শক্তিকে তিনি পর্যুদস্ত করেন। আর্য শক্তিকে দাক্ষিণাত্যে বিস্তারের তিনি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নকে সার্থক করবার প্রেরণায় তিনি মধ্যভারতে নর্মদাতীর পর্যন্ত অভিযান চালান। নর্মদার মধ্যবর্তী দ্বীপময় বৈদূর্য-

মণি বা বৈদূর্য পর্বতে তিনি সুকঠোর শিবযজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন ও ওংকারেশ্বর শূল-পাণির মহাবর লাভ করেন। সেই স্মরণাতীত কাল থেকে এই ওংকার-তীর্থ বৈদূর্য পর্বত মান্ধাতাক্ষেত্র বা ওংকার-মান্ধাতা নামে খ্যাত। নর্মদার শ্রেষ্ঠ শংকর-তীর্থ।

মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দও বিরাট বীরপুরুষ ছিলেন। পিতার অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নর্মদা অভিমুখে রাজ্যবিস্তার করেন ও মান্ধাতা যেখানে শিবার্চনা করেছিলেন সেখানে এক নগরী স্থাপন করেন।

এই নগরী অবশ্য ইক্ষাকুবংশীয়দের হাতে বেশিদিন থাকে নি। চন্দ্রবংশের যাদব-কুলের হৈহয়রাজ মহিষ্মৎ এই নগরী জয় করে নেন ও তাঁর নামে নগরীর নাম হয় মাহিষ্মতী। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা যিনি এই মাহিষ্মতী নগরীর খ্যাতিকে দিক্‌বিদিকে বিস্তৃত করেছিলেন তাঁর নাম কার্তবীর্যার্জুন। পুরাণ-প্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী নগরীর চিহ্নমাত্র নেই—কিন্তু শত শত শতাব্দীর বন্দনায় চিরজীবী হয়ে আছে মান্ধাতাক্ষেত্র ওংকারেশ্বর।

দুপাশে দু-একটা পাকা বাড়ি, অধিকাংশই কাঁচা কুটীর। পিছনে সেগুনবনের ঘন কৃষ্ণতা। শীতের সন্ধ্যা নামতে না নামতে অধিকাংশ ঝাঁপই বন্ধ। এপাশে ওপাশে দু-একটি তেলের টিমটিমে আলো। মাঝখান দিয়ে নির্জন ঢালু পথ। সেই পথ গিয়ে পৌছেছে নর্মদাতীরে।

নিস্তরঙ্গ কালো জল। অদূরে জমাট বাঁধা বিরাট এক কালো। নদীগর্ভ থেকে জেগে ওঠা পাহাড়। চন্দ্রহীন আকাশ। বিশাল পাহাড়ের রেখাটি শুধু ধারণা করা যায়। পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি উজ্জ্বল আলো—ওপারের মন্দিরের আলো।

অন্ধকার ঘাটে নৌকো নেই, মাঝি নেই। কটি লোক ছায়া-ছায়া চেহারা নিয়ে বসে আছে। আর একপাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি—নামহীন পরিচয়হীন আশ্রয়-হীন আগন্তুক। নর্মদাতীরবর্তী মান্ধাতা গ্রামে সন্ধ্যা হতে না হতেই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। এখানে কে আমাকে দেখবে, এখানে কার সঙ্গে আমি কথা বলব? কে আমাকে দেবে আশ্রয়, জানাবে নিশানা? খাণ্ডোয়াতে যখন টিকিট কাটি, তখন বাস-কণ্ডাক্টর ওংকারের টিকিট দিতে একটু আশ্চর্যই হয়েছিল। বলেছিল—এই সময় ওখানে যাত্রীরা বেশি যায় না। কার্তিকী পূর্ণিমা আর শিবরাত্রি ওংকার-দর্শনের প্রকৃষ্ট তিথি। সেই সময়ে প্রচুর ভক্ত-সমাগম। অন্য সময়ে, বিশেষ করে মাঘের শীতে, ওংকার যাত্রীহীন।

হঠাৎ পিছনে ছায়া দেখে চমকে উঠলাম। চমকে উঠে মুখ ফেরালাম। কানে এলো

—কৌন্ তুম্ ? কিধর্ যাওগে ?

ঘাটের মৃদু আলোয় চোখে পড়ল এক নারীমূর্তি। ভূসো কম্বলে গা-মাথা জড়ানো। মুখের আদল বোঝা যায় না। এক হাতে লাঠি, আর এক হাতে একটা ঝুলি।

বললাম—ও পারে যাব মাঈজী। ঐ মন্দিরে।

তুম্ শংকরকা পূজনকারী হো ?

হ্যাঁ মাঈজী, শংকরের পূজা করব বলেই তো এসেছি। ঐ ওপারে ওংকারেশ্বর মন্দির না ? ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে ?

ঠিক বলেছ বেটা। ঐ ওংকারেশ্বর। ম্যয়ভী উহাঁ যাউঙ্গী। লেকিন সাঁঝকা পিছে আর তো নাও মিলবে না !

সারাদিনে অতিক্রম করেছি দীর্ঘ পথ। দুপুরবেলা খাণ্ডোয়ার বাস স্ট্যাণ্ডে কয়েক গ্রাস অখাদ্য মুখে তুলেছি। এখন ধূলি-ধূসরিত দেহ, ক্লান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—জ্বালা করছে পেটের মধ্যে। ওপারে পৌঁছলে যাত্রা শেষ। কিন্তু মধ্যে নর্মদা—পারের কোনো কাণ্ডারী নেই। নিরাশ্রয় পথিককে ঘিরে রয়েছে গভীর শীত-তমসা।

যে মহারাষ্ট্রীয় যাত্রীদল আমার সঙ্গে এক বাসে এসেছিল, তারা কথাই বলে নি আমার সঙ্গে। নামা মাত্র দৌড় দিয়েছিল সামনে। তারা বোধহয় ব্যাপারটা জানত। তারাই বোধহয় আজকের শেষ পারানির যাত্রী। তারা বুদ্ধিমান পুণ্যবান —তাই দিনান্তে নর্মদা তাদের করুণাভরে পার করেছেন। সমস্ত দিনের নিরবচ্ছি যাত্রার পরেও আমি পড়ে রইলাম দূরে—অভীপ্সিত তীর্থের এপারে।

নিতান্ত অসহায়ের মতো মুখ দিয়ে বার হয়ে এলো—তব ম্যয় ক্যা করুঙ্গা ?

আশ্বাসভরা মৃদু হাসি দেখলাম মুখে।

অন্ধকারে বুঝি আশার আলো।

বললে—কী আর করবে ? আমি যা করব, তুমিও তাই করবে। রাতটা কাটাতে হবে এপারে। চলো তার চেষ্টা করি। দেরি করলে কোনো উপায় থাকবে না।

ক্লান্ত পায়ে ঘাট থেকে আবার ফিরে এলাম। চললাম সেই পুরোনো পথ বেয়ে। বাঁ দিকে পুরোনো একটা একতালা পাকা বাড়ি। সামনে চওড়া উঁচু রোয়াক, রোয়াকের পিছনে সারি সারি ঘর। ডানদিকে মস্ত গেট। যাত্রীহীন জৈন ধর্মশালা। ধর্মশালার বৃদ্ধ মুনীব রাস্তার ধারের একটি ঘর খুলে দিলেন। দিলেন একটা আলো। ঘরের অর্ধেকের বেশি জুড়ে ভূষির বস্তা। দরজার কাছটা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে কম্বল বিছোলাম। ব্যাগটা ঘাড়ের তলায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে।

কখন যেন করুণাময়ী সহযাত্রিণী হাত ধরে আমাকে টেনে তুলেছিল। কোথা থেকে

সংগ্রহ করে   ন সেগুনপাতায় করে সামনে মেলে ধরেছিল দুখানা মোটা রুটি। পরম অমৃত মনে করে গোগ্রাসে তাই গিলেছিলাম। তারপর জামা কাপড় জুতো মোজা সুদ্ধ কম্বল মুড়ি দিয়েছিলাম পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেতে।

উষার প্রথম মুহূর্তে বিষ্ণুপুরী ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল। দিনের প্রথম নৌকা। সেই নৌকায় প্রথম যাত্রী আমি আর আমার অপরিচিতা সঙ্গিনী। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। ওপারের সামনে উঁচু পাহাড়। নর্মদাবক্ষে দ্বীপময় বৈদূর্য শৈল—ওংকারেশ্বর পর্বত। আমি চলেছি ঐ দ্বীপে—নর্মদার হৃদয়-সন্নিহিত শংকর চরণে।

এ পারে ঘাট, ওপারে ঘাট—সেই ঘাটে ঘাটে যাত্রী ফেরি করে তিন চারটি নৌকা। এপারের ঘাটের নাম বিষ্ণুপুরী ঘাট, ওপারেব দ্বীপে ঘাটের নাম কোটিতীর্থ। নর্মদার স্বচ্ছ সবুজ জল, শান্ত সরোবর যেন। গভীর অতল শীতল সরোবর। জলের উপর কুয়াশার আস্তরণ। সেই আস্তরণ কেটে নৌকা পৌছল পরপারে কোটিতীর্থ ঘাটে। বৈদূর্য পর্বতে, ওংকারেশ্বরেব পাদমূলে।

হিমশীতল জলে আবক্ষ দেহ ডুবিয়ে এক বৃদ্ধ সাধু আবৃত্তি করছেন—

করচরণকৃতং বাকে-কায়জং কর্মজং বা।
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্॥
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব।
শিবশিব করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

হে মহাদেব শম্ভু, তোমারই বরে নর্মদা মর্ত্যলোকস্থ মহাপাতকনাশিনী। তোমার চরণমূলে নর্মদা-সলিলে অবগাহন করেছি।

যেঽপি ভক্ত্যা সকৃৎ তোয়ে নর্মদায়া মহেশ্বরম্।
স্নাত্বার্চয়ন্তি তে সর্বং পাপং নাশ্যন্ত্য সংশয়ম্॥

হে মহেশ্বর, যারা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে নর্মদা-স্নান করে তোমায় অর্চনা করে, নিঃসংশয়ে তাদের সর্বপাপ বিনষ্ট হয়—এ তোমারই ঘোষণা। কায়েন মনসা বাচা যে পাপ জীবনে করেছি, শ্রবণ নয়নাদি দেহান্দ্রিয়গুলি যে অপরাধ করেছে, কর্মে ও চিন্তায় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে ভ্রষ্টতায় দূষিত হয়েছে আত্মা—ওংকাররূপী হে মহাশংকর, করুণাঘন মহাদেব, সে সব তুমি মার্জনা করো।

গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য, সেই পুণ্য নর্মদা দর্শনমাত্র। কোটিতীর্থ ঘাটে নর্মদালাভে ভক্তিমান হৃদয়ে কোটি কোটি তীর্থদর্শনের সুফল সঞ্চয়। সেই কোটিতীর্থে উপস্থিত হয়েছি এতোদিনে।

পূর্বগগনে প্রভাত-সূর্যের আবির্ভাব। সামনের দিকে মাথা উঁচু করে চেয়ে আছি। বৈদূর্য পর্বতগাত্রে ধবল-শুভ্র বিশাল মন্দির। আকাশচুম্বী তার স্বর্ণচূড়ায় রক্তিম রশ্মির পুণ্য অভিষেক। ঐ মন্দিরে আছেন স্বয়ম্ভূ শংকর। সর্ব শব্দের সর্ব তরঙ্গের সর্ব স্পন্দনের প্রাণব্রহ্ম ওংকারের যিনি হুংকার—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের যিনি পরম অধিপতি—সেই পরমেশ্বর ওংকারশ্বের।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। সংসারাশ্রয়ী মরণ-শীল মানুষ আমি, জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক পাপ করেছি। কিন্তু পাপে আমার আকর্ষণ নেই। জন্মান্তর-বিশ্বাসী সংস্কারাশ্রয়ী হিন্দু আমি—পুণ্য তীর্থে অনেক ঘুরেছি, কিন্তু পুণ্যসঞ্চয়ে আমার আকুলতা নেই।

আমি উদাসীন যাত্রী, আমি নিস্পৃহ ভ্রমণিক। কতো পাপ-মালিন্য থেকে আমি মুক্ত হয়েছি তা আমি জানিনে। কতো পুণ্য অর্জন করেছি তার হিসাব আমার নেই। উৎসশীর্ষ থেকে যাত্রা শুরু করে পাপহারিণী পুণ্যদায়িনী নর্মদার কূলে কূলে আমি ঘুরেছি। পাপপুণ্যের বিচার আমি করি নি। অন্তরে একটি মাত্র অভিলাষ ছিল—অমরকণ্টক থেকে ওংকার পর্যন্ত আমি যাব।

নর্মদা কী কংকর ওয়েহী শিবশংকর। নর্মদাতীরে বহু জাগ্রত তীর্থ। পরিক্রমা-বাসীর ব্রতকাঠিন্য আমি গ্রহণ করতে পারি নি।। বহু তীর্থ আমার অদেখা রয়ে গেছে। তবু সারা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে নানা বিখ্যাত স্থানে শিবাত্মজা নর্মদাকে আমি দেখেছি। শিব-নর্মদার ধ্যান করেছি—মাহাত্ম্য স্মরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি নর্মদাতীরে সর্বতীর্থসার ওংকারে। আমার নিভৃত মনের প্রিয় আকাঙ্ক্ষায় স্নেহদৃষ্টি রেখেছেন নর্মদা-শংকর।

২৩

নৌকা তীরে ভিড়তেই গত রাত্রের সহায়িনী রমণী নীরবে বিদায় নিয়েছিল। কয়েকজন পাণ্ডা আমার কাছে এলেন।

এ তীর্থে আমি কখনো আসি নি। আমার পূর্বপুরুষরাও কেউ কখনো এসেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। যাত্রীকে কবলস্থ করার প্রতিযোগিতা পাণ্ডাদের মধ্যে নেই। যে পূর্ণতার প্রশান্তিতে আমার মন ভরপুর, পাণ্ডারা তাকে নষ্ট করলেন না। তাঁরা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন আমার বর্ণ ও গোত্র—তারপর একজন বৃদ্ধ পাণ্ডা তাঁদের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে আমার ব্যাগটা হাতে নিলেন। শান্ত গলায় আমাকে বললেন—

আসুন বাবুজী, আমার সঙ্গে চলুন।

অচেনা যাত্রীর অভ্যর্থনায় নীরবে স্মিতমুখে যোগ দিলেন অন্য পাণ্ডারা।

তীর্থবন্ধু হলেন মূলচাঁদ পাণ্ডা। তিনি সযত্নে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখালেন ওংকারেশ্বর তীর্থ। চওড়ায় লম্বায় কোটিতীর্থ ঘাট অতি বিশাল। বৈদূর্য পর্বতের দক্ষিণ সানু ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকার। স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য ঘাটের ধারে অনেকগুলি ছায়াঢাকা চৌকি পাতা। মেয়েদের আব্রুর জন্যে সাময়িক পরদার বন্দোবস্তও আছে। পাহাড়ের ঢালু সোজা বাঁধা ঘাটের উপর নেমেছে। কোণে কোণে কয়েকটা গহ্বর, সাধুদের আশ্রয়। ঘাটের বাঁ দিক ঘেঁষে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির ধারে ধারে ভিক্ষুক—দেবপূজার আয়োজন নিয়ে পসারিনী। এক পসারিনীর কাছে পাণ্ডা রাখলেন আমার ঝুলি, কম্বল আর জুতো।

পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ি উঠেছে। পাহাড়ের ঢালুতে জনপদ, পাহাড়ের ঢালুতে মন্দির। দুপাশে ছোটবড়ো অনেক মন্দির অনেক বিগ্রহ দেখতে দেখতে ওংকারেশ্বর মন্দিরের সামনে এলাম। সুন্দর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। তার প্রান্তে সাদা ধবধবে মন্দির সামনে সবুজ নর্মদা, পিছনে পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্যানী। তার মাঝখানে ওংকার-মন্দির একটি উজ্জ্বল শ্বেত আলোকশিখার মতো। মন্দিরের সম্মুখে ও আশেপাশে কতো দেবমূর্তি, কতো ভক্তমূর্তি। অবিমুক্তেশ্বর, জ্বালেশ্বর, দুর্গা, নন্দী, গণপতি, ভক্ত হনুমান, শুকদেব, মান্ধাতা প্রভৃতি। মূলচাঁদ প্রতিটি মূর্তি একে একে দেখালেন। তারপর প্রবেশ করলাম ওংকার-মন্দিরের নাটমন্দিরে।

পশ্চিমমুখী মন্দির। বিশাল বিশাল লাল পাথরের স্তম্ভ পর্বতগাত্রের এই সুউচ্চ

মন্দিরকে খাড়া রেখেছে। সেই স্তম্ভের গায়ে নিপুণ কারুকার্য, শীর্ষে শোভন খিলান। কালো সাদা চৌকো পাথরের সুদৃশ্য মসৃণ নাট-মন্দিরের কক্ষতল। নাটমন্দিরে কয়েকজন পুরোহিত ও সাধু বসে আছেন। নাটমন্দিরের প্রান্তে মন্দিরের গর্ভগৃহ। উত্তরমুখী তার দ্বার। সেই গর্ভগৃহে মান্ধাতা-পূজিত ওংকারেশ্বর।

স্বয়ম্ভূ ওংকারেশ্বর গভীর গর্তের মধ্যে লুক্কায়িত নন – ভক্তের সামনাসামনি তিনি আসীন। নিত্য জলপূর্ণ একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, মাঝখানে শ্বেতধবল ওংকারেশ্বর জেগে আছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে এক ঘৃতপ্রদীপের অনির্বাণ শিখা। পিছনে শ্বেতপাথ-রের পার্বতী মূর্তি।

কোটিতীর্থে নর্মদাবারি মাথায় দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো পূজা-উপচার সঙ্গে আনি নি। ওংকারস্পর্শিত এক অঞ্জলি জল মূলচাঁদ পাণ্ডা আমার বদ্ধাঞ্জলি ভরে দিলেন। সেই জলই লিঙ্গশীর্ষে অর্পণ করলাম। হাতে দিলেন কয়েকটি ফুল। পাণ্ডার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করলাম—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

মন্দির প্রদক্ষিণ করে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় মূলচাঁদ বললেন—ওংকার-মন্দিরে পঞ্চশিবের এক শিব দেখলেন, বাকিগুলি দেখবেন না?

আমি বললাম—কোথায়? পিছন দিকে?

মন্দিরচূড়ার দিকে হাত বাড়ালেন মূলচাঁদ। আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন—না, ঐ ঊর্ধ্বপানে।

আশ্চর্য হলাম। পাণ্ডা বললেন—ওংকারদর্শন এখনো আপনার সম্পূর্ণ হয় নি। আসুন আমার সঙ্গে।

একপাশে ক্ষুদ্র একটি দ্বার। চৌকাট পার হয়েই সরু সিঁড়ি, উঁচু উঁচু পাথরের ধাপ। মূলচাঁদজীর পিছনে পিছনে সেই ধাপ বেয়ে উঠলাম। কুড়ি বাইশ ধাপ উঠতেই সামনে আর একটি কক্ষতল। মন্দিরের ভিতর দিয়ে উঠেছি আধো-অন্ধকারে। দু-পাশে অন্ধকার পাথরের দেয়াল। মন্দিরের এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে পশ্চিমমুখী বড়ো বাতায়ন। সেই বাতায়ন দিয়ে আলো ঢুকছে কক্ষে। সেই কক্ষে আসীন এক শিব-লিঙ্গ

মূলচাঁদ বললেন—এঁকে প্রণাম করুন, ইনি সিদ্ধনাথ।

প্রণাম করলাম। আবার উঠলাম সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে। পৌছলাম তৃতীয়

কক্ষতলে। সেখানেও মহাদেব।

মূলচাঁদ বললেন—প্রণাম করুন, ইনি মহাকালেশ্বর।

আবার উঠছি ধাপে ধাপে। সিঁড়ি এখানে খুব সরু। হাঁফ ধরা অন্ধকার। দুধারে কঠিন পাথরের ঠাণ্ডা দেয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে উঠছি। পৌঁছলাম আর এক প্রকোষ্ঠে। সামনের গবাক্ষটি এতো ছোট যে তা দিয়ে আলোর সামান্য আভাস-টুকু মাত্র ঘরে ঢুকেছে। সামনে একটা ঝাপসা আয়তন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ঘরে ঢুকবার দরজাটিও অত্যন্ত ছোট—নেহাত হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

মৃদু একটি আলো জ্বালালেন মূলচাঁদ। সেই আলোয় চোখে পড়ল ঘরের মাঝখানে আর একটি ছোট শিবলিঙ্গ।

মূলচাঁদ বললেন—ইনি গুপ্তেশ্বর, এঁকেও প্রণাম করুন।

ওঃ! এখনো শেষ হয় নি। দর্শন এখনো বাকি। আরো একতলা উঠতে হবে। একটা মানুষ কোনো মতে পাশ ফিরে গুঁড়ি মেরে উঠতে পারে। তাই উঠছি। হাঁফ-ধরা নিশ্বাসের শব্দ দুপাশের বদ্ধ দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

হঠাৎ চোখে লাগল আনন্দময় আলোকের স্পর্শ। পৌঁছলাম মন্দিরচূড়ার ঠিক নিচে। পঞ্চম তলায়। ক্ষুদ্র গোলাকার প্রকোষ্ঠ। সামনের সমস্ত দেয়াল জুড়ে খোলা গবাক্ষ। সেই গবাক্ষ দিয়ে আসছে আলো-হাওয়ার প্রস্রবণ। প্রকোষ্ঠের মাঝখানে সিঁদুর মাখানো একটি ত্রিশূল। ত্রিশূলের গায়ে রক্ত-পতাকা।

সেই ত্রিশূলের সামনে মাথা রাখলাম। ইনি ওংকারের পঞ্চম মহেশ্বর—ধ্বজাধারী।

নাটমন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। তারপর মূলচাঁদের সঙ্গে কাছাকাছি একটি দোকানে গিয়ে ঝুলি-কম্বল রেখে চা-লাড্ডু খেলাম।

মূলচাঁদ বললেন—এবার উঠুন বাবুজী। আরো অনেক বাকি আছে। তীর্থদর্শনের মাঝে বেশি দেরি করতে নেই।

আবার এলাম কোটিতীর্থের ঘাটে। উঠলাম নৌকায়। যে পার থেকে ভোরে এসে-ছিলাম সে পারে আবার যেতে হবে।

মূলচাঁদকে বললাম—ওপারে আবার কেন পাণ্ডাজী? ওপারে কী আছে?

মূলচাঁদ হেসে বললেন—কাল সন্ধ্যায় পৌঁছেছেন, কেউ কিছু বলেনি বুঝি? ওপারে যে বিষ্ণুপুরী ব্রহ্মাপুরী! আর ওপারেই তো জ্যোতির্লিঙ্গ অমলেশ্বর!

নর্মদার ঐ দক্ষিণ তীর আর নর্মদাবক্ষে এই বৈদূর্য পর্বত, সব মিলিয়ে ওংকার-মান্ধাতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির সম্মিলনে মহাতীর্থ ওংকারেশ্বর।

নর্মদাতীরে পাশাপাশি বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরী। আর শিবপুরী দ্বীপশৈলে। বিষ্ণুপুরীর মন্দিরে আছেন কৃষ্ণমূর্তি বিষ্ণু-ভগবান ও স্ফটিক-শুভ্র লক্ষ্মী। ব্রহ্মা-পুরীতে ব্রহ্মেশ্বর আসীন। আর মাঝখানে আছেন জ্যোতির্লিঙ্গ অমলেশ্বর বা মামলেশ্বর। এই জ্যোতির্লিঙ্গের পদতল দিয়ে দক্ষিণের কোন্ পর্বতগাত্র থেকে উদ্ভূত এক শীতল জলধারা মাটির সুড়ঙ্গপথে নেমে এসেছে। রিপুহন্তা শিব নর্মদার অদূরে একদা তাঁর রক্তাক্ত ত্রিশূল পুঁতেছিলেন। সেই ত্রিশূলভেদ কুণ্ডে এই ধারার জন্ম। পাপ রক্তের স্পর্শ এই ধারায়। তাই তার নাম কপিলা। নর্মদার পুণ্য স্পর্শ-লাভে গোমুখ-সংগমে এই ধারার সর্বপাপক্ষয়। অমলেশ্বরে কপিলাসংগম পরম স্নানতীর্থ।

এই প্রসঙ্গে ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গকে স্মরণ করি। সমগ্র ভারত-ভূগোল জুড়ে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে কোটি কোটি শিবতীর্থ। শ্রেষ্ঠ শিবক্ষেত্র দ্বাদশটি —এই দ্বাদশটি ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূ জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে মহামহেশ্বরের প্রকাশ।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওংকারে অমলেশ্বরম্॥
হিমালয়ে তু কেদারং ডাকিন্যাং ভীমশংকরম্।
বারানস্যাং চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোতমীতটে॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ নাগেশং দ্বারকাবনে।
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘৃষ্ণেশং চ শিবালয়ে॥

সৌরাষ্ট্র বা আনর্তদেশের পশ্চিম প্রান্তে আরব সমুদ্রতীরে প্রভাসক্ষেত্র। মহাপ্রজা-পতি দক্ষের অভিশাপে চন্দ্রের স্বর্গীয় দীপ্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। নিষ্প্রভ কলঙ্কিত-তনু চন্দ্র এখানে শিবতপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব এখানে আবির্ভূত হন। এখানে পুণ্যা সরস্বতী নদী সাগরে পতিত হয়েছেন। শংকর-বরে এই নদীসংগমে স্নান করে চন্দ্র আবার তাঁর পূর্বভাতি ফিরে পান। এই কারণে এই তীর্থের নাম প্রভাস এবং মহাদেবের নাম সোমনাথ।

সোমনাথের মন্দির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। মুসলমান আক্রমণে এই মন্দির বারে বারে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। বারে বারে পুনর্নির্মিত হয়েছিল হিন্দু ভক্তের আগ্রহে। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরকে প্রথম লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন গজনীর সুলতান মামুদ। গুজরাটের রাজা ভীমদেব ও মালবের রাজা ভোজ পুনরায় মন্দির নির্মিত করেন এবং পরবর্তী তিনশো বছরে সোমনাথের ঐশ্বর্য ও বিরাটত্ব বহুগুণে বর্ধিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি আলফ খান পুনরায় সোমনাথ

ধ্বংস করেন। পরবর্তী হিন্দুরাজগণের প্রচেষ্টায় আবার মন্দির পুনর্নির্মিত হয়। পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে অনেকবার সোমনাথ মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয় —শেষ আঘাত হানেন ১৭০১ সালে মুঘল সম্রাট আওরংজেব। ১৭৮৩ সালে সমুদ্রতীরবর্তী বিধ্বস্ত মন্দিরের অদূরে একটি ক্ষুদ্রতর মন্দির নির্মাণ করে সেখানে সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেন রাণী অহল্যাবাঈ। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোমনাথের নূতন মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভেরাবল বন্দর থেকে প্রভাস বা সোমনাথে যেতে হয়।

অন্ধ্র রাজ্যে কুর্নুল জেলার অন্তর্গত নন্দকোটকুর তালুকের অরণ্য-পার্বত্য অঞ্চলে মহা শৈবতীর্থ শ্রীশৈল। কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত। এই শ্রীশৈল বা শ্রীপর্বত চূড়ায় জ্যোতির্লিঙ্গ মল্লিকার্জুন। দেবীর নাম ভ্রমরাম্বিকা। এখানে কৃষ্ণানদীর অপর নাম পাতালগঙ্গা। এক ভক্তিমতী রাজকন্যা মল্লিকাফুল দিয়েএখানে শিবার্চনা করেছিলেন—তাই জ্যোতির্লিঙ্গের নামের আগে মল্লিকার নাম। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার প্রতিষ্ঠাতা মহাদার্শনিক নাগার্জুন এই শ্রীপর্বতে বহুকাল তপস্যা করেছিলেন। তাঁর নামে এই জ্যোতির্লিঙ্গের নামের শেষে অর্জুন।

জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালের প্রকাশ শিপ্রানদী তীরে উজ্জয়িনীতে। শিবপুরাণে উল্লিখিত আছে যে দূষণ নামে এক মহাদানব অবন্তী রাজ্য আক্রমণ করে ও শান্ত ও দুর্বল অধিবাসীদের পর্যুদস্ত করে। অবন্তী নিবাসী এক পরম ভক্তিমান ব্রাহ্মণ সুকঠিন যোগবলে মহাকাল মহাদেবের করুণা অর্জন করেন। ভক্তের প্রতি করুণায় শিব এখানে আবির্ভূত হন ও দানববিনাশ করে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করেন।

ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে প্রায় বারো হাজার ফুট ঊর্ধ্বে কেদারতীর্থ। মন্দাকিনীর উৎস কেদারে—মহান্ জ্যোতির্লিঙ্গের পদমূলে। স্বয়ং বিষ্ণুর তপস্যায় কেদারতীর্থে স্বয়ম্ভূ জ্যোতির্লিঙ্গের আত্মপ্রকাশ। সংসারের পাপ-পুণ্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পরম নিলয় এই কেদারে। তাই ভারতযুদ্ধের অবসানে অনাসক্ত প্রশান্তির আকুলতায় পঞ্চপাণ্ডব রুদ্র-হিমালয়ের এই মহান্ তীর্থে উপনীত হয়ে জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথের তপস্যা করেন।

ডাকিন্যাং ভীমশংকরঃ। জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমশংকরের অবস্থিতি ডাকিনী রাজ্যে। এই ডাকিনী রাজ্য কোথায়? নৈনিতাল জেলায় কাশীপুরের কাছে উজ্জনক বলে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে ভীমশংকর মহাদেবের একটি বড়ো মন্দির আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের রাক্ষস-পত্নী হিড়িম্বার জন্মভূমি এই স্থান। নাম ডাকিনী দেশ। এখানকার শিবলিঙ্গই জ্যোতির্লিঙ্গ।

কিন্তু শিবপুরাণ অনুসারে ভীমশংকর জ্যোতির্লিঙ্গ কামরূপে আসীন। কামিনী

রাজ্য কামরূপ, এই কামিনীই ডাকিনী। কথিত আছে আসামে কামরূপ নামে একজন মহা শিবভক্ত রাজা ছিলেন। ভীম নামে এক রাক্ষস কামরূপকে ধ্বংস-করবার জন্যে তরবারি হস্তে ছুটে আসে। রাজা তখন পর্বতশিখরে শিবপূজায় রত ছিলেন। ভীমাসুরের উন্মুক্ত তরবারি শিবমূর্তির মাথায় পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে শিব-শক্তি স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে প্রকটিত হয়ে ভীমাসুরকে ধ্বংস করেন। কামাখ্যা তীর্থের অদূরে ব্রহ্মপুর পর্বতশিখরের ভৈরবই ভীমশংকর জ্যোতির্লিঙ্গ।

ভিন্ন মত অনুসারে পুণা জেলায় ভোবরগিরি গ্রামে ভীমানদীর তীরবর্তী ভীমশংকর তীর্থের শিবলিঙ্গই ভীমশংকর জ্যোতির্লিঙ্গ। ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করার পর শূলপাণি শংকরের শ্রান্ত অঙ্গ নিঃসৃত স্বেদবারি মাটিতে পড়ে ধারারূপে প্রবাহিত হলো। শিবাঙ্গস্বেদ থেকেই ভীমা নদীর উৎপত্তি। মহাদেবের নাম ভীমশংকর।

সপ্তম জ্যোতির্লিঙ্গ কাশীধামের বিশ্বনাথ। অষ্টম জ্যোতির্লিঙ্গ গোতমীতটে ত্র্যম্বকেশ্বর। নাসিক থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে ব্রহ্মগিরি পর্বতে ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। গোদাবরী নদীর উৎসস্থল। মহারাষ্ট্র রাজ্যের সুবিখ্যাত তীর্থ। ব্রহ্মার মনোবাসনায় এই ব্রহ্মগিরি শিখরে স্বয়ম্ভু শিব প্রকাশিত হন। এই তীর্থে শিবকরুণায় গোহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হন মহাঋষি গৌতম। নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষনাথ এই ব্রহ্মগিরিতে সিদ্ধিলাভ করেন।

বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার দেওঘরে বৈদ্যনাথ ধাম—এখানকার বৈদ্যনাথ মহাদেব অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ নামে খ্যাত। এই জ্যোতির্লিঙ্গের অপর নাম রাবণেশ্বর। লঙ্কাধিপতি রাবণ পরম শিবভক্ত ছিলেন। শিব তাঁকে আপন জ্যোতির্লিঙ্গ দান করেন, বলেন—এই জ্যোতির্লিঙ্গ তুমি লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করো, তাহলে আমার বরে অজেয় হবে তোমার লঙ্কারাজ্য। দেবতারা প্রমাদ গনলেন—জ্যোতির্লিঙ্গ রাক্ষসরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তা তাঁরা চান না। রাবণের দেহে বরুণ প্রবেশ করলেন। মূত্রত্যাগের জন্য রাবণ জ্যোতির্লিঙ্গকে মাটিতে রাখতে বাধ্য হলেন। তারপর ভূপ্রোথিত জ্যোতির্লিঙ্গকে পুনরায় উত্তোলন করতে আর তিনি পারলেন না। এই সেই রাবণের জ্যোতির্লিঙ্গ।

শ্লোকানুসারে পরল্যাং বৈদ্যনাথম্—বৈদ্যনাথের অবস্থিতি পরল্যায়। অনেকে বলেন পূর্বে দেওঘরের নাম ছিল পরলীপুর বা ওরলীগ্রাম। হায়দরাবাদে পৈথান থেকে কিছু দূরে পরলী বলে একটি স্থান আছে। যেখানে এক বৈদ্যনাথ শিবতীর্থ আছে। মতান্তরে সেই বৈদ্যনাথই জ্যোতির্লিঙ্গ।

দশম জ্যোতির্লিঙ্গ নাগেশ সম্বন্ধেও নানা মতভেদ। দ্বারকা থেকে ভেট-দ্বারকার পথে নাগেশ্বর শিব এই জ্যোতির্লিঙ্গ—এই এক মত। অন্য মত অনুসারে আল-

মোড়ার নিকটবর্তী নাগেশ্বর এই গৌরবের অধিকারী। তৃতীয় মত অনুসারে এই জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্য মহারাষ্ট্রের পূর্ণা স্টেশনের নিকটবর্তী শিবতীর্থ নাগেশ্বর।
রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত ও নিহত করে লঙ্কাজয়ের পর সেতুবন্ধে শিবার্চনা করেন রামচন্দ্র। জানকী বালুকা দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে দেন। রামের পূজায় ও হনুমানের স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শিবশংকর জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থ সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ঘৃষ্ণেশ বা ঘৃষ্ণেশ্বর। এই জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেউ বলেন ইলোরা গুহাবলীর অন্তর্ভুক্ত কৈলাস গুহামন্দিরে এই জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থিতি। অন্য মত অনুসারে দেবগিরি বা দৌলতাবাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে ঘৃষ্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দির রানী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয়ে যে মহাভারতের অভ্যুত্থান—সেই মহাভারতের দেবাদিদেব মহাদেব। মেরুপর্বত থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যখন আর্য দেবতারা নেমে আসেন তার বহু পূর্ব থেকেই ভারত-আত্মার অন্তর-সিংহাসনে শিবশংকব সমাসীন।
আর্যধারার সঙ্গে ভারতের সীমান্তে তিনি উপনীত হন নি, তিনি আগন্তুক নন—ভারতের আদিমতম সংস্কৃতির বুকে তিনি স্বয়ং-প্রকাশিত স্বয়ম্ভূ। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ভারত-ভূগোলের সীমান্তে সীমান্তে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে তাঁর প্রকাশ। ভারতের প্রতিটি পর্বত প্রতিটি নদী শিববন্দনায় রত। শিবশংকর প্রাক্-আর্য ভারতের মহানায়ক।
আর্য ভারতের আদিমতম গ্রন্থ ঋক্‌বেদে শিবের উল্লেখ নেই। মানুষের সর্বমঙ্গলবিধাতা, তাই তিনি শিব—পশুপালক মানব সমাজের পশুদেরও তিনি পালনকর্তা, তাই তিনি পশুপতি। তিনি আদিম সৃষ্টি-সাধনার দেবতা, তাই তাঁর প্রতীক লিঙ্গ।
ভারত-সীমান্তে পদার্পণ করেই এই গণপালক শিবকে দেখে আর্যগণ বিস্মিত হলেন। এ কেমন দেবতা, যার কোনো বৈভব নেই, কোনো রাজসিকতা নেই! যে আচারভ্রষ্ট শ্মশানচারী! মাথায় জটা, অঙ্গে রুধিরাক্ত বাঘছাল, ললাটে সর্পভূষণ, কণ্ঠে সর্পমালা। বৃষভ যার বাহন, পর্বতে যার বাস—অঙ্গে ভস্মবিভূতি মেখে ভূত ও প্রমথগণের সঙ্গে যে ঘোর শ্মশানে বিচরণ করে! উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করে তাণ্ডব নৃত্য নাচে!
আর্য লোকালয়ে প্রথমে শিবের স্থান হয় নি। আর্য ধারণা অনুসারে তখন শিব

তস্কর অন্তজ ম্লেচ্ছ ও অনার্যদের দেবতা। আর্য ঋষি-জনপদের বাইরে ব্রাতদের আস্তানা—শিব ব্রাতপতি। বৈদিক ধর্ম অনুসারে যে যাগযজ্ঞ দেবতার উপাসনা—তা শিবের আকাঙ্ক্ষিত নয়। ভক্তের কাছে যাগযজ্ঞ হোম-অনুষ্ঠান অর্ঘ্য-নৈবেদ্য কিছুই দাবি করেন না শিব। মন্ত্রময় স্তুতিবাক্যে তাঁকে প্রসন্ন করতে হয় না। তিনি অনার্য মানুষের অন্তরলোকে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত মহাযোগী। তন্ত্র তাঁর মন্ত্র, যোগ তাঁর সাধনা।

শিব অর্থ শান্ত। কিন্তু এই শান্ত শিবই আগন্তুক আর্য দেবতাদের ভয়ানক আতঙ্কের কারণ হয়েছিলেন। প্রচণ্ড তাণ্ডবে তিনি দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেন। এই যজ্ঞে আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃগণ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা এক-যোগে মন্ত্রণা করে বিজাতীয় আদিপতি শংকরকে নিমন্ত্রণ করেন নি। কিন্তু সমস্ত আর্যশক্তি এক হয়েও শংকর ক্রোধ থেকে যজ্ঞরক্ষা করতে পারেন নি। শংকর-সেনাপতি বীরভদ্র ও তাঁর অনুচরেরা যজ্ঞ পণ্ড করল। আর্য দেবতা ও আর্য বীররা পলায়ন করেও কূল পেলেন না।

আর্য-অনার্যের এই মহাযুদ্ধের পর সন্ধি হলো। আর্য দেবতাগণ অনার্য নায়ক শিবের প্রতি প্রণত হলেন। অজস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মহাদেবের চরণে প্রণি-পাত করে দক্ষ তাঁর স্তব করলেন।

এই আর্য-অনার্য সন্ধি থেকে মহাভারতের অভ্যুত্থান। অনার্যপতি শিব আর্যরুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে আর্যস্বর্গে আসীন হলেন। তাঁর আদিম অনার্য ঊর্ধ্বলিঙ্গ মূর্তিতে অর্চনা করে আর্যভূমি ফলবতী হলো। তিনি যে শুধু যজ্ঞের ভাগ পেলেন ও হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম হলেন তাই নয়—মহাভারতের মহামহেশ্বর রূপে তিনি ঘোষিত হলেন।

আবার শান্ত হলেন শিব। অমিত উদারতায় দেবতাদের দিলেন সমুদ্রমন্থনের অমৃত, নিজে পান করলেন হলাহল—হলেন নীলকণ্ঠ। আর্য-সংস্কৃতির গঙ্গাধারাকে আপন শিরে গ্রহণ করে আপন প্রজ্ঞায় শোধন করলেন - তারপর তাকে জটার অববোধ থেকে মুক্ত করলেন। মহাভারতের সংস্কৃতিবন্যা তাঁর কল্যাণে আর্যাবর্তে প্লাবিত হলো।

আর্য-অনার্য সভ্যতার মহাসংশ্লেষণের ইতিবৃত্ত পুরাণ। এই পুরাণের পশ্চাদ্ভূমিতে কতো নৃশংস সংগ্রাম, কতো রক্তক্ষয়ী জয়-পরাজয়। আবার কতো দৌত্য, কতো সন্ধি, শুভবুদ্ধির প্রতি কতো আবেদন! আর্য-অনার্য সংঘাত ও মিলনের নব নব ঘটনা ও নব নব সম্ভাবনা, আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয়ের নব নব পন্থা ও পরি-

কল্পনা বিভিন্ন পুরাণকাহিনীর মাধ্যমে বারে বারে মহাভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে।

শিবসতীর পুরাণকাহিনী একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের যে বর্ণনা তাতে দক্ষকন্যা সতীর কোনো উল্লেখই নেই। কৈলাসবাসিনী ভগবতী শিবানীর উল্লেখ মাত্র আছে। অনার্য শিবের শিবানী অনার্যা নায়িকা। তিনি হিমালয়কন্যা পার্বতী উমা। তিনি ঊর্ধ্বমেঢ্রের মহাযোনী—মহাশক্তি মহামাতৃকা। অনার্য সন্তানগণ তাঁকে দুর্গা ভবানী বিন্ধ্যবাসিনী অপর্ণা বা পর্ণশবরী নামে অভিহিত করে। তিনি ভূতেশ্বর ভৈরবের বক্ষবিহারিণী কালিকা কৌষিকী।

কিন্তু পরবর্তী পুরাণের দক্ষযজ্ঞের কাহিনী অনুসারে আর্য মহাপ্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী শিবজায়া। স্বামী তাঁর মহাদেব—কিন্তু পিতা দক্ষ হেলাভরে তাঁর স্বামীকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেন নি। অনিমন্ত্রিতা সতী যজ্ঞস্থলে এলেন ও স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সেখানে প্রাণত্যাগ করলেন। আর্য পত্নীর শোকে কাতর শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে সতীর মৃতদেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াতে লাগলেন। সেই তাণ্ডব নৃত্যের পদাঘাতে সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয়! সৃষ্টিরক্ষার জন্য বিষ্ণু পিছন থেকে তাঁর চক্রে সতীদেহ খণ্ডেখণ্ডে কেটে শিবস্কন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। ধরিত্রীর যে যে স্থানে সতীর দেহখণ্ড পতিত হলো, প্রতিটি স্থান সতীপীঠ রূপে কীর্তিত হলো।

আর্য সভ্যতা একদিনে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয় নি। বহু সহস্র বৎসর ধরে বহু সংগ্রাম ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আর্য চিন্তা ভূভারতে জীর্ণ হয়েছিল। পূর্ব ভারতে আর্যবিদ্বেষী বাণ যেমন, তেমনি আর্যাবর্তের দক্ষিণে বিন্ধ্য ছিলেন শংকরের পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যে আর্য-অভিযানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। শংকর-বরে বিন্ধ্য এতো উঁচু মাথা তুলেছিলেন যে সেই উত্তুঙ্গতাকে অতিক্রম করে আর্য-সূর্যালোক দক্ষিণে প্রবেশের কোনো পথ পায় নি।

ইতিমধ্যে আর্যাবর্তে আর্য ঋষিরা শংকরকে প্রসন্ন করেছেন। আর্য দেবকুল তাঁকে মহেশ্বর বলে মেনে নিয়েছেন। শংকরের প্রসাদে বিন্ধ্যের উঁচু মাথা নিচু করে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করলেন অগস্ত্য। নর্মদার দক্ষিণে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মহা সংশ্লেষণের অধ্যায় আরম্ভ হলো।

অগস্ত্যের কাছে পরাভূত নতশির বিন্ধ্য। অবমানিত ম্লানমুখ। চির-আরাধ্য পরম-পিতা শংকরের তপস্যায় তিনি বসলেন। বললেন—

হে পিতঃ, হে প্রভু, এই কী তোমার মনে ছিল? তোমার বর শেষ পর্যন্ত এমনি ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল! তবে এতোদিন কেন আমি প্রতিরোধ করলাম? কেন

আমি যুদ্ধ করলাম ?

প্রি^ ভক্তের মানস-নয়নে আবির্ভূত হলেন শংকর। বললেন—

ক্ষোভ কোরো না বৎস। তোমার ব্রত নিষ্ফলা হয় নি। তুমি ইতিহাসের এক অধ্যায়কে সম্পূর্ণ করে আর এক নূতন অধ্যায়ের দ্বার খুলে দিয়েছ। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত নবসমন্বিত এক নূতন সভ্যতায় মহাভারতের সৃষ্টি হবে। সেই সৃষ্টির তুমি হোতা।

বিন্ধ্য বললেন – আমার এই অবনত শির আর কি কখনো উঁচু হবে না ?

শংকর বললেন—

তোমার মাথা তো উঁচুই আছে বৎস। প্রাক-আর্য, ও আর্য, উত্তর ও দক্ষিণ, প্রাচীন ও নবীনের চিরপ্রতীক মহাকালেশ্বর আমি। তোমারমাথায় আমার চির-প্রতিষ্ঠা, তোমার ললাটে আমার অমর আশীর্বাদ।

স্বয়ম্ভূ শংকর বিন্ধ্যশীর্ষে আসীন হলেন। নবমানবের নিত্য-পূজিত চির-উদ্ভাসিত জ্যোতির্লিঙ্গ অমরেশ্বর রূপে।

মামলেশ্বর বা অমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের অপর নাম অমরেশ্বর।

২৪

নদীতীরে বিশাল প্রাসাদ। যেমন উচ্চতায়, তেমনি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। একেবারে নদীর কিনারাথেকে উঠেছে। সমস্ত ঢালু জুড়ে মোটা মোটা প্রস্তর স্তম্ভের বনিয়াদ, প্রস্তরের দুর্জয় খিলান। তার উপর পাঁচতলা উঁচু অট্টালিকা। লাল পাথরের গায়ে সাদা চুনকাম। স্তম্ভের সারি একে একে নদীগর্ভ থেকে উঠেছে। সেই স্তম্ভগুলির উপর ভব দিয়ে উদাব উন্মুক্ত বারান্দা, যার পশ্চিম দিক থেকে লাল পাথরের পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে ঘাট পর্যন্ত। সেই বারান্দায় দাঁড়ালে সামনে বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মা-পুবী ও অমলেশ্বব। বাঁ দিকে তাকালে ওংকাবেশ্বর মন্দির। ডান দিকে বিস্তীর্ণ জলধাবা।

উৎসবেব সময এই পাঁচতলা প্রাসাদের প্রতিটি ঘরে দালানে বারান্দায় উঠোনে মানুষেব ভিড়ে পা ফেলবাব জায়গা থাকে না। এখন আছি আমি আর মুনীবজী। ওংকারেশ্বরের শ্রেষ্ঠ যাত্রীনিবাস এটি—বিকানীর নিবাসী গোপীকিষণ জয়কিষণ বাহাতী ধর্মশালা। ধর্মশালা যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁব নাম লাডলি লাল মুনীব।

মুনীবজী বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স প্রায় সত্তর। সাদা রূপালী চুল—পরিষ্কার করে কামানো টকটকে গৌরবর্ণ গাল। অতি সজ্জন, অতি মিষ্টভাষী। এ সময়ে ধর্মশালা নিতান্ত যাত্রাবিবল। কাছাকাছির যাত্রীরা মাত্র আসে, পূজা দিয়েই চলে যায়, রাত্রিবাস করে না। পাঁচতলা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। মুনীবজী আমাকে তাঁর নিজের অতিথি বলে ধবে নিয়েছেন। সামনেব বাবান্দায শতবঞ্চি বিছিয়ে পাশে বসেছেন। আর আছেন মূলচাদ পাণ্ডা।

ওংকাবেশ্বরের একটি পট সামনে মেলে ধরে মূলচাদ আমাকে বোঝাচ্ছিলেন। বললেন —দেখুন বাবুজী, এই মহাতীর্থের নাম যে ওংকাবেশ্বর তা শুধু দেবমাহাত্ম্য নয় প্রকৃতিবও মাহাত্ম্য। এই দেখুন ওংকারদ্বীপ থেকে মাইল দুই পূর্বে কুবের-ভাণ্ডাবী। এইখানে দক্ষিণ থেকে কাবেরী নদী এসে নর্মদার সঙ্গে মিলেছেন। আর দ্বীপেব পূর্ব-তট ছুঁয়ে কাবেরী কিছুটা পূর্বে গিয়ে দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করে দ্বীপের উত্তর তীর ধরে পশ্চিম দিকে প্রবাহিতা হয়েছেন। সেই প্রবাহ আবার দ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে উত্তর থেকে নর্মদায় গিয়ে মিশেছে। ওংকারদ্বীপকে মাঝখানে রেখে কাবেরী-নর্মদাব যুগলধারা ও যুগল-সংগম এইখানে এক প্রাকৃতিক ওংকারচক্র সৃষ্টি করেছে

—তাই মনে হচ্ছে না ?

পটটি ভালো করে লক্ষ্য করে বললাম—ঠিক বলেছেন তাই মনে হচ্ছে বটে !

দেখুন তাহলে, ওংকার নাম সার্থক করতে দেবী নর্মদা কী অপূর্ব রূপ এখানে ধারণ করেছেন !

আমি শুধোলাম– এই প্রাকৃতিক রূপের জন্যেই কি এই তীর্থের নাম ওংকারেশ্বর পাণ্ডাজী ?

উত্তরে পাণ্ডাজী মার্কেণ্ডয়কাহিনী অনুসরণ করলেন।

বললেন—শুনুন বাবুজী ওংকার থেকেই সৃষ্টি। ওংকারেই বিলয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ওংকার-উদ্ভূত ত্রিমূর্তি। ক্ষিতি-অপ তেজ মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূত ওংকারেরই প্রকাশ। দশদিক ওংকারেরই পরিব্যাপ্তি। মনুষ্যদেহে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপে ওংকার বিরাজমান, মানবচিত্তে ষড়রিপুর তাড়না ওংকারেরই উৎক্ষেপ। যোগাশ্রিত অন্তব ওংকারেব মধ্যে ব্রহ্মলাভ করে। আবার কল্পান্তে যখন সর্বসৃষ্টির বিলয়, তখন মহাপ্রাণ ওংকারের মধ্যেই আশ্রয় লাভ করে, ত্রিমূর্তি ওংকারগর্ভে বিলীন হয়। প্রতি কল্পান্তে সৃষ্টির যখন ধ্বংস হয়, তখন সর্বরূপ সবদিক সর্বপ্রাণ প্রতিবার আশ্রয় পেয়েছে নর্মদাতীরে, রক্ষা পেয়েছে নর্মদা-উপত্যকায়। তাই নর্মদাবক্ষের শংকরতীর্থের নাম ওংকারেশ্বর।

পাণ্ডাজী আবার বললেন—কুবের-ভাণ্ডারী আপনাকে দেখিয়ে আনব বাবুজী। সেখানকার প্রাচীন শিবমন্দির দেখবার মতো। সেখানে নর্মদা-কাবেরী সংগমে কুবের তপস্যা করেছিলেন।

কার তপস্যা করেছিলেন ? শিবের ?

না বাবুজী, ব্রহ্মার। কুবেরের কাহিনী জানেন তো ? কুবের ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের বৈমাত্র ভাই। ত্রিকূট পর্বতস্থিত লঙ্কাপুরী থেকে রাবণ তাঁকে বিতাড়িত করেন। রাবণের উপাস্য দেবতা শিবেরও তিনি বিরাগভাজন হন। লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে নর্মদার তীরে এই কুবের-ভাণ্ডারীতে ব্রহ্মার তপস্যা তিনি করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি উত্তর ভারতে আশ্রয় পান ও ধনপতি হন।

অমরকণ্টকের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের আচার্যজীর কথা মনে পড়ল। আমি বললাম—রাবণ রাজার রাজত্ব তাহলে লঙ্কা থেকে নর্মদার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত ছিল বলতে চান ?

নিশ্চয় ! লঙ্কা কোথায় ছিল কেউ জানে না, তবে রাবণের যতো লড়াই তা তো এই নর্মদাতীরেই ! রাবণ-কুবেরের লড়াই, রাবণ-সহস্রার্জুনের লড়াই, এমন কি রাম-রাবণের শেষ লড়াই !

আমি বললাম—লড়াই তো বটেই, তাছাড়া এ স্থান প্রাচীনকালের মহান তপো-ভূমিও বটে !

মূলচাঁদ বললেন—

সারা নর্মদাতটই তপোভূমি বাবুজী। শাস্ত্রে আছে – রেবাতীরে তপং কুর্যাং মরণং জাহ্নবীতটে। তবে বিশেষ করে এই ওংকারতীর্থে তপস্যা করেন নি কে? ব্রহ্মপুরীতে ব্রহ্মা করেছেন, অমলেশ্বরে বিন্ধ্য করেছেন, বৈদূর্য পর্বতে মান্ধাতা করেছেন। কুবের-ভাণ্ডারীতে কুবের করেছেন, মার্কেণ্ডয়শিলায় মার্কণ্ডেয় মুনি করেছেন। কতো মুনি-ঋষি সিদ্ধ মহাপুরুষ যে এখানে তপস্যা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শংকরাচার্য এখানে সিদ্ধ হয়েছেন, কমল ভারতীজী এখানে আশ্রমবাস করেছেন। রামদাসজী মহারাজ, মায়ানন্দজী চৈতন্য উভয়েরই আশ্রম নর্মদা-কাবেরী সংগমে। আপনাদের বাংলাদেশের মহাসাধক ওংকারনাথ সীতারামদাস বাবাজীরও পাকা আশ্রম এখানে আছে। তা ছাড়া কতো শত সহস্র নামপরিচয়হীন মহাপুরুষেব আত্মা সর্বদা এখানে বিচরণ করছে, যাঁদের নিশ্বাস এখানকার বাতাসকে নিরন্তব পবিত্র করছে—তার কোনো ইয়ত্তা আছে ?

এ যুগের কয়েকজন ওংকারাশ্রয়ী মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন মূলচাঁদজী। বিশেষ করে বললেন মায়ানন্দজীর কথা।

মায়ানন্দজীর জন্মস্থান গোয়ালিয়র। ১৮৬৯ নাগাদ তাঁর জন্ম। সংসার-জীবনেব নাম রামচন্দ্র লক্ষ্মণ দেশাই। বাল্যকাল থেকেই তিনি ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। কৈশোরে মনোযোগ সহকারে তিনি গীতা পাঠ করেন। গীতা-অনুধ্যান তাঁর মনে এক আশ্চর্য ঐশ্বরিক প্রেরণা জাগ্রত করে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করে বিশ্বরূপ দর্শন করান। কিশোর রামচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগে—দিব্যদৃষ্টি কী ? বিশ্বরূপ দর্শনে মায়াছায়ামুক্ত কোন্ সত্যের দর্শন লাভ হয় ? এই ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন ও বিভিন্ন সাধু-মহাত্মার সন্নিধানে তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেন। কাশী-বিশ্বনাথে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি দীক্ষা নেন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় মায়ানন্দ।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মায়ানন্দ নর্মদা-পরিক্রমায় ব্রতী হন। নর্মদাতীর্থের সুবিখ্যাত প্রচারক মায়ানন্দ। তিনি এ যুগের আদর্শ পরিক্রমাবাসী। নর্মদাপুরাণ ও রেবাখণ্ডে নর্মদার উভয়তীরবর্তী যে সমস্ত তীর্থের উল্লেখ আছে, প্রতিটি তীর্থ তিনি সন্ধান করেন। প্রতিটি তীর্থে যথোপযোগী কালাতিপাত করে সেই তীর্থের বর্ণনা, ইতি-হাস ও মাহাত্ম্য সংগ্রহ করেন। বিশ্বাসী ভক্তিমান ও সন্ধানী মন ছিল তাঁর।

তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। গভীর নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে নর্মদা-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে তিনি নর্মদা-পঞ্চাঙ্গ নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—যাতে নর্মদার স্তুতি-স্তোত্রের সঙ্গে নর্মদাতীর্থগুলির বিশদ বর্ণনা ও চিত্রাবলী তিনি সন্নিবিষ্ট করেন। নর্মদাতীর্থ সম্বন্ধে মায়ানন্দজীর এই গ্রন্থ অতি মূল্যবান।
নর্মদা-পবিক্রমা সম্পূর্ণ করে মায়ানন্দজী উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের নানা স্থানে দিব্য ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন। চিত্রকূট, কাশী, কানপুর, আজমীঢ, আগ্রা, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি ভ্রমণ করেন। তারপর ফিরে আসেন ওংকার-মান্ধাতায়। এই ওংকাবেশ্বব ক্ষেত্রে মার্কণ্ডেয়শিলার কাছে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন। যোগসাধনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় কাব্য ও অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ রচনায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৩৪ সালে মায়ানন্দজী দেহরক্ষা করেন।

শান্ত অপরাহ্নে নর্মদাতীবে এই সুন্দব উন্মুক্ত বাবান্দায় বসে সাধুপ্রসঙ্গে যোগ দিয়েছি। বড়ো ভালো লাগছে—আনন্দে প্রাণ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ওংকার-তীর্থে আশ্রয় পেয়েছি—পূজার্চনা সম্পূর্ণ করেছি। শংকর চরিতার্থ করেছেন আমার আকাঙ্ক্ষা। আর আমার তাড়া নেই, ছুটোছুটি নেই। তাই এবার নিশ্চিন্ত আলস্যে আমি পা ছড়িয়ে বসেছি। সংপ্রসঙ্গের আলোচনায় মনেব শান্তির ঘট ভবে তুলছি।
এমন সময় বারান্দায় এলেন এক বৃদ্ধ। দীর্ঘ শীর্ণ চেহাবা, পরনে খাটো গেরুয়া কাপড, কাঁধে একটি জীর্ণ কম্বল। নগ্ন পদ। মুখে অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথার দীর্ঘ চুলগুলি একেবারে সাদা।
লাডলি লাল কৌতুক হেসে বললেন—এই নাও, সাধু সন্ন্যাসীর কথা বলতে না বলতেই সবসে বড়িয়া সাধুমহাত্মা হাজির। আও ইধর্ মুকুন্দবাবা, বৈঠো হাম-লোগোঁকে পাস্!
বৃদ্ধ আমার মুখোমুখি বসলেন। মূলচাঁদ ও মুনীবজীকে কুশল সম্ভাষণ করলেন। তারপব আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—এ বেটা কৌন?
মুনীবজী বললেন—ইনি একজন তীর্থযাত্রী। আমাদের অতিথি। অমরকণ্টকে গিয়েছিলেন নর্মদামায়ীর উৎস তীর্থ দেখতে। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছেন। বড়ো সৎলোক, মুকুন্দবাবা!
ঘব কাহাঁ? কাহাঁকা রহনেওয়ালা?
এবার আমি বললাম—বাংলাদেশে আমার বাড়ি সাধুজী, আমি বাঙালী।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ—বাংলা মত্ বোলো, বাংলা মত্ বোলো, বাংলা খতম হো গ্যয়া। বোলো ওয়েস্ট বেঙ্গল !

বৃদ্ধের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। সত্যিই বাংলা আজ আর নেই, আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ঈস্ট পাকিস্তান। কিন্তু বঙ্গজননীর বিদীর্ণ হৃদয়ের বেদনায় মধ্য ভারতের এই অপরিচিত সাধুর মন কেঁদে উঠল কেন ?

কোনো উত্তর দিলাম না। বৃদ্ধ আবার মাথা নেড়ে বললেন—

নেহী নেহী, ম্যয় ভুল বোলা। জিস্ যুগ তক্ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকা নাম রহেগা, তব তক্ বাংলাভী রহেগী !

বিস্ময়াপন্ন কণ্ঠে আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথকে আপনি জানেন ?

জরুর। মিলাভী মহাপ্রাণকে সাথ। গান্ধীজীসে খত্ লেকর গিয়া থা ম্যয় শান্তি-নিকেতন মে। উ কিত্না সাল হো গ্যয়া ! কবিগুরু চলা গ্যয়া, গান্ধীজীকী ভী শান্তি মিলি !

মুনীবজী মুগ্ধদৃষ্টিতে এই মুকুন্দবাবার দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার বললেন—

ইনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি বাবুজী। ভারতের অনেক মহামনীষীর সঙ্গে এঁর পরিচয়। লেকিন বুড়ো বয়সে মাথাটা কিছু খারাপ হয়ে গেল ! তাই সব ছেড়ে ছুড়ে সাধু হয়ে জঙ্গলে চলে এলেন। ওপারের বনের মধ্যে পড়ে থাকতেন, আমি শীতকাল বলে জোর করে ধর্মশালায় তুলে নিয়ে এসেছি। বারান্দার ঐ কোণটায় আসন নিয়েছেন !

দেখলাম এই বৃদ্ধ নিঃসম্বল সাধুকে মুনীবজী শ্রদ্ধা স্নেহ দুই-ই করেন। বললেন—

আপনার কবিগুরুর দেশের লোকটিকে দেখে কেমন লাগছে বাবা ?

বৃদ্ধ পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। অতি দীনহীন বিশেষত্বহীন চেহারা। সন্ন্যাসীরও বহিরঙ্গ থাকে, আকর্ষণীয় সৌষ্ঠব থাকে—তার কিছুই নেই ! কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কী এক আকর্ষণ ছিল। সে দৃষ্টি সম্মোহিত করে না, স্নিগ্ধ এক কারুণ্যের শান্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেয়।

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা আদমি, উদাস আদমি !

মুনীবজী মূলচাঁদ উভয়েই হাসলেন। মুনীবজী বললেন—

উদাস আদমিকে আপনার মেহমান করে নিন বাবা ! ইনি যে কদিন থাকবেন—আপনিই ওকে দেখবেন, খিলাবেন—কেমন ?

বৃদ্ধ হাসলেন—বহুত আচ্ছা ! আটার রুটি আর ড়হর ডাল, মুখে রুচবে তো ? আর থোড়া দুধ !

মুনীবজী বললেন—খুব রুচবে। আপনি বানাবার ব্যবস্থা করুন।

মুকুন্দবাবা চলে যেতে মুনীবজী বললেন—

বুড়ো বড়ো দুঃখী বাবুজী। একেবারে নিঃসম্বল। কিন্তু ভিক্ষা নেবে না কারুর কাছে। দুবেলা যদি আপনার রান্না করে তো আপনার সঙ্গে ওরও পেটটা ভরবে। আপনি তো দুকানেই খেতেন, না হয় সাধুর সঙ্গেই সেবা করুন। আপত্তি নেই তো?

আমি বললাম—খুব ভালো ব্যবস্থা করেছেন। তাহলে আমায় যে ঘরটা দিয়েছেন, সেটাও ফিরিয়ে নিন, বাবার আসনের পাশে কম্বল বিছিয়ে রাত্রে আমি শোবো।

সে কি কথা বাবুজী? আমার ঘরের পাশেই যে আপনার ঘর আমি ঠিক করেছি।

আমি হেসে বললাম—না মুনীবজী, সাধুসঙ্গের সুযোগটা পুরোপুরিই আমাকে নিতে দিন। আপনি আমার উপকারই করেছেন!

মূলচাঁদ মাথা নেড়ে বললেন—বাবুজী ঠিকই বলছেন মুনীবজী, এ খুব ভালো ব্যবস্থাই হয়েছে!

দোতলা ঝুল-বারান্দার কোণে। নর্মদা-জননীর ঠিক কোলের উপর। পাথরের মেঝের উপর মোটা চটের আচ্ছাদন। তার উপর আধা-গরম চাদরটি। গায়ে কম্বল। কুকুরকুণ্ডলী হয়ে ঘুমচ্ছিলাম।

কাঁধের কাছে মৃদু স্পর্শ। কানের কাছে মৃদু কণ্ঠ –

ওঠো ওঠো বেটা, রাত্রি শেষ হলো।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তখনো চারিদিক অন্ধকার। অন্ধকার নর্মদাকোল, অন্ধকার দিগন্তে ছায়াচ্ছন্ন বনানীরেখা। পূর্ব চক্রবালে উষার মৃদু অরুণ-আভাস।

বললেন—এমনি ভাবে আসন করে বসো আমার সামনে।

বসলাম।

আবার বললেন মৃদুকণ্ঠে—মন্ত্র নিয়েছ?

মাথা নাড়লাম।

কার কাছ থেকে?

কুলগুরু দিয়েছেন।

বীজমন্ত্র? বেশ। জপ করো।

সাধুর পাশে বসে নিবিষ্টচিত্তে মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। এ মন্ত্র কোনো উপচারের অপেক্ষা করে না. যখন খুশি যে অবস্থায় জপ করা চলে। জপ করতে করতে শেষরাত্রি প্রভাত হলো। পূর্ব গগন অরুণিমার আনন্দ-আবীরে রঞ্জিত হলো।

মুকুন্দবাবা বললেন—

এবার আসন ত্যাগ করো বেটা, চলো নর্মদাতীর।

মুকুন্দবাবার নির্দেশ মতো তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে কোটিতীর্থের ঘাটে নেমে অবগাহন স্নান করলাম। স্থির নিস্তরঙ্গ জল, সবুজ কাঁচের মতো। কতো গভীর তার কোনো তল নেই। ভয় ছিল ঠাণ্ডায় জমে যাব বুঝি। কিন্তু প্রথমবার ডুব দেবার সঙ্গে শীতের আর কষ্ট নেই, শুধু দেহ জুড়োনো প্রাণ জুড়োনো শান্তি।

ধর্মশালার সামনে চায়ের দোকান তখন খুলেছে। দুজনে চা খেলাম। মুকুন্দবাবা আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কিনলেন সের খানেক বাদাম আর পাঁচ পোয়া অড়হর ডাল।

তারপর সেগুলি বাঁ কাঁধের ঝুলির মধ্যে পুরে ডান হাতে বাঁকা লাঠিটি বাগিয়ে ধরে বললেন—

চলো বেটা।

নর্মদা-কাবেরীর মধ্যবর্তী এই ওঁকারতীর্থ একটি পর্বতদ্বীপ। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে তিন মাইল ও প্রস্থে মাইল দুই। দ্বীপের দক্ষিণে নর্মদা, উত্তরে কাবেরী। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তেই কাবেরী নর্মদার সংগম। এই ওংকারদ্বীপকে পরিক্রমা করতে হয়। সেই পরিক্রমায় চলেছি সাধুর সঙ্গে।

দ্বীপের দক্ষিণ গাত্র দিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা আরম্ভ। সরু পাহাড়ী উঁচুনিচু পথ—সেই পথে প্রথমে দেখলাম সীতারামদাস ওংকারনাথজীর আশ্রম। তারপর খেড়া হনুমান ও কেদারেশ্বর মন্দির। এই দুই তীর্থ ছাড়িয়ে পাহাড়ী ঢালু বেয়ে সোজা দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছলাম। উঁচুনিচু পাথরের চাঙড় পেরিয়ে পৌঁছলাম তীরের কাছে।

এইখানে কাবেরী-সংগম। নদীর নিচে পার্বত্য শয্যা। হু-হু বাতাস, জলোচ্ছ্বাসের কলকল শব্দ। সংগমের জল মাথায় নিলাম। একটি লোক স্নান করছিল। জল থেকে প্রশ্ন করলে—

আপনারা কি ওংকার-পরিক্রমা করবেন? তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

যাত্রীটি এক সরকারী কর্মচারী। স্বাস্থ্যবিভাগের লোক। সরকারী কাজে মান্ধাতা গ্রামে এসেছেন। এই সুযোগে তীর্থ সেরে নিচ্ছেন। নাম সুরেন্দ্র দেশাই।

পাথর ডিঙিয়ে আবার পূর্ব দিকে চলতে লাগলেন মুকুন্দবাবা। পিছনে আমি আর দেশাই। বৈদূর্যপর্বতের শিখর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আমরা যাব। পথে নানা তীর্থ পড়বে। সেইগুলি দর্শন করে ওংকার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করব।

প্রথমেই ঋণমুক্তেশ্বর মন্দির। মন্দিরটি বেশ সুসংস্কৃত। পাশে পুরোহিত ও যাত্রীদের পাকা আস্তানা। মন্দিরদ্বারের দেউড়িতে কয়েকজন ভস্মমাখা সাধু।

ঋণমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ।। এঁর করুণায় মর্ত্যমানুষ ইহজীবনের সমস্ত ঋণপাপ থেকে মুক্ত হয়। ভক্তের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পূজাতেই ঋণমুক্তেশ্বর সন্তুষ্ট। পায়ের কাছে পাঁচ পোয়া ডাল ঢাললেই খুশী। প্রণামী বা পুরোহিতের দক্ষিণা আলাদা করে না দিলেও কিছু এসে যায় না। বুঝলাম নিচে বাজার থেকে মুকুন্দজী ডাল সংগ্রহ করে এনেছিলেন কেন। দেশাই আর আমি সেই ডাল ভাগ করে নিয়ে লিঙ্গমূলে উৎসর্গ করলাম।

শুধু ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেব নন, এখানে আছেন রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণ। ভারতের পূর্ব সীমান্তে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন বাণরাজার সঙ্গে। পরম শিবভক্ত বাণ। যাঁর কন্যা উষার সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। বাণের আতিথ্যের হীন অবমাননা করেছিলেন অনিরুদ্ধ। ক্রুদ্ধ বাণ শাস্তিস্বরূপ অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ আসেন পৌত্রের হয়ে বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বাণকে পরাজিত করেন শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করেন। অনিরুদ্ধের প্রণয়িনী বাণকন্যা উষাকেও সঙ্গে নিয়ে যান স্বরাজ্যে। বাণের সঙ্গে যুদ্ধান্তে প্রত্যাবর্তনের সময় শ্রীকৃষ্ণ নাকি এই পর্বতশীর্ষে যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করে বিশ্রাম করেন। তাই তাঁর নাম রণছোড়জী।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবারই যুদ্ধ অভিযান করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরান্তবর্তী অভিযান বাণরাজার বিরুদ্ধে। এছাড়া চেদীরাজ্য তিনি আক্রমণ করেন ও শিশুপালকে ধ্বংস করেন। মথুরাপতি কংসের শ্বশুর ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধ। কৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হবার পর জরাসন্ধ তাঁর চিরশত্রু হলেন। জরাসন্ধ আঠারোবার মথুরা আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত ভীমার্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ মগধ আক্রমণ করেন। ভীম জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত করে বধ করেন।

পূর্বাঞ্চলের কোনো না কোনো সমর-অভিযান সাঙ্গ করে এসে কৃষ্ণ নর্মদামধ্যবর্তী এই শান্ত স্তব্ধ পর্বতশিখরে বিশ্রাম করেছিলেন—এই কিংবদন্তীর ভিত্তিতে রণছোড়জীর প্রতিষ্ঠা। যোদ্ধবেশ আর তাঁর নেই। তিনি আবার শিখিপুচ্ছ ধারণ করে মদনমোহন রূপ নিয়েছেন। হাতে নিয়েছেন মোহন মুরলী।

বৈদূর্যপর্বতের মাথায় পূর্বপশ্চিমব্যাপী সুস্পষ্টভাবে আলাদা দুটি পার্বত্য ধারা প্রসারিত। উত্তরের ধারাটি কাবেরী নদীর দিকে, দক্ষিণেরটি নর্মদা নদীর দিকে।

এই দুই সুদীর্ঘ শৈল-শিরালার মাঝখানে গভীর গহ্বর। গহ্বর জুড়ে সেগুন শাল নিম বাবলার ঘন বনের জটলা।

উত্তর দিকের পর্বতপৃষ্ঠ বেয়ে আমরা উঠতে লাগলাম। কিছু দূর উঠতে না উঠতেই বিশাল এক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। বিরাট চওড়া চওড়া পাথরের প্রাচীর। কোথাও আধভাঙা দু-একটা তোরণ। কোথাও প্রশস্ত কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ। উত্তর দক্ষিণ দুই পার্বত্য পৃষ্ঠ জুড়েই এই বিশাল ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীর অনেক ক্ষেত্রে সমতলের একটু উপরে মাথা জাগিয়ে রয়েছে। এতো চওড়া প্রাচীর যে তার মাথা দিয়ে দশ বারো ফুট রাস্তা চলে গেছে।

কোন্ সুপ্রাচীন যুগে এই পর্বতশীর্ষে এক দুর্মদ দুর্গনগরী ছিল? কোন্ বহিঃশত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য কোন্ মহাশক্তিধর সম্রাট এই আশ্চর্য প্রাকৃতিক স্থানকে নির্বাচন করে সেখানে এই অলংঘ্য দুর্গ বানিয়েছিলেন? সেই দুর্গনগরীর চিহ্নমাত্র পড়ে আছে। এইসব মাটিতে লুটিয়ে পড়া প্রাচীর—যার মাথা মাড়িয়ে আমরা হেঁটে চলেছি বাবলা গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

আধভাঙা এক স্তম্ভশীর্ষে উঠে দাঁড়ালেন মুকুন্দবাবা। আমার মনোগত প্রশ্ন তিনি নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিলেন। এপাশে ওপাশে হাত ঘুরিয়ে বললেন—

এই ছাখো মান্ধাতাপুত্র মুচুকুন্দের প্রাসাদ। আবার এই ছাখো সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনের কীর্তি। ভার্গব বীর পরশুরামের হাতে এইখানে নিহত হয়েছিলেন কার্তবীর্যার্জুন। জানো তো সে কাহিনী?

মোটামুটি জানতাম। দেশাই-এর অনুরোধে মুকুন্দ সাধু আর একবার শোনালেন। এই নগরীর নাম মাহিষ্মতী। হৈহয়বংশীয় কার্তবীর্য ছিলেন এখানকার রাজা। সে সময় সারা আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হৈহয়বংশের যেমন প্রতিপত্তি তেমনি প্রতিপত্তি ব্রাহ্মণকুলের ভার্গব বংশের। ভার্গবরা ভৃগুমুনির সন্তান। ভার্গব বংশের সমসাময়িক প্রধান ছিলেন জমদগ্নি। পরশুরাম তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। পরশুরাম এমনই পিতৃভক্ত ছিলেন যে পিতৃনির্দেশে নিজের মাকে হত্যা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

এই জমদগ্নিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। জমদগ্নির এক কামধেনু গাভী ছিল। কার্তবীর্য লুব্ধ হলেন এই কামধেনুর প্রতি। অনুরোধে যখন জমদগ্নি টললেন না, তখন তিনি শক্তির পরিচয় দেখালেন। জমদগ্নির আশ্রম আক্রমণ করে কামধেনুকে কেড়ে আনলেন। পরশুরাম খবর পেয়ে অগ্নিশর্মা! পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি ছুটে এলেন। কুঠারের আঘাতে আঘাতে তিনি কার্তবীর্যের সহস্র হাত টুকরো টুকরো করে

কাটলেন—তারপর শেষ আঘাতে কেটে ফেললেন তাঁর মাথাটা। রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাস্ত করেছিলেন যে মহাবলী কার্তবীর্যার্জুন, পরশুরামের হাতে তাঁর ধ্বংস হলো। সুযোগ বুঝে কার্তবীর্যের পুত্ররা আবার জমদগ্নির আশ্রম আক্রমণ করল। এবারও জমদগ্নি একাকী ছিলেন। ছিলেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। এই অবস্থায় কার্তবীর্যের পুত্ররা তাঁকে কাপুরুষের মতো একসঙ্গে আক্রমণ করে হত্যা করল। সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধে পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।

কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরামের কাহিনী পুরাণপ্রসিদ্ধ—কিন্তু পর্বতশীর্ষের এই ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তার সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়া শক্ত। আমি বললাম—

এই যে দুর্গপ্রাকারের ধ্বংস-নিদর্শন, আপনি মনে করেন এই দুর্গ মুচুকুন্দ কিংবা কার্তবীর্যার্জুনের তৈরি—সেই কাল-সন না-জানা পৌরাণিক যুগে?

একটু হাসলেন মুকুন্দবাবা। বললেন—

মনে করলেই বা আপত্তি কী? ওংকারের প্রাচীন ইতিহাস তো খুব ভালো করে এখনো পড়া যায় নি বাবা! ঐতিহাসিকরা অবশ্য মনে করেন, ওংকারশীর্ষের এই দুর্গনগর আর নানা শৈবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরমার রাজারা। পরমার বংশের বিংশৎ রাজা দেবপালের এক তাম্রফলকও এখানকার এক মন্দিরের গায়ে পাওয়া গেছে। দেবপাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজত্ব করেন। কিন্তু এই যে সামনের পাহাড়জোড়া দুর্গের ধ্বংসস্তূপ—এ দুর্গ কে বানিয়েছিল আর কে ধ্বংস করেছিল, তা তো সঠিক জানা নেই! পুরাণই এর স্রষ্টিকর্তা আর প্রকৃতির হাতেই এর ধ্বংস, এই বলাই সবচেয়ে ভালো, তাই নয়?

মুকুন্দবাবাকে দেখে সত্যিই আমার আশ্চর্য লাগছে। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ, পুরাণ-ইতিহাস—জীর্ণকন্থা বৃদ্ধের দেখছি কিছুই বাদ নেই! দেশাই লোকটি অল্পবয়সী, বেশ প্রাণখোলা। সেও মুকুন্দবাবার সঙ্গে গল্প জমিয়েছে। বাবার ঝুলি থেকে বাদাম বার করে চিবুতে চিবুতে চলেছে।

বাবা বললেন—সব বাদাম খেয়ে ফেলো না বেটা। দোস্তলোকদের জন্যে কিছু রাখো!

দোস্ত? দোস্ত আবার কে?

বলতে না বলতেই সামনে উপস্থিত। পাল পাল হনুমান। বাবা বাদাম কেন কিনেছিলেন তাও বুঝলাম। দুধারে বাদাম ছড়াতে ছড়াতে চললাম। হনুমানরাও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

বেলা প্রায় নটা। চনচনে রোদ। এবড়ো-খেবড়ো পথে ওঠানামা করে চলতে

চলতে বেশ ঘেমে উঠেছি। গায়ের কোটটা খুলে হাতে নিয়েছি। পৌঁছলাম গৌরী-সোমনাথ তীর্থে।

বিশাল মন্দির। ওংকারেশ্বর মন্দিরের মতোই তলার উপর তলা, সবসুদ্ধ চারতলা উঁচু। তবে ওংকার-মন্দিরের মতো সাদা রঙ করা নয়, বালিপাথরের লালচে গেরুয়া রঙ। মন্দিরে আছেন বিশাল শিবলিঙ্গ পালিশকরা কুচকুচে কালো। এতো বৃহৎ ব্যাস যে দুজন লোক পাশাপাশি হাত ধরাধরি করেও লিঙ্গটি ঘিরতে পারে না। মন্দিরের বাইরে সামনে নন্দী হনুমান গণেশ প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-মূর্তি।

মুকুন্দবাবা বললেন—এই গৌরীসোমনাথজীকে নিয়ে একটি বেশ মজার কাহিনী আছে।

দেশাই লাফিয়ে উঠল—মনে পড়েছে, আমি জানি সে কাহিনী। বলব ?

মৃদু হেসে সাধু বললেন—বলো।

এই কালো কুটকুটে গৌরীসোমনাথ লিঙ্গ আদিতে স্ফটিকশুভ্র ছিলেন। এঁর অঙ্গ ছিল, শ্বেতস্বচ্ছ দর্পণতুল্য। কিন্তু এক আশ্চর্য দর্পণ। গৌরীসোমনাথের সামনে যে এসে দাঁড়াত, সে তাঁর অঙ্গের প্রতিবিম্বে নিজের আসল চেহারাটা দেখতে পেত। মানুষের দেহের আড়ালে মনের মধ্যে যে সত্য লুকানো আছে, দর্পণে তাই ফুটে উঠত। গৌরীসোমনাথের এই খ্যাতি শুনে তাঁর সামনে এলেন দিল্লীর বাদশা আওরংজেব। গৌরীসোমনাথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের স্বরূপ তিনি দেখলেন। দেখলেন লিঙ্গগাত্রে এক ঘৃণিত শূকরের প্রতিবিম্ব।

তারপর ?

তারপর ? আওরংজেব তো রেগে আগুন ! নিজের সত্যিকারের স্বরূপ কে আর দেখতে চায় বলুন ? তা ছাড়া তিনি তো একলা দেখেন নি ! পাত্রমিত্র মন্ত্রী সেনা-পতিরাও যে পিছনে দাঁড়িয়ে সেই প্রতিবিম্ব দেখেছে ! গৌরীসোমনাথের গায়ে তিনি আগুন লাগিয়ে দিলেন। সেই আগুনে সোমনাথ ধ্বংস হলেন না—তবে কিনা তাঁর শ্বেতস্বচ্ছ অঙ্গ চিরকালের জন্য কুচকুচে কালো হয়ে গেল !

মসৃণ কষ্টিপাথরের গায়ে হাত বুলিয়ে আমি হো-হো করে হাসলাম। বললাম—কাহিনী ভালো, তবে শেষটি আরো ভালো করা চলত। আওরংজেবের সাধ্য কি যে শিবলিঙ্গকে পুড়িয়ে কালো করেন ! আমি বলব—আওরংজেবের ঐ শূকররূপী প্রতিবিম্ব যখন প্রভু বক্ষে ধারণ করলেন, তখন আপনা থেকেই ঘৃণায় তিনি কালো হয়ে গেলেন। এমনি হীন বিধর্মীর ছায়াস্পর্শও তাঁর অসহ্য—সেই হীন স্পর্শের অপমানেই তাঁর কৃষ্ণমূর্তি গ্রহণ।

সাধু প্রাণ খুলে তারিফ করলেন আমাকে, বললেন—
খাসা বলেছ বাবা, এখন থেকে পাণ্ডাদের বলব তোমার ভাষ্যটাকেই চালু করতে।

পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে-চলা সরু পথ নেমে গিয়ে আবার উঠেছে। উত্তরের পার্বত্য-শিরালা থেকে পৌঁছেছে দক্ষিণ শিরালায়। নর্মদা-কিনারের এই পর্বতরেখা দ্বীপের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেখানে আবার নর্মদা-কাবেরী সংগম। সেখানে স্নানের উপযোগী ঢালু নেই। পাহাড়ের উঁচু কিনার থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে নিশ্চিন্ত আত্মহত্যার প্রশস্ত ব্যবস্থা। ধর্মের নামে কাবেরী-নর্মদা সংগমে ঝাঁপ দিয়ে এই আত্মহত্যার প্রথা নাকি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত চালু ছিল।
এবার দক্ষিণ পৃষ্ঠশীর্ষ ধরে আমরা চলেছি। ছোটখাটো অনেক মন্দির, সিঁদুর মাখানো অনেক ভগ্নমূর্তি পিছনে ফেলে চলেছি। ওংকারের বর্তমান রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আশাপুরী মাতার নূতন মন্দির পার হয়ে চলেছি এখানকার প্রাচীনতম শংকরতীর্থের অভিমুখে।
এই তীর্থ সিদ্ধেশ্বর।
সিদ্ধেশ্বর মন্দির ওংকারতীর্থের প্রাচীনতম মন্দির। এই নাকি প্রাচীন ও আদি ওংকারেশ্বর। এই মন্দিরগাত্রেই পরমার রাজা দেবপালদেবের তাম্রফলক উৎকীর্ণ ছিল।
খাড়াই বেয়ে উঠে এলাম বিশাল এক চাতালের সামনে। মোটা মোটা পাথরের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম মন্দির-চত্বরে। বিশাল এক প্রস্তরময় আয়তক্ষেত্র—নিপুণ জ্যামিতিক কৌশলে যেন আঁকা। তার কিনারে কিনারে কঠিন লাল পাথরের থামের পর থাম। প্রতিটি থামের গায়ে কুঁদে-কাটা কঠিন ভাস্কর্য, প্রতিটি থামের মাথায় কঠোর-দর্শন খিলান। মাঝে দুই খিলানের উপর চড়ানো পাথরের ভারি কড়ি। তার উপরে আর কিছু নেই। এই খিলান, কড়ি আর স্তম্ভরাজির মাথায় পাথরের ছাদ ছিল, বহু কারুকার্যমণ্ডিত চূড়া ছিল—সেসব কালের আঘাতে বহুকাল ধূলিসাৎ হয়েছে। শুধু চাতালের গায়ে গায়ে পাথরে কোঁদা সার সার হস্তীযূথ দেখবার মতো।
উন্মুক্ত আকাশের নিচে পূজাবিহীন স্তুতিবিহীন স্তব্ধ নির্জনতায় বসে আছেন লিঙ্গরূপী সিদ্ধেশ্বর। সর্বসিদ্ধিদাতা আদি ওংকারেশ্বর।
ভৈরব-গুম্ফা, জৈনমন্দির প্রভৃতি দেখে রাজপুরীর পাশ দিয়ে আবার ওংকারেশ্বর মন্দিরে নেমে এলাম। দেশাই সরকারী কর্মচারী। ওপারের গ্রামে কী এক পর্যবেক্ষণে তিনি এসেছেন। শিবপুরী, ব্রহ্মাপুরী, বিষ্ণুপুরী সব মিলিয়ে ওংকার-

মান্ধাতা গ্রামের জনসংখ্যা বারো শতের বেশি নয়। পাহাড়ের মাথায় কয়েকটি গোয়ালার কুটীর মাত্র। পূজারী বা স্থায়ী সাধু অবশ্য কয়েকজন আছেন।
ওংকারেশ্বর মন্দির থেকে ধর্মশালা পর্যন্ত আধ মাইলটাক রাস্তার দুধারেই যা কিছু বাড়ি ও দোকানপাট। পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে চাষী গোয়ালা ও পাণ্ডাদের কয়েকটা বাড়ি আছে। এপারে বিষ্ণুপুরীর পিছনে কয়েকটি পাকা বাড়ি, ধর্মশালা ও মন্দির। পুলিস চৌকী, পোস্ট অফিস, প্রাইমারি স্কুল, লাইব্রেরী, গ্রাম-পঞ্চায়েত দপ্তর আর কপিলাঘাটের সামনে কয়েকটি দোকান।
দেশাইকে নিমন্ত্রণ করলাম। মুকুন্দজীর গিঠ্‌ঠীতে বানানো ডালরুটি একসঙ্গে খেলাম। অপরাহ্নে তিনি বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যাবেলা এলেন মূলচাঁদ পাণ্ডা। বললেন—বাবুজী, পরিক্রমা সাঙ্গ করলেন? কোনো কষ্ট হয় নি তো?
বললাম--খুব ভালো ভাবেই সাঙ্গ করেছি। কষ্টের কথা বলবেন না। মুকুন্দবাবা সঙ্গে থাকলে কোনো কষ্ট হয়? এই দেখুন না, তাঁর হাতে খাচ্ছি, তাঁর পাশে শুচ্ছি, কতো আনন্দ লাভ করছি!
এমনি আনন্দ তো সবাই পায় না বাবুজী! মূলচাঁদ প্রসন্ন হেসে মাথা নেড়ে বললেন—এই আনন্দের স্বাদ নেবার গুণ ভগবান আপনাকে দিয়েছেন, তাই আপনি আনন্দ পান!
আমি বললাম— ও কথা বলবেন না পাণ্ডাজী। আপনি, মুনীবজী, মুকুন্দজী, আশ্রয় দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন—তাই না এ আনন্দের আস্বাদ আমি পাচ্ছি। ঐ দেখুন, পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নর্মদামায়ীর বুক স্নেহের সুধায় রঙিন হয়ে উঠল—ঐ স্নেহ নর্মদাজী আপনাদেরও বুকে ভরে দিয়েছেন। তাই না?
মূলচাদ কোনো কথা বললেন না। বৃদ্ধ মুনীবজী দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে রেবামন্ত্র জপ শুরু করলেন। একটু পরে মূলচাঁদ আবার বললেন—
সে বুড়া কোথায় গেল?
আমি হেসে উঠলাম—
মুকুন্দজী গেছেন বাজারে। আমি তাঁর বাঙালী অতিথি, আজ রাত্রে তিনি আমাকে চাউল খাওয়াবেন—তাই কিনতে গেছেন।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অন্ধকার হয়ে গেল রেবা-দিগন্ত। ওংকারেশ্বর মন্দিরে আলো জ্বলল। শুরু হলো সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি।
মূলচাঁদ বললেন—মন্দিরে চলুন বাবুজী। ওংকারজীর আরতি দেখবেন, শয়ন

দেখবেন!

আলোকমালায় উদ্ভাসিত মন্দির-প্রকোষ্ঠ। ওংকার-.ংকরের সামনে জলছে অনির্বাণ ঘৃতদীপ। স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ ধ্যানমগ্ন ওংকার—সৃষ্টিস্থিতিলয়াধিপতি মহামহেশ্বর। পিছনে বিশ্বার্তিহারিণী বিশ্বতারিণী সর্বমঙ্গলদায়িনী পার্বতী। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় মধুর হাস্যে মৃদুহাসিনী করুণাময়ী জননী।

একধারে বসলাম। পাশে বসলেন মূলচাঁদজী ও মুনীবজী। নয়ন ভরে দেখলাম আলোক-আরতি। আরতির পর গর্ভমন্দিরের সামনে একটি রৌপ্যনির্মিত দোলা খাটালেন পূজারীরা। তারপর সব আলো নিবল—শুধু অনির্বাণ ঘৃতপ্রদীপটি ছাড়া। এবার ওংকারজী বিশ্রাম করবেন। মন্দিরদ্বার বন্ধ হবে।

সমস্ত দেহ লুটিয়ে প্রণাম করলাম ওংকারেশ্বরের চরণে। সম্পূর্ণ হয়েছে তীর্থ। পূর্ণ হয়েছে মনস্কামনা।

হে চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখর স্মরহর শংকর, হে ত্রিলোচন পিনাকধর সর্বেশ্বর, আমার প্রণতি তুমি গ্রহণ করো।

হে মহামৃত্যুঞ্জয়, হে নীলকণ্ঠ ঋণমুক্তেশ্বর, বাসনা-কামনা ব্যর্থতা-চরিতার্থতার সমস্ত জীবনঋণ তুমি গ্রহণ করো।

হে মহাযোগী সর্বত্যাগী দিগম্বর ধূর্জটি, আমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিহীন নামপরিচয়হীন উদাসীন অন্তরের অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো।

কোনো প্রার্থনা নিয়ে আমি তোমার কাছে আসি নি—কোনো আকূতি তোমার কাছে আমি জানাই নি।

সর্বসুখদুঃখপারের যে অব্যয় মঙ্গলের তুমি মহাদেব, সেই নিত্য অনন্ত রেখাচিহ্নহীন মঙ্গলের নিরাসক্ত আশীর্বাদে তুমি আমাকে অভিষিক্ত করো।

আর একটি মানুষ যাকে ভোলা শক্ত। সেই প্রথম মানুষটি সাধু কান্‌হাইয়ালাল। আর এই মানুষটি সাধু মুকুন্দবাবা। একজন তরুণ আর একজন বৃদ্ধ। নর্মদাতীর ধরে তীর্থযাত্রার সংকল্পের সূচনায় কান্‌হাইয়ালাল বন্ধু হয়েছিল—তার সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলাম। তীর্থযাত্রার অবসানে আবার বন্ধু পেলাম ওংকারেশ্বরে। মনে রাখার মতো বন্ধু।

পুরো নাম বালমুকুন্দ মালবীয়। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

এখন কোথা থেকে তুমি এখানে এলে বাবা?

আমি বলেছিলাম—হোসাঙ্গাবাদ থেকে।

বটে? হোসাঙ্গাবাদে কোথায় ছিলে?

হোসাঙ্গাবাদে পৌঁছে উঠেছিলাম শেঠানী ঘাটের কাছাকাছি খাবারের দোকানের মালিকের কোঠায়। কান্যকুব্জ ভোজনালয়ে। সেখান থেকে হাঁটা দিয়েছিলাম রেল স্টেশন ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। রসুলিয়া গ্রামে।

মুকুন্দবাবাকে সেই দ্বিতীয় আশ্রয়ের কথাই বললাম।

বললাম—রসুলিয়া বলে কাছাকাছি একটা গ্রাম আছে। সেখানে এক কৃষি-আশ্রম আছে। সেই আশ্রমে।

উত্তর শুনে দু চোখ যেন চকচক করে উঠল বাবার।

বললেন—বুঝেছি। মার্জরি বহিন কেমন আছেন?

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলাম বৃদ্ধের কথা শুনে। মার্জরি বহিনকে ইনি চিনলেন কী করে?

মিস সাইক্‌স্ অবশ্য ওখানকার আবালবৃদ্ধ-বনিতার মার্জরি বহিন। তাই বলে ওংকারেশ্বরের এই জংলা বৃদ্ধ তাঁকে চিনল কোথা থেকে?

আমি বললাম—মার্জরি বহিন রসুলিয়াতে নেই, তিনি আজকাল নীলগিরিতে থাকেন।

বিস্ময় দমন করতে না পেরে আবার বললাম—

মিস মার্জরি সাইক্‌স্‌কে আপনি চেনেন?

বৃদ্ধ হেসে বললেন—চিনব না? কতোদিন একসঙ্গে থেকেছি যে!

কোথায়?

কেন, সেবাগ্রামে ?

মুকুন্দবাবা কথা বলতে ভালোবাসেন—কিন্তু নিজের কথা নয়। ওংকারের দোকানী পাণ্ডা পূজারী সবাই তাঁকে আধা-বাউরা আধা-ভিক্ষুক বলেই জানে। মুনীবজী আর মূলচাঁদ যা তাঁকে একটু ভক্তি-ভালোবাসা দেখান। সংগতিহীন উদাসীন সাধু— এই পরিচয়ই তাঁর আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গী-সেবক হয়ে কটা দিন বৃদ্ধের কিছু আহার্য-পারিশ্রমিক জুটবে, এই মাত্রই ভেবেছি। কিন্তু এ কোন্ নূতন পরিচয়ের ইঙ্গিত ?

কথায় কথায় মুকুন্দবাবার পুরোনো দিনের কথা কিছু জানতে পারলাম। বাল-মুকুন্দ মালবীয়ের উত্তর-প্রদেশে উচ্চবংশে জন্ম। জোতদারের পরিবার। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে জমিদারী শিক্ষার পাঠ নিতে যখন সবে শুরু করেছেন তখন প্রাণে স্বাধীনতা-সন্ধানের ডাক এলো। একুশের অসহযোগ আন্দোলন, তিরিশের আইন-অমান্য আন্দোলন আর বেয়াল্লিশের ভারত-ছাড়ো আন্দোলন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে নির্ভীক সৈনিক ছিলেন তিনি। গান্ধীজীর একান্ত অনুগামী— দেহে মনে পরিপূর্ণ সত্যাগ্রহী। সর্বভারতীয় নেতাদের অধিকাংশর সঙ্গেই পরিচয় ছিল। জেল খেটেছেন আট-দশ বছর।

বিয়াল্লিশের সংগ্রামে শেষ জেলবাস। মুক্তি যখন পেলেন তখন দেহে বার্ধক্য ও জরার আক্রমণ। সংসার করার সময় বা উৎসাহ কখনো পান নি—সংসারও তাঁকে ভুলেছে। আশ্রয় পেলেন সেবাগ্রামে। গান্ধীজীই জীবনের ধ্রুবতারা।

ধ্রুবতারা যখন অস্তমিত হলো তখন আশ্রমের ধূলিপথে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদেছিলেন। তারপর বেতুলে গেলেন এক কৃষি-আশ্রমে। সেখানে রইলেন কয়েক বছর। তার পর মধ্যপ্রদেশের এক দুর্ভিক্ষ-প্রতিবিধান দলের সঙ্গে গেলেন স্বাধীন ভারতের রাজধানী নূতন দিল্লীতে।

দুশো বছরের পরাধীন অশিক্ষিত অনুন্নত নিপীড়িত দুর্গত ভারতবাসীর নবলব্ধ স্বাধীনতার কী রূপের সঙ্গে দিল্লীতে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। দিল্লী থেকে ফিরে এসে সোজা বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সেবাগ্রামে নয়, অন্য কোনো আশ্রমে নয়। একলা গভীর অরণ্যের মধ্যে। সে প্রায় আট-দশ বছর আগেকার কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

সংসারী আপনি নন, সন্ন্যাসীও আপনি নন। যে স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন কষ্ট করেছেন—স্বাধীনতার পর দেশের কাজ সমাজের কাজ অনেক তো করতে পারতেন ! সব ছেড়ে-ছুড়ে অরণ্যবাসী হলেন কেন ?

বললেন—পরাধীনতাকে চিনতাম, স্বাধীনতাকে চিনতে পারলাম না বলে।
আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেবাগ্রামে ফিরে গেলেন না কেন? গ্রামীণ গঠন-মূলক কাজ তো করতে পারতেন?
বললেন—গান্ধীজীকে চিনতাম, বিনোবাকে চিনতে পারলাম না বলে।
উদার হাসি হেসে বললেন—
আগে আমাকে লোকে পণ্ডিত মালবীয় বলে ডাকত স্বাধীনতার পর দেখলাম সবাই পণ্ডিত হয়ে গেল আর আমি মূরখ্ হয়ে গেলাম। মূরখ্ লোকের জঙ্গলই ভালো।

মুকুন্দবাবা ডাল-রুটি বানান, আমি খাই। ভোরবেলা দুজনে নর্মদাস্নান করি, সারাদিন দুজনে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই, রাত্রে ধর্মশালার বারান্দায় কম্বল জড়িয়ে পাশাপাশি শুই। ইতিহাস-পুরাণ থেকে নানা কাহিনী তিনি বলেন—আমি শুনি। হালের রাজনীতি ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল—তবে বর্তমান সম্বন্ধে মন্তব্য তিনি এড়াতে চান, এলোমেলো কথা বলেন। নিরাসক্ত উদাসীনের পাগল-পাগল কথা। সঙ্গে অনেক স্মৃতির রোমন্থন।
নর্মদার এপারে ওপারে আর দুটি তীর্থ দেখলাম। দক্ষিণ তীরে কুবের-ভাণ্ডারী। ওংকারেশ্বর থেকে মাইল দুই পুবে। এখানে নর্মদার সঙ্গে কাবেরীর সংগম। কাবেরী নদীর ধারা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে মান্ধাতা পর্বতকে পরিক্রমা করে আবার নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই জন্যেই পর্বতের দক্ষিণের নদীকে নর্মদা ও উত্তরের নদীকে কাবেরী বলা হয়। কুবের ভাণ্ডারীতে প্রাচীন শিবমন্দির।
উত্তর তটে চব্বিশ-অবতার তীর্থ। এখানে প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির। বরাহরূপী বিষ্ণু-অবতারের নামে মন্দির উৎসর্গীত। সবুজ পাথরে বিষ্ণুর চব্বিশটি মূর্তি উৎকীর্ণ। অদূরে নদীতীরে কালো পাথরের এক বিশাল দশভুজমূর্তি পড়ে আছে। প্রায় বারো তেরো হাত লম্বা। কেউ বলেন এই মূর্তি রাবণের, কেউ বলেন ধ্বংসরূপিণী দশভুজা চামুণ্ডার।
ওংকারেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পূর্ব দিকে পাহাড়ের গায়ে অতি সুন্দর রাজবাড়ি। বিরাট প্রাসাদ, সামনে সুন্দর উদ্যান। পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো। একদিন সেই রাজবাড়ি দেখতে গেলাম মুকুন্দবাবা আর মূলচাঁদজীর সঙ্গে।
ওংকার-মান্ধাতার বর্তমান রাজা সম্বন্ধে মূলচাঁদ অনেক প্রশংসা করলেন। তিনি অতি সজ্জন ও অতিথিপরায়ণ। পাণ্ডাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার খুব সদয়। মন্দির পরিচালনায় তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। বিশিষ্ট যাত্রীরা এলে রাজার আতিথ্য লাভ করেন। মূলচাঁদ বললেন এক কাহিনী।

সে কাহিনী দ্বাদশ শতাব্দীর। তখন ওংকারেশ্বর-ক্ষেত্র ছিল ভীলদের অধিকারে। ভীলরা অতি নিষ্ঠুর ও নৃশংস জাতি। তারা এখানে এক ভয়ংকরী কালী ও কাল-ভৈরবের উপাসনা করত। তীর্থযাত্রীদের তারা লুটপাট করে বধ করত—কালীর কাছে নরবলি দিত। ওংকারেশ্বরের পূজারী ছিলেন দরিয়ানাথ গোস্বামী। তিনি ভীল মালিকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাজপুত বীর ভকতসিংহ চৌহানের শরণাপন্ন হলেন। ভকতসিংহকে তিনি বললেন—

আপনি ওংকারেশ্বরের মাহাত্ম্যকে আবার জাগ্রত করুন। ভীলদের কালীকে বশ করুন, কালীর নররক্তস্পৃহা থেকে ভক্তদের আপনি বাঁচান।

ভকতসিংহ চৌহান ওংকারের ভীল দস্যুদের আক্রমণ করলেন। তাঁর হাতে পরাজিত হলেন ভীল সর্দার নাথু। ভীলদের বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ নাথু তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করলেন ভকতসিংহের হাতে। ভকতসিংহ ভীলদেবী রক্তলোলুপা কালীকে এক গুহার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন।

মূলচাঁদ বললেন—

সেই রাজপুত বীর ভকতসিং চৌহানের বংশই ওংকার মান্ধাতার রাজবংশ। আর শিবপূজক দরিয়ানাথ গোস্বামীর বংশধররাই ওংকারেশ্বরের বর্তমান পাণ্ডাগোষ্ঠী। পৌরাণিক যুগের মান্ধাতা-কার্তবীর্যার্জুন কাহিনী আগেই শুনেছি। ভীল-রাজপুত দ্বন্দ্বের মধ্যে ওংকার-মান্ধাতার এযুগের ইতিহাসের শুরু। এই কাহিনীর মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী-অধিবাসীর সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আর এক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত।

মুকুন্দবাবা বললেন—

ভীলালা জাতির নাম শুনেছ বাবা?

আমি বললাম—নাম শুনেছি, কিন্তু তার বেশি বিশেষ জানিনে। তারা নাকি ভীল জাতিরই এক শাখা?

মুকুন্দবাবার আদিবাসী-প্রীতির কথা আমার জানা ছিল। নানা এলোমেলো কথার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের সহজ সরল আদিবাসীদের কথা অনেক তিনি উল্লেখ করেছিলেন। নিমাড় জেলার আদিবাসীরা ভীল। ওংকারে আসার আগে ভীলদের মধ্যে তিনি অনেকদিন ছিলেন।

ভীলরা অনার্য তবে দ্রাবিড় নয়। কোল বা মুণ্ডা জাতীয়। ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে মান্দলা জব্বলপুর হয়ে তারা মধ্য ভারতে ও রাজপুতানায় ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজপুতরা স্বীকার করে যে ভীলরা তাদের পূর্ববর্তী। শিশোদীয় রাজপুত গোত্র ভীলদের রাজা হন। ভীল সর্দার আঙুল কেটে তাঁর কপালে রাজতিলক

পরিয়েছিল। রাজপুতরা ভীলদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য অধিকার করে-ছিল, আর ভীলরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। গোহের কাহিনী তারই ইঙ্গিত।

প্রাক-আর্য ভীলদের আদিদেবতা শংকর। শংকর তাদের আদি জনক। শংকরের ঔরসে এক পরমাসুন্দরী বন্য রমণীর গর্ভজাত সন্তান থেকে ভীল জাতির উৎপত্তি। আর্যদের থেকে প্রাচীন—বংশগরিমায় আর্যদের থেকে তারা কম নয়। নিজেদের সম্বন্ধে ভীলদের এই গর্বিত বিশ্বাস।

রাজপুতদের সঙ্গে ভীলদের সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্বে ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজপুতদের মধ্যে পাকা হবার সঙ্গে সঙ্গে ভীলরা পতিত হয়ে গেল। এক ভীল নায়ক নাকি মহাদেবের বাহন নন্দীর গায়ে অস্ত্রাঘাত করে—তাই শিবসন্তান হয়েও তারা শিবের অভিশাপে অপাংক্তেয় নিষাদে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণ একজন ভীলের তীরে প্রাণ হারান। সেই পাপের অভিশাপও কম নয়। মারাঠারা মধ্য ভারত অধিকার করার সময় স্থানীয় আদিবাসী ভীলদের উপর দারুণ অত্যাচার করেছিল। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভীলরা বন্য দস্যুতে পরিণত হয়। দলবদ্ধ নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি হয় ভীলদের প্রধান জীবিকা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভীল দস্যুদের দমন করতে বৃটিশ সরকার অভিযান চালান। শেষ পর্যন্ত তাদের দমন করে বৃটিশ অনুগত এক ভীল সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করেন জেনারেল আউটরাম।

মুকুন্দবাবা বললেন—

বর্তমানে অধিকাংশ ভীলই কৃষিকর্ম গ্রহণ করেছে। ভীলরা অত্যন্ত সাহসী পরিশ্রমী ও সত্যবাদী। ওদের মধ্যেই আমি জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব। তুমি ঠিকই বলেছ—ভীলালারা ভীলদেরই শাখা। গোঁড় যেমন রাজগোঁড় হয়েছে—তেমনি ভীল থেকে উদ্ভূত হয়েছে ভীলালা।

মধ্য ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ভীলদের সঙ্গে রাজপুতদের মিলনে ভীলালা খণ্ড-জাতির উৎপত্তি। ভীল নারী ও রাজপুত পুরুষ এদের পূর্বপুরুষ। এদের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির আদান-প্রদান। অতএব ভীলালারা অতি উচ্চবংশীয়। ভীলালা রাজা-জমিদাররা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন।

মুকুন্দবাবা বললেম—

পরমারদের রাজশক্তি ওংকারের উপর কতোটা শক্ত বা স্থায়ী হয়েছিল তা জানা দুষ্কর বাবা, কিন্তু এটা ঠিক যে ওংকার-মান্ধাতার বর্তমান রাজবংশ এই ভীলালা জাতের। এঁদের রক্তে আদিম ভীল জাতির রক্ত রয়েছে। নাথু ভীলকে হারিয়ে

তার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন রাজপুত চৌহান রাজা —পত্তন করেছিলেন ওংকার-মান্ধাতার বর্তমান রাজবংশ। ভীলদের ডাকাতে-কালীতে বন্দী করেছিলেন। এসব কিংবদন্তীর মধ্যে সেই প্রাচীন আর্য-অনার্য মিলনের ইতিহাসই ঢাকা রয়েছে।

কোটিতীর্থের ঘাটে ভোর থেকে কর্মব্যস্ততা। একধারে লাইন করে পুলিসরা দাঁড়িয়েছে, আর এক ধারে লাইন করে দাঁড়িয়েছে পাণ্ডারা। সারা ঘাটে আর একটি লোকেরও থাকবার অধিকার নেই। ভিক্ষার্থীদের পর্যন্ত মন্দিরের সিঁড়ি থেকে ঝাঁটিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভোরবেলা প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সেরে ধর্মশালা থেকে মন্দিরের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিলাম। খালি পা, গায়ে গেরুয়া গরম চাদরখানা। ডানহাতে পুঁটুলিভর্তি অনেকগুলো খুচরো পয়সা। মূলচাঁদ পাণ্ডাকে গতকাল বলাই ছিল আজ সকালে ভালো করে ওংকারেশ্বরের পূজা দেব। তারপর ইচ্ছা ছিল ভিক্ষার্থীদের তুষ্ট করব খুচরোগুলি বিতরণ করে।

সিঁড়ির সামনেই পাণ্ডার সঙ্গে দেখা। আজ তাঁর বিশেষ বেশবাসের ঘটা। পাটভাঙা ধুতি, গলাবন্ধ গরদের কোট, গলায় গরদের চাদর। কপালের মাঝখানে লাল টিপ ঘিরে হলুদ রঙের শিবতিলক।

হাত জোড় করে বললেন —সকালবেলা বড়ো ঝামেলায় পড়েছি বাবুজী। আপনার পুজো দিতে আজ একটু দেরি হবে—আমি সময় মতো নিজে আপনাকে ডেকে নিয়ে আসব।

জনবিরল সিঁড়ি বেয়ে ঘাটে নেমে এলাম। উর্দিপরা এক পুলিস অফিসার আঙুল দেখিয়ে বললেন—সামনে দাঁড়াবেন না, ঐ কোণে চলে যান। হাঁটাহাঁটি করবেন না এদিক ওদিক।

কোন্ এক জবরদস্ত ভি আই পি আসছেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বিষ্ণুপুরীর ঘাটে সব কটি নৌকা লেগেছে। নৌকাগুলি ফুলের মালা আর পতাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ঘাটের কাছে অনেক ভিড়। বাজনা বাজছে—তার সুর এপারের পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘাটের উপর রঙিন শামিয়ানা। ত্রিবর্ণ পতাকা পতপত করে উড়ছে।

পাঁচটি নৌকা একসঙ্গে ছাড়ল। বাজনার তালে তালে মাঝিরা দাঁড় বাইতে লাগল, কয়েক মিনিট পরেই নৌকা এসে লাগল কোটিতীর্থের ঘাটে।

ঘাটে শুধু পুলিস আর পাণ্ডাদের সারি। আর কোনো পূজার্থী নেই, যাত্রী নেই, একটি ভিখারী পর্যন্ত নেই।

এককোণে দাঁড়িয়ে আমি দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

পুলিস পাণ্ডা পরিবৃত হয়ে মহার্ঘ অতিথিরা সিঁড়ি মসমসিয়ে মন্দিরে উঠে গেলেন। বাজনা বন্ধ, চারিদিক নিস্তব্ধ। অদূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে দর্শকের জটলা।

ঠিক পনেরো মিনিট পরে আবার বাজনা বেজে উঠল। দর্শন সেরে ফাইলবন্দি সান্ত্রীদের মাঝখান দিয়ে ভি আই পি-রা ঘাটে নেমে এলেন। তাঁরা নৌকোতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী জনতাকে মুক্তি দেওয়া হলো। ভিড়ে ভরে গেল কোটিতীর্থের ঘাট। আমিও সামনে এগিয়ে গেলাম।

ঘাট থেকে কয়েক হাত দূরে যখন নৌকা, তখন নৌকার যাত্রীরা মুঠিভরা খুচরো পয়সা ঘাটে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন। ভিখারীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আশীর্বাদ আর প্রার্থনার চিৎকার—নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি আর মারামারি।

ভিক্ষুকদের এই ধাক্কাধাক্কি থেকে গা বাঁচাবার জন্যে কয়েক পা পিছু হটেছি, এমন সময় পায়ের কাছে ছিটকে এসে পড়ল একটি দেহ। দুর্বলদেহ এক ভিক্ষুণী। মুদ্রা কুড়োবার জন্যে আঁকুপাঁকু করে হাত বাড়িয়েছিল—সবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাত সামলাতে পারে নি।

নিচু হয়ে সাহায্য করতে গেলাম। পাথরের মেঝেতে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে, কপাল কেটে রক্তারক্তি। কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়েছে কাঁধের ঝুলি আর হাতের লাঠি।

তুলে দাঁড় করিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলাম। সিঁড়ির কিনারে বসিয়ে নর্মদার জল অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়ে ধুয়ে দিলাম মুখের রক্ত। তারপর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

চোখদুটি আধবোঁজা। কাঁপছে দুটি ঠোঁট। ভিক্ষার জন্য যে হাত বাড়িয়েছিল সেই শীর্ণ শিথিল ডান হাতটি দু-হাতে ধরে বললাম—

মাঈজী, তুম্?

চোখ দুটি আস্তে আস্তে খুলল। শ্রান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—

তুম্ কোন্ হো বেটা?

তুমি আমাকে চিনতে পারো নি মা-জননী। কিন্তু আমি চিনেছি। তোমার মুখ আমি ভুলি নি। সকাল-সন্ধ্যা প্রতি বেলায় আমি তোমাকে স্মরণ করেছি। মন্দিরে, নাটমন্দিরে, পরিক্রমার তীর্থে তীর্থে নীরবে তোমাকে আমি খুঁজেছি। বাজারে পথে ঘাটে হাঁটতে হাঁটতে তোমার দেখা পাবার আশা করেছি। ভেবেছি আমি

যেমন যাত্রী, তেমনি তুমিও বুঝি শংকরতীর্থের যাত্রিণী। স্বপ্নেও কি ভেবেছি যে শংকরের পদতলে ভক্তকৃপার ভিক্ষার্থিনী রূপ ধরে তুমি বসে আছ?

বললাম—

আমাকে তোমার মনে নেই মাঈজী? সেই যে ওপারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? রাত্রিবেলা জৈন ধর্মশালায় তুমি আমায় তুলেছিলে? ঘুম থেকে ডেকে তুলে অভুক্তকে রুটি খাইয়েছিলে?

বলিজীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, এবার চিনেছি বেটা। তুমি এতোদিন আছ; দর্শন-পূজন সম্পূর্ণ হয়েছে তো?

হাঁ মাঈজী, হয়েছে। আর কিছু বাকি নেই।

অমরকণ্টকের ফিরতি বাসে কান্‌হাইয়ালালকে তুলে দেবার সময় বাসভাড়া দিয়েছিলাম কণ্ডাক্টরের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে কান্‌হাইয়ালাল আমার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলেছিল—

একটা চৌয়ান্নি আমাকে দিন দাদা।

নির্বাক বিস্ময়ে ব্যাগ থেকে একটা সিকি তুলে তার হাতে দিয়েছিলাম।

উদার হাসি হেসে কান্‌হাইয়ালাল বলেছিল—

তীর্থে দান পরিগ্রহ করতে নেই দাদা। ঋণ রাখতে নেই। যদি মনে ভাবেন এই তীর্থযাত্রায় কান্‌হাইয়ালাল আপনার কিছু করেছে তাহলে এই সিকিটি দিয়ে সে ঋণ আপনার শোধ হয়ে গেল।

ঠিক কথা। এই দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় কারো দান আমি নিই নি, কারো ঋণ আমি রাখি নি। হৃদয়ের ঋণ কিছুতে অবশ্য শোধ হয় না—তবে অর্থের বিনিময়ে যা পাবার তার দাম কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি। সংগতি আমার অল্প—কিন্তু যার যা পাওনা অকৃপণভাবে দিয়েছি, দরদস্তুর করি নি। দিয়েছি পাণ্ডা-পুরোহিতকে, বাস-কণ্ডাক্টর লরি-ড্রাইভার রিকশাওয়ালাকে, রেস্ট-হাউসের চৌকিদার আর হোটেলের মালিককে, ধর্মশালার আর পান্থশালার মুনীব-ম্যানেজারকে, চা-ওয়ালা আর ভাজিপুরীর দোকানদারকে।

সেই গর্ব নিয়ে পাঁচ-পোয়া অড়হর ডাল চড়িয়েছিলাম ঋণমুক্তেশ্বর মন্দিরে। কিন্তু ঋণমুক্তেশ্বরই আমার সেই গর্ব চূর্ণ করেছেন। তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হবে মনস্কামনা পরিপূর্ণ হবে যেদিন—তার পূর্ব রাত্রের নির্জন অন্ধকারে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত নিঃসহায় তীর্থপথিকের হাতে দুখানি রুটি তুলে দিয়েছিল এই ভিখারিণী রমণী। পরম কৃতার্থ হয়ে সে দান আমি গ্রহণ করেছিলাম। সে ঋণ শোধ করা হয় নি।

আমার পুঁটুলির সব কটি পয়সা দিয়েও সে ঋণ শোধ করা যাবে না। অক্ষয় থাকুক দুখানি রুটির সেই অমূল্য ঋণ !

উঠো মাঈজী। মন্দিরপর চলো।

দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পাশে দাঁড় করালাম। ধূলিমাখা ছিন্নভিন্ন জীর্ণ বসন—গা থেকে গরম চাদরটি খুলে নগ্ন কম্পিত কাঁধে জড়িয়ে দিলাম সস্নেহে।